বাংলাদেশে ইসলাম

আবদুল মান্নান তালিব

বাংলাদেশে ইসলাম

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ইসলাম
আবদুল মান্নান তালিব

ইফাবা প্রকাশনা : ১৮১৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৮৭.০৯৫৪৯২
ISBN : 984-06-0245-4

প্রথম মুদ্রণ
মার্চ ১৯৮০

তৃতীয় (ইফাবা দ্বিতীয়) সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০২
রমযান ১৪২৩
অগ্রহায়ণ ১৪০৯

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা—১২০৭

বর্ণ বিন্যাস
আশরাফিয়া প্রেস
৪ এ. সি. রায় রোড,
আরমানিটোলা, ঢাকা—১১০০

প্রচ্ছদ
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫

মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

BANGLADESHE ISLAM (Islam in Bangladesh) : written by Abdul Mannan Talib in Bangla and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Price: Tk 80.00; US$: 2.50 December 2002

মহাপরিচালকের কথা

পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেরও রয়েছে একটি বিবর্তনের ইতিহাস। তা যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি আকর্ষণীয়। প্রাচীন এই ভূখণ্ড ছিল পৌত্তলিক ধর্মাচরণে লালিত এবং পরিচালিত। ফলে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী। ধর্মের নামে, দেবতার নামে এখানে পৌত্তলিক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে শোষণ করা, অন্যকে পদানত করা। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের কিছুটা উদার মানবিকতাও পূর্বতন হিন্দু ধর্মের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। এভাবেই অতীত থেকে ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছিল বিগত এগারো খৃস্টীয় শতক পর্যন্ত। সূফী-দরবেশ এবং মুসলিম বিজেতাদের আগমন সেক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় এবং বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ইসলামের মানবিক ও সাম্যের বাণী গণমানুষের জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে। ইতিহাসের বাঁক বদল হয়। পৌত্তলিক আবহে আবর্তিত আদি জনগোষ্ঠীর জীবনে তা মুক্তি ও সৌভাগ্যের পরশ বুলিয়ে দেয়। তারা তৌহিদের অনুপম ধর্ম ইসলামের ছায়ায় শান্তি খুঁজে পায়। ইসলামের আলোয় আলোকিত একটি সঙ্ঘবদ্ধ জনপদ এই ভূখণ্ডে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তারই ধারবাহিকতায় আজকের এই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। আমাদের সেই সমৃদ্ধ ইতিহাসকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব। তাঁর এই অনবদ্য প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও সুধীমহলে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ হাফেজ।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে সপ্তম শতাব্দীতে আরব বণিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে ইসলামের বিস্তার ঘটার আগেই ব্যবসায়ী, সূফী-দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এদেশের জনগণ ইসলামের সুমহান আদর্শের সাথে পরিচিত হয়। কালে কালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে ইসলাম এদেশের আনাচে-কানাচে বিস্তার লাভ করে এবং ইসলাম ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মে পরিণত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম এদেশের জনগণের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনই শুধু ঘটায়নি—জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র সত্তা যোগ করেছে। অন্য কথায় ইসলাম এদেশের জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি অভূতপূর্ব সামাজিক বিপ্লবকেই বাস্তবায়িত করেছে। প্রখ্যাত গবেষক, অনুবাদক ও লেখক আবদুল মান্নান তালিব তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে সে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি সুধী সমাজে বহুল পরিচিত ও বিপুল প্রশংসাধন্য।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা মনে রেখে এবং ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বইটি পূর্বের মতো বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগাবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস রচনা করার গুরুত্ব কয়েকটি দিক থেকেই উপলব্ধি করা যায়। এক. একই দেশে একই ভাষাভাষী এত বিপুল সংখ্যক মুসলমান দুনিয়ার আর কোথাও নেই। কাজেই ইসলাম এ দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুই. মুসলমানরা অতীতে এই সমগ্র এলাকায় সাড়ে ছয়'শ বছর রাজত্ব করেছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ এ দেশে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে। কাজেই এ দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, লোকাচার ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ইসলামের যে প্রভাব পড়েছে তার সঠিক চিত্রাঙ্কনের জন্যে ইতিহাস রচনার প্রয়োজন। তিন. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। যার ফলে এ এলাকার আরো দুটি মুসলিম অধ্যুসিত দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে মিলে বাংলাদেশ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ জন্যে নিজেদের অতীত ইতিহাস থেকে শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানের এ গুরুত্ব একটি স্বীকৃত সত্য। তাই বাংলার বিভিন্ন খ্যাতনামা লেখক ও ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস এবং বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস', চৌধুরী শামসুর রহমানের 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো' এবং ডক্টর আবদুল করীমের 'সোশ্যাল এন্ড কালচার‍্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থগুলো এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইসলাম–এও মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ বইগুলো যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও আলোচনাসাপেক্ষ। তা হচ্ছে, ইসলামের ইতিহাস আর মুসলমানদের ইতিহাস আসলে এক কথা নয়। মুসলমানদের একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস থাকতে পারে। সেটা ঠিক ইসলামের ইতিহাস নয়। ইসলাম একটি দেশের ও একটি জনগোষ্ঠির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের জীবনধারাকে কতদূর আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং দেশের অন্যান্য মতবাদ, আদর্শ ও ধর্মের সাথে তার সংঘাত কোন্‌ পর্যায়ে চলেছে—এসবের বিবরণই ইসলামের ইতিহাস।

এ গ্রন্থে বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাসের এ দিকটির সামান্য আভাস দেয়া হয়েছে মাত্র। ইসলাম একটি আলো ও জ্যোতি। যেখানে অন্ধকার ইসলামের আলো সেখানেই প্রবেশ করে। ইসলাম একটি আদল, ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে জুলুম, শোষণ, অন্যায় ও অত্যাচারে মানুষের জীবন ও পরিবেশ জর্জরিত সেখানে ইসলামের আগমন হয় শান্তি, মৈত্রী, সাম্য ও ইনসাফের বাণী নিয়ে। বাংলাদেশেও অন্ধকার, জুলুম ও শোষণের এমন এক পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয় যখন এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বর্ণবাদী, জাত্যাভিমানী, জালিম ও শোষক রাজা, সামন্ত ও বিভিন্ন শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠির সীমাহীন অত্যাচারে মানবেতর জীবন যাপন করছিল, যখন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা ও প্রকৃতি পূজার অতলস্পর্শী অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ইসলাম এ দেশের মানুষকে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বাংলার ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা তাই মানুষের দেহে প্রাণের মতো। বাংলাদেশে ইসলামের এ বিশিষ্ট ভূমিকাই এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

এ জন্যে এ গ্রন্থের প্রথম দিকে ইসলামের আগমন-পূর্বকালীন ঘটনাবলীর উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র দেয়া সত্য-সহজ-সরল জীবন বিধান থেকে বাংলাদেশের মানুষ কতদূর সরে গিয়েছিল এ আলোচনা থেকে তা অনুমান করা যাবে। ধর্মরাজ্যে এখানে চরম অনাচার ও পাপাচার স্থায়ী আস্তানা গেড়েছিল। ধর্ম ও দেশ শাসনের নামে মানুষের উপর মানুষ যে জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল এবং দেশের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠিকে যেভাবে একদল উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের সেবাদাস ও নিকৃষ্ট ধরনের জীবে পরিণত করেছিল, ইসলামের আগমন না ঘটলে তাদের উদ্ধারের আর কোনো উপায়ই ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর উপরও নির্ভর করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঘটনাবলীকে ধরে রাখার জন্যে এ ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। তবে এ বিষয়টি এমন যেখানে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ রয়েছে। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সূফী, দরবেশ, আলিম, মুজাহিদ ও সুলতানদের অবদান পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অনেক অলৌকিক ঘটনার আলোচনা এসে গেছে। তবে এখানে এ সত্যটি মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম তার বিজয়ের জন্যে যেমন কোনো তরবারির মুখাপেক্ষী নয় তেমনি কোনো কারামাত বা অলৌকিক ঘটনারও মুখাপেক্ষী নয়। ইসলাম তার অন্তরের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই মানুষের হৃদয় জয় করে। কারামাত এ বিজয়কে সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করে মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এটি দুর্বল হৃদয় জয়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু ইসলামের অন্তর্নিহিত দুর্বার সত্যই আসল কাজ করে যায়। তবে এগুলো ঠিক

ইতিহাসের বিষয়বস্তু না হলেও মানুষের জীবনে এর একটি ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। তাই এ আলোচনাগুলো গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবে বৈ কমাবে না বলে আমার ধারণা।

শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী সমাজের কাঠামো এবং এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন শ্রেণীর অবদান আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত পার্শ্ববর্তী অনৈসলামী সমাজের ষড়যন্ত্র একটি জরুরী বিষয়। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধে কুফরী সমাজের এ ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশে এটা কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়। এ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিরোধী সমাজকে পুরোপুরি বিমুখ করেই ইসলামী সমাজকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু যেখানে এ ষড়যন্ত্রকে কোনো না কোনো পর্যায়ে স্বীকার করে নেয়া হয় সেখানে ইসলামী সমাজের ভাঙন ও অবক্ষয় রোধ করার কোনো পথ থাকে না। অনৈসলামী সমাজের রীতিনীতি ও ভাবধারা ইসলামী সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। কিন্তু ইসলামী সমাজের নিজস্ব কাঠামো ও মানদণ্ড তাকে ভিতরে শিকড় গেড়ে বসতে দেবে না কোনো দিন। পার্শ্ববর্তী মুশরিকী ও কুফরী সমাজের সাথে ইসলামী সমাজের পার্থক্যটা থাকবে সব সময় সুস্পষ্ট। এ জন্যে ইসলামী সমাজ সংস্কারের কাজ প্রতি যুগে চলেছে। এ দেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যারা ইসলামের এ সুস্পষ্ট ধারাকে বাদ দিয়ে এ দেশে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এক অভিন্ন বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চান ইসলামী সমাজের এ বিশিষ্ট চেহারা তাদেরকে অবশ্যই নিরাশ করবে। অতীতে তাদের এ ধরনের একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এবং ইসলামী সমাজ সব রকমের গলদমুক্ত হয়ে পুনরায় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনৈসলামী সমাজ ধারার এ অনুপ্রবেশকে চিহ্নিত করার জন্যেই শেষ অধ্যায়ে বাংলার মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির গলদগুলোর সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি এক খণ্ডে সমাপ্ত করাটাই উত্তম ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বিষয়গুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ সময় সাপেক্ষ বিধায় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এসে আমাকে আলোচনা শেষ করতে হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সময় সুযোগ মতো এর দ্বিতীয় অংশটির কাজে হাত দেবার ইচ্ছা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন লাইব্রেরীর পরিচালক এবং আমার বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলে একান্ত হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়া হয় বলে আমি মনে করি। সময়মতো গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহে তাঁদের সহযোগিতা আমার কাজকে সহজসাধ্য করতে সাহায্য করেছে। গ্রন্থের শেষের দিকে একটি গ্রন্থপঞ্জিও সন্নিবেশিত হয়েছে।

২৩ জানুয়ারী ১৯৮০ আবদুল মান্নান তালিব

সূচিপত্র

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা

ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা

সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা

পূর্বকথা

সভ্যতার গোড়ার কথা

পৃথিবীর কোন্ পর্যায়ে মানুষ দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি আজও সে তথ্যের সীমান্ত স্পর্শ করতে পারেনি। কতো হাজার, লক্ষ বা কোটি বছর আগে মানুষের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল সে ইতিহাস আজও তমসাচ্ছন্ন। এমনকি প্রাচীন গ্রন্থাবলী, মৃত্তিকাগর্ভ থেকে উদ্ধারকৃত সভ্যতার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে মানবেতিহাসের যে সব মুছে যাওয়া পাতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্র আট থেকে দশ হাজার বছর বয়ঃক্রমের নির্দেশক।

এ আট-দশ হাজার বছরের মধ্যে মিসর, ব্যাবিলন ও নিনাভের সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছে। গ্রীক, রোম, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছে ও পরবর্তীকালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। প্রাচীনকালের সেই ইতিহাসের ছিটেফোঁটা সভ্যতার জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। সেই রক্ষিত ইতিহাসের কতটুকু প্রামাণ্য আর কতটুকু প্রামাণ্য নয় তাও এক বিচার্য বিষয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সভ্যতার উত্থান ও লালনের এক বিশেষ ও প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ভূমধ্য ও লোহিত সাগরীয় সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা এ অঞ্চল থেকেই মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর প্রামাণ্য ক্ষমতা

সভ্যতার অতীত কাহিনী উদ্ধারের ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কুরআন ছাড়া অন্যগুলোর প্রামাণ্যতা সন্দেহাতীত না হলেও মানব সভ্যতার সূচনা ও বিস্তারের যে বিক্ষিপ্ত আলোচনা এ গ্রন্থগুলোর পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে তা আদৌ সামঞ্জস্যবিহীন নয়। ধর্মগ্রন্থগুলোর এ আলোচনা থেকে আমরা মানব জাতির আদি পুরুষ হিসেবে পাই হযরত আদম আলায়হিস্‌সালামকে। হিমালয়ান উপ-মহাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত সরন্দীপ বা সিংহল থেকে তিনি এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন এবং প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি লোহিত

সাগরের তীরে আরব উপ-দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁরই বংশধরদের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব জাতি ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। হযরত আদম আলায়হিস্সালাম ছিলেন প্রথম মানুষ ও আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রথম নবী। তিনি নিজ বংশধরদের দুনিয়ায় জীবন যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। ধীরে ধীরে মানব জাতি দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাদের সভ্যতাও পর্যায়ক্রমে উন্নতির স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে থাকে। প্রথম দিকে মানুষ গুহায় বাস করতো। তারপর গৃহ ও তোরণ নির্মাণ করা শেখে। ধীরে ধীরে গুহাবাসী মানব নগর সভ্যতার অধিকারী হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য প্রথম দিকে মানুষ প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করতো। তারপর তাম্র ও লোহার ব্যবহার শেখে। এভাবে মানব সভ্যতা ও সমাজ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। মানব সভ্যতার উন্নতির প্রতি স্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সংশ্লিষ্ট যুগ ও অঞ্চলের উপযোগী নবী পাঠাতে থাকেন। নবীগণ মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ ও সভ্যতার ভিত্ গড়ে তুলতে থাকেন।

দু'টো ধারা

এ ক্ষেত্রে দু'টো সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা গড়ে ওঠে নবীগণের শিক্ষার ভিত্তিতে, যাকে আমরা তৌহীদবাদ বলতে পারি। আর দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে নবীগণের শিক্ষা বিচ্যুত বরং তাঁদের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক একটি ধারা। কুরআনের পরিভাষায় একে তাগুতীবাদ বা শির্কবাদ বলা যায়। মানব জাতির ইতিহাস মূলত এ তৌহীদবাদ ও শির্কবাদের সংঘর্ষের ইতিহাস।

বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই সভ্যতার সংঘর্ষের এ দিকটির উপর আলোকপাত করতে হবে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস এ তৌহীদবাদ ও শির্কবাদের এক ধারাবাহিক সংঘর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ সংঘর্ষ আজও চলছে। অবশ্য বিশ্বের সর্বত্রই ইসলাম প্রচারের সাথে সভ্যতার এ দু'ধারার সংঘর্ষ সমানভাবে বিজড়িত। কিন্তু বাংলাদেশের ন্যায় কোথাও এ সংঘর্ষের বোধ হয় এতটা তীব্রতা দেখা দেয়নি। যথাস্থানে আমরা এ প্রসঙ্গের অবতারণা করবো।

নবীদের সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন

মানব জাতি ও সভ্যতার এ দশ হাজার বছরের ইতিহাসে যথার্থ নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন আল্লাহ প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ। এ নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজারেরও বেশি। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজপতি, জাতীয় নেতা

এবং কেউ কেউ আবার বৃহত্তম রাষ্ট্রও শাসন করে গেছেন। নবীদের পর তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। এভাবে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ নবীদের শিক্ষার ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করেছে। মানব সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাবতীয় নৈতিক ও সৎগুণাবলী এবং সদাচার নবীদের শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে নবীদের শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতিতে অসৎবৃত্তি ও অসৎগুণাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি চরম পাপাচার, শিরক, মূর্তি পূজা, অন্যায় ও অসৎকর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে এসে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এভাবে পৃথিবীর বুক থেকে একের পর এক বিভিন্ন সভ্যতার বিলোপ সাধন হয়েছে।

এভাবে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মানব জাতি দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষাধিক নবীর প্রচেষ্টা ও সাধনায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নতি ও অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। হাজার হাজার বছরের কার্যধারা সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তোলে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। এ অবস্থায় সারা বিশ্বে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একজন মহা সংগঠক ও স্থপতির প্রয়োজন দেখা দেয়। মহান আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে সেই প্রয়োজনও পূর্ণ করে দেন।

শেষ নবীর জন্ম ও ইসলাম প্রচার

ঈসায়ী ৫৭১ সালের ২০ এপ্রিল তথা ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার বিশ্বমানবতার এ সর্বশেষ শিক্ষক আরব, লোহিত, ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপ-সাগর বেষ্টিত আরব উপ-দ্বীপের মক্কা নগরে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি বিশ্বমানবতাকে দান করলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জীবন বিধান হচ্ছে আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসলাম। মানব সভ্যতা ও সমাজের এতদিনকার যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলো। তিনি মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও দাসত্ব করার আহ্বান জানালেন এবং জুলুম, শোষণ, অন্যায় ও পাপাচারে জর্জরিত পুরাতন ঘুণে ধরা সমাজকে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

আরবের তদানীন্তন পৌত্তলিক সমাজে তিনি ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিলেন। সে সমাজ ছিল অন্যায়, জুলুম ও অনাচারে পরিপূর্ণ। আর এ সব কিছুর মূল ভিত্তিই ছিল

শিরকবাদ। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও বিশ্ব-জাহানের একমাত্র নিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন প্রভুর নির্দেশ ও বিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল সে সমাজ। বলাবাহুল্য, এ মনগড়া প্রভুদের বিধান ছিল মূলত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির বাহন। কাজেই এহেন বিধানের মাধ্যমে সমাজ কেবলমাত্র অন্যায় ও অনাচারেই ভরে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ সব মনগড়া প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে আহ্বান এ সমাজের মর্মমূলেই আঘাত হেনেছিল। তাই সমগ্র কুরাইশ সমাজ এ আহ্বানের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিল।

তৎকালে মক্কার শুধুমাত্র কাবা ঘরেই ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে আবার বড়-ছোটর পার্থক্যও ছিল। সবচেয়ে বড় মূর্তিটির নাম ছিল 'হোবল'। এটি প্রধান খোদা হিসেবে পূজিত হতো। এ মূর্তিটিকে যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করা হতো। বৃষ্টি বর্ষণ, সন্তান দান ও যুদ্ধে বিজয় দানের ক্ষমতা এ মূর্তিটির হাতে ন্যস্ত বলে মনে করা হতো। এ পার্শ্বচর ছিল আবার বহু ছোট ছোট খোদা ও দেবতা। এভাবে আরবের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার খোদা ও দেবতা বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। এমনকি বিভিন্ন পরিবার ও গোষ্ঠী নিজেদের খোদা ও দেবতা আলাদা করে নিয়েছিল। গৃহের জন্য ছিল পৃথক গৃহ-দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

এ সব বিভিন্ন খোদা ও দেবতার পূজা ছিল আসলে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী স্বার্থের পূজা। শেষ নবী (সা) এ স্বার্থপূজার পথে দিলেন প্রচণ্ড বাধা। তিনি ইসলামী বিধান অনুযায়ী এ সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু এ পরিবর্তনের সাথে বিজড়িত ছিল কুরাইশদের শত শত বছরের গড়ে ওঠা গোত্রাভিজাত্য, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং হাজার বছরের সংস্কার। নতুন সমাজ গড়ে ওঠার সাথে সাথে এ সব ধূলায় মিশে যাবে। তাই কুরাইশদের সবগুলো গোত্র একযোগে শেষ নবী (সা)-এর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করলো। এ বিরুদ্ধাচরণে যার স্বার্থ নাশের আশঙ্কা ছিল যত বেশি তার ভূমিকা ছিল ততো বেশি কঠোর ও তীব্র।

বাধার সাগর পাড়ি দিয়ে শেষ নবী এগিয়ে চললেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার লোকের অভাব হলো না। সর্ব প্রথম তাঁর সাথে যোগ দিলেন তাঁর সহধর্মিণী খাদীজা (রা), পিতৃব্যপুত্র কিশোর আলী (রা), তাঁর গোলাম ও পালক-পুত্র যায়েদ (রা) এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বকর (রা)। একে একে এ কাফেলায় যোগ দিলেন উসমান (রা), আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা), যোবাইর (রা), বেলাল (রা), হাম্‌যা (রা), উমর (রা) এবং দুর্বল ও প্রতিপত্তিশালী আরো অনেকে। ইসলামী কাফেলার শক্তি বৃদ্ধি

হতে লাগলো। শেষ নবী (সা)-এর দাওয়াত গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো দিনের পর দিন। শির্কবাদের পূজারীরা নিজেদের দীর্ঘকালের বহু সাধনায় গড়া সম্মান, আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির প্রাসাদ ধূলায় লুণ্ঠিত হতে দেখে তৌহীদবাদের সাথে আপোস প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো। কিন্তু তৌহীদবাদীদের নেতা তাঁর আপোসহীন নীতি ঘোষণা করে দিলেন ঃ

> "তোমরা যার পূজা-উপাসনা করো আমি তার পূজা-উপাসনা করি না, আবার আমি যার ইবাদত-আরাধনা করি তোমরা তার ইবাদত-আরাধনা করো না। (কাজেই) তোমাদের ধর্ম ও জীবন বিধান তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম ও জীবন বিধান আমার জন্য।" —সূরা আল-কাফিরূন

আপোস প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় মক্কার মুশরিকরা প্রচণ্ড মারমুখো নীতি গ্রহণ করলো। মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে লাগলো ভীষণভাবে। এ নির্যাতন যেমন ছিল অমানুষিক তেমনই অকল্পনীয়। দুপুরের রোদে মরুভূমির বালুকারাশি যখন জ্বলন্ত অঙ্গারের রূপ ধারণ করতো, তখন মুসলমানদের ধরে এনে তার ওপর শুইয়ে দেওয়া হতো এবং যাতে তারা পার্শ্ব পরিবর্তন করতে না পারে এ জন্য পিঠের ওপর বা বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো। লোহা গরম করে তাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে দাগ দেওয়া হতো। উত্তপ্ত পানিতে তাদের ডুবিয়ে রাখা হতো। কয়লাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই চেপে রাখা হতো। জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দিয়ে পা দিয়ে পা দিয়ে চেপে রাখা হতো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবকাতে ইবনে সা'দ' গ্রন্থে হযরত বিলাল (রা) ও হযরত শুয়াইব (রা)-এর উপর এ ধরনের লোমহর্ষক অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

কিন্তু এতসব অত্যাচারেও তৌহীদবাদীদের কাফেলার গতি রুদ্ধ হলো না। শেষ নবী (সা) সাফা পর্বতের পাদদেশে 'দারে আরকামে' কেন্দ্র স্থাপন করে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকলেন। এ সময় মুশরিকদের নির্যাতন এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছলো যার ফলে মুসলমানদের একটি দলকে পার্শ্ববর্তী দেশ হাবশায় হিজরত করতে হলো।[২] অতঃপর শেষ নবী (সা)-এর উপরও নির্যাতন নেমে আসলো চরমভাবে। মক্কার মুশরিকরা তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট শুরু করলো। ফলে নিজের পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণকে নিয়ে তাঁকে 'শিআবে আবূ তালেবে' অন্তরীণ জীবন যাপন করতে হলো একাধারে তিন বছর। এ অন্তরীণকালে মুসলমানদেরকে খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ও ঘাস খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী শহর তায়েফের লোকেরা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করলেও দূরবর্তী শহর মদীনার লোকেরা শেষ নবী (সা)-এর ডাকে সাড়া দিল। মক্কায় ১৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে শেষ নবী (সা) মুষ্টিমেয় যে কয়জনকে ইসলামের অনুসারী বানিয়েছিলেন তাদের সবাইকে নিয়ে মদীনায় পাড়ি জমালেন। মদীনার 'আওস' ও 'খাযরাজ' গোত্র পূর্ণভাবে তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে এর সংরক্ষণের জন্য জীবনপণ করলো।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

শেষ নবী (সা) মক্কা ও মদীনার নবদীক্ষিত মুসলমানদের সহযোগিতায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন। এতদিন আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূলগণ যুগের পর যুগ ধরে দুনিয়ার দেশে দেশে যে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন শেষ নবী (সা) তার পরিপূর্ণতা দান করলেন। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের নিয়ে তিনি নতুন সমাজ গঠন করলেন। এ সমাজের মূল ভিত্তি স্থাপিত হলো তৌহীদবাদের ওপর।

শির্‌কবাদী সমাজের সাথে এবার তার সংঘাত মুখোমুখি। মুশরিকরা যে শির্‌কবাদী জাহেলী সমাজের স্মৃতি বহন করে চলছিল তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল। তার মৃত্যুর ব্যবস্থায় তারা নিজেরাই উদ্যোগী হলো। মক্কার মুশরিকরা মদীনা আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রস্তুতি চালাতে লাগলো। এ খবর পেয়ে শেষ নবী (সা) মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য তিনি মদীনার ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এ চুক্তিপত্রের ধারাগুলো বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিচে ধারাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক. কিসাস অর্থাৎ রক্তের বদলে রক্তপাত পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

দুই. ইহুদী সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মপালন করতে পারবে। পারস্পরিক ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

তিন. ইহুদী ও মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

চার. ইহুদী বা মুসলমানরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে উভয়ে সমবেত শক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করবে।

পাঁচ. কুরাইশদেরকে কেউ আশ্রয় দেবে না।

ছয়. মদীনা আক্রান্ত হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সবাই সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে।

সাত. কোন শত্রুর সাথে এক পক্ষ সন্ধি করলে অপর পক্ষও সন্ধি করবে। তবে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

ইসলামের বিজয় অভিযান

শেষ নবী (সা)-এর মক্কা থেকে হিজরতের দ্বিতীয় বছর মক্কার মুশরিকরা মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযান চালায়। মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদর নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন এবং মুশরিকদের সংখ্যা ছিল হাজারেরও বেশি। মুসলমানদের কাছে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামও বেশি ছিল না। অন্যদিকে মুশরিকরা সর্বপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। তাদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলমানদের মাত্র ১৪ জন শহীদ হন।

মুসলমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুশরিকরা পরবর্তী বছর আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে ওহূদে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুশরিকরা পর্যুদস্ত হলেও কোনো পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয়নি। মুসলমানরাও এ যুদ্ধে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমানদের বিজয়লাভে ব্যর্থতা আরবের বিভিন্ন এলাকার মুশরিকদের মনে সাহস সঞ্চারে সহায়তা করে। বদরের যুদ্ধের পর তাদের মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। আরবের সমস্ত গোত্রই ছিল মুশরিক। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বরদের ধর্মকে বিকৃত করে মূর্তি পূজাকেই তারা নিজেদের ধর্মে পরিণত করেছিল। ইসলাম এ সব মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী এবং এগুলোর বিলুপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যেই তার আগমন। আরবের সকল গোত্রই নবীদের ইনসাফ ও সততার ভিত্তিতে রচিত সমাজ ব্যবস্থার বিকৃতি সাধন করে অন্যায়, অনাচার ও স্বার্থলিপ্সার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তুলেছিল। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, জুলুম ও অবিচার ছিল এ সমাজের নিত্যকার ব্যাপার। ইসলাম এহেন সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ন্যায়, ইনসাফ ও সততার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠনে তৎপর ছিল। কাজেই আরবের সকল মুশরিক গোত্রই ছিল মুসলমানদের সমবেত শত্রু। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার আর একটি বড় কারণ ছিল ঃ তা হচ্ছে এই যে, তাদের জীবিকার প্রধান উৎসই ছিল চুরি, ডাকাতি ও লুণ্ঠন। ইসলাম এ সব অন্যায় কাজের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এবং মদীনার ইসলামী সমাজে এ সব গর্হিত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এ সব কারণে তারা মনে করতো, ইসলাম যদি সর্বত্র সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে তাদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই ওহুদ যুদ্ধের পর মদীনার আশেপাশের মুশরিক গোত্ররা মুসলমানদেরকে শক্তিহীন মনে করে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। শেষ নবী (সা) সাহাবাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে দমন করেন। এভাবে কয়েক বছর পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে ছোট-বড় সংঘর্ষ ও বিরোধ চলতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে শেষ নবী (সা) মদীনার ইসলামী সমাজটিকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করে তোলেন। মদীনার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারক পাঠিয়ে তিনি মুশরিক গোত্রদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন।

অবশেষে ৮ম হিজরীর ১০ রমযান শেষ নবী ও বিশ্বমানবতার প্রধান পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দশ হাজার মুসলিম সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কা অভিযানে বহির্গত হলেন। মুসলিম সেনাদলের তেজস্বিতা, জৌলুস ও বীরত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপ মুশরিকদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করলো। মক্কা বিজিত হলো। এ সঙ্গে মুশরিকরাও বিজিত হলো। মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী শেষ নবী (সা) ঘোষণা করলেন ঃ "যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে বা আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে অথবা গৃহের দুয়ার বন্ধ করে দেবে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।" তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "আজ কারোর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত। আজ কাবা গৃহের মর্যাদার দিন।" সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি যে ভাষণ দিলেন তা কেবল তদানীন্তন মানব গোষ্ঠীর জন্য বরং কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানব সমাজ গঠনের মহান ভিত্তি রূপে পরিগণিত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ "এক আল্লাহ্ ছাড়া পূজা, উপাসনা, আরাধনা ও বন্দেগীর যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি নিজের ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাভূত করেছেন। জেনে রাখো, আজ থেকে জাহেলিয়াতের সমস্ত গর্ব, অহংকার, পূর্বের সমস্ত রক্তের প্রতিশোধ এবং সমস্ত রক্তপণের দাবি আমার এ পদতলে প্রোথিত। .... হে কুরাইশগণ ! আল্লাহ্ আজ জাহেলিয়াতের গর্ব-অহংকার ও বংশ গৌরব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। কারণ সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে। .... অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন।"

ইসলামের যে বাণীকে মুশরিকরা নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানা মনে করতো, আজ সেই বাণী তাদেরকে জীবন দান করলো। শেষ নবী (সা)-এর দাওয়াতের তখন দুই যুগ অতিক্রান্ত হয়নি সমগ্র আরব ইসলামের পতাকা-তলে সমবেত হলো। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। পুরাতন জাহেলী শির্‌কবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ইসলামী সমাজের কাঠামো

গড়ে তুলতে লাগলো। জাহেলিয়াত ও শির্‌কবাদের তিমিরাবৃত বিশ্বে ইসলামের নতুন আলোক স্ফুরণের পথ প্রশস্ত হলো। নবীর সাহাবা-অনুচরগণ ছিলেন তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সত্য-ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নবীর ন্যায়ই উৎসর্গীত প্রাণ। তাঁদের সমগ্র জীবনটাই ছিল ইসলামের বাস্তব প্রতিকৃতি। তাই নবী (সা)-এর তিরোধানের পর তাঁরা বসে থাকেননি। হিজরী ১০ম সনে শেষ নবী (সা) এ অন্তবর্তীকালীন বিশ্বলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করে অনন্ত আখিরাতের পথে পাড়ি জমান। এর মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে ইসলাম বিশ্বের বৃহত্তম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

সমগ্র বিশ্বে ইসলামের দ্রুত অগ্রাভিযান ও তার কারণ

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, এত অল্প সময়ে ইসলাম সারা বিশ্বে কিভাবে ছড়িয়ে পড়লো। ইসলামের মূল বাণীর মধ্যেই এর জবাব নিহিত রয়ে গেছে। ইসলাম সমস্ত বিশ্বলোকের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, নিয়ন্তা ও উপাস্যরূপে একমাত্র আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি বরং এ সঙ্গে সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে তাঁর একচ্ছত্র প্রভুত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার জন্য মানব জগতেও তাঁরই একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত জাহেলী ও শির্‌কবাদী চিন্তা ও সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের সত্য, নির্ভেজাল ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁর শেষ নবী (সা)-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন। শেষ নবী (সা) তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র আরবে এ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং তদানীন্তন বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তি পারস্য ও রোম সম্রাটগণের নিকট দূতের সাহায্যে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তাঁর এ দায়িত্ব পালনের উদ্বোধন করেন। তাঁর পত্রে মূল বক্তব্য ছিল ঃ তোমাদের সাম্রাজ্যে বসবাসকারী প্রজা সাধারণকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করো এবং তাদেরকে জাহেলী ও শির্‌কবাদী সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ মুক্ত করে ইসলামের ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার অসীম কল্যাণে আপ্লুত করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর বর্তায়। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করলে তোমরা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর যদি ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করো তাহলে তোমাদের সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের জাহেলী ও শির্‌কবাদী জীবন-যাপনের সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের ওপর বর্তাবে।

পারস্য ও রোম সম্রাটগণ শেষ নবী (সা)-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস দূতকে সসম্মানে গ্রহণ করেন ও বিদায় দেন। অন্যদিকে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ দূতের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেন, নবী (সা) প্রেরিত

পত্রটিও ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন এবং নবী, ইসলাম ও ইসলাম গ্রহণকারী সমগ্র আরবীয় জনতার প্রতি কটূক্তি করেন। কাজেই পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি চলতে থাকে। শেষ নবী (সা)-এর তিরোধানের পর তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফাগণ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যকে পদানত করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার সীমানা পার হয়ে ইউরোপ ভূখণ্ডের দ্বারদেশেও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সত্য, ন্যায় ও সাম্যের বাণী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম আফ্রো-ইউরোশিয়া মহাদেশের পূর্বে চীন হতে পশ্চিমে স্পেন ও পর্তুগাল এবং উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে ভারত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, শেষ নবী (সা)-এর সাহাবাগণ ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণীকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেওয়া নিজেদের প্রধানতম দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। এ জন্য শেষ নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তিরোধানের পর সাহাবাগণ বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা থেকে কয়েক হাজার মাইল পূর্বে সুদূর চীনের ক্যান্টন শহরেও শেষ নবী (সা)-এর জনৈক সাহাবীর জীবনাবসান হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

শেষ নবী (সা)-এর সাহাবাগণ বিভিন্ন দেশের যেখানেই কেন্দ্র স্থাপন করেন সেখানেই জ্ঞানচর্চার একটি ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। পারস্য, ইরাক, খোরাসান, হিরাত প্রভৃতি এলাকার বিভিন্ন শহরে তাঁদের শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এ সব কেন্দ্র থেকে পরবর্তীকালে আলেম, মুজাহিদ, আউলিয়া ও সূফীগণ ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী নিয়ে সুদূর দক্ষিণে হিমালয়ান উপমহাদেশে পাড়ি জমান। তাঁদেরই কয়েকটি দল দিল্লী অতিক্রম করে সুদূর পূর্বাঞ্চলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ অভিযানের অন্তত দু'আড়াই'শ বছর পূর্বে দশম-একাদশ শতকে।

তৃতীয়ত, শেষ নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব থেকে আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। কারণ এটিই ছিল তাদের অর্থোপার্জনের প্রধানতম উপায়। এজন্য তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যবহরও গড়ে উঠেছিল। এ পথে হিমালয়ান উপ-মহাদেশের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাদের বাণিজ্য বহর আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও ও মালয়েশিয়ার উপকূলে পাড়ি জমাতো এবং আরো উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙ্গর করতো, অষ্টম ও নবম শতকের চট্টগ্রাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে ইসলামের প্রথম যুগে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেও

ইসলামের সত্য ন্যায়ের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোতে একমাত্র এ পথেই ইসলামের দাওয়াত শিকড় গেড়ে বসে এবং বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেও এ পথেই অষ্টম শতকে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো অনুপ্রবেশ করে বলে অনুমান করা হয়।

এভাবে একদিকে রাষ্ট্র শক্তি এবং অন্যদিকে একদল নিবেদিত প্রাণ ইসলাম প্রচারক সূফী, আউলিয়া ও পূত-চরিত্র মুসলিম ব্যবসায়ীর আদর্শনিষ্ঠা সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। বস্তুত ইসলাম যে বিশেষ কোনো দেশের, গোষ্ঠীর বা জাতির নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার ধর্ম এবং বিশ্ব মানব প্রকৃতির সাথে এর যে একটি অবিমিশ্র সংযোগ এবং স্বাভাবিক মিল, সামঞ্জস্য ও আনুকূল্য রয়েছে তা এর সূচনার মাত্র দেড়'শ বছরের মধ্যে বিশ্বের চতুঃপ্রান্তে এর প্রসার, একচ্ছত্র প্রভাব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠান দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে দেয়।

ইসলামের প্রসারে রাষ্ট্রশক্তি একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এ কথা যথার্থ হলেও এ কথাও বলতে হয় যে, রাষ্ট্রশক্তি এ ক্ষেত্রে একক, একমাত্র ও একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেনি। ইসলাম তার সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধান, ন্যায়-নিষ্ঠ ও শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পূত-পবিত্র, সংস্কার মুক্ত, সহজ-সরল, ব্যক্তিগত, নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনধারার মাধ্যমে জাহেলিয়াত, শির্কবাদ, জুলুম, শোষণ, অন্যায় ও অনাচারে জর্জরিত কোটি কোটি মুমূর্ষু বিশ্ব মানবতার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। তাই জাহেলিয়াত ও শির্কবাদী সভ্যতার গগণচুম্বী প্রাসাদ তৌহীদবাদী সভ্যতার প্রথম আঘাতেই ধূলিসাৎ হয়েছে। কুফর ও শির্ক মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় আর ইসলাম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে আনে। ইসলাম কোনো দেশ বা জাতির ভিত্তিতে মানব সভ্যতার পুনর্গঠন করেনি বরং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মানব সমাজের নতুন কাঠামো গড়ে তুলেছে। যার ফলে এখানে আর্যদের বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ, হিটলারের নাৎসীবাদ বা মার্কসবাদের শ্রেণী-সংগ্রামের অবকাশ নেই, যা বিশ্ব-মানব সভ্যতাকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত এবং দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পথে এগিয়ে দেয়। এটিই ছিল ইসলামের বিশ্বব্যাপী দ্রুত প্রসারের মূলীভূত কারণ।

---

১. মিসরের বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মতারিখ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। তাতে তিনি শেষ নবী (সা)-এর জন্মতারিখ সংক্রান্ত সহীহ্ হাদীস ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে গাণিতিক যুক্তি ও পর্যালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রচলিত ১২ রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে উপরোক্ত তারিখকে সঠিক প্রমাণ করেছেন।

২. হাবশা আফ্রিকার বর্তমান ইথিওপিয়ার প্রাচীন নাম। হাবশায় এ প্রথম হিজরাতে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রাচীন বাংলা

সীমানা

প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্দেশ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কারণ আজকের যুগে বাংলা বলতে আমরা যে সব এলাকাকে বুঝি প্রাচীন যুগে সেসব এলাকার কোনো একটিমাত্র নাম ছিল না। এ সব এলাকার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যায়িত হতো। এ সব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একাধিক স্বাধীন রাজ্য। আবার বিভিন্ন সময়ে এদের নামের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেছে। যেমন উত্তরাংশে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল এবং পশ্চিমাংশে রাঢ়, তাম্রলিপ্তি ও কজঙ্গল প্রভৃতি দেশ ছিল। পশ্চিমাংশ সূক্ষ্ম ও দণ্ডভূক্তি নামেও অভিহিত হতো। আবার উত্তর ও দক্ষিণাংশ এক সময় সাধারণভাবে গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলার সীমা নির্দেশ আমরা এভাবে করতে পারি ঃ উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এ চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই সাধারণত বাংলা নামে পরিচিত।

বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকাটিই সমতলভূমি। এ বিরাট ও বিস্তৃত এলাকার বৃহত্তম অংশই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন নদ-নদী এ দেশের সর্বত্র জালের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি এ নদ-নদীগুলোর গতিপথ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অতীতের বহু সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলেও অনেক লোকালয় ও জনপদ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, এরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার স্রোত উচ্চতর এলাকা থেকে মাটি বহন করে এনে পূর্বে ও দক্ষিণ বঙ্গের ব-দ্বীপে যে বিস্তৃত নতুন ভূমির সৃষ্টি করেছে তা এ অঞ্চলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব পরিবর্তনের বৃহত্তম শিকার হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের বৃহত্তম নগরী ও ঐতিহ্যময় রাজধানী গঙ্গ শহর। আলেকজান্ডারের পরবর্তীকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে এটি হিমালয়ান উপ-মহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজধানী নগরী ও সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এখান থেকে বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় সুদূর পশ্চিমা দেশে রপ্তানি হতো।

খৃস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক সর্ব প্রথম বাংলার এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জনপদগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করেন। শশাঙ্কের পরে বাংলা গৌড়, পুণ্ড্র ও বঙ্গ এ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসন আমলেই এ বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্র করার চেষ্টা সফলকাম হয়। বাংলায় পাঠান যুগের পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' ও পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' এ দু'নামে চিহ্নিত হতো। ষোড়শ শতকে মোগল শাসন আমল থেকে এ সমগ্র এলাকা 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ। ইংরেজ শাসনামলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলাদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানা ফিরে পায়নি। তখন বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। নূতন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়। আসাম পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। ফলে একদিকে বাংলাভাষী সিলেট, কাছাড়, শিলচর ও গোয়ালপাড়া জেলা আসামে থেকে যায় এবং অন্যদিকে পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি বাংলাভাষী জেলাগুলো বিহারের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৯৪৭ সালে আসামের সিলেটসহ পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এ পূর্ব পাকিস্তানই স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক অবধি লিখিত গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গার সর্ব পশ্চিম ও সর্ব পূর্ব দু' ধারার মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলই আসল বঙ্গ এবং এর প্রায় সবটুকুই (২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ছাড়া) বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

নামকরণ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বাংলার সমগ্র জনপদ বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে একত্র করে 'বাংলা' নামকরণ মাত্র কয়েক'শ বছর আগের ঘটনা। মুসলমান শাসনামলেই সর্ব প্রথম এ সমগ্র এলাকাকে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হয়। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ সুবা-ই-বাঙ্গালাহ্ নামে পরিচিত হয়। ফার্সী বাঙ্গালাহ্ থেকে পর্তুগীজ BENGALA বা PENGALA এবং ইংরেজী BENGAL শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

বাংলা নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলেছেন, এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এবং এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু উঁচু 'আল' বেঁধে

বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করতো। সময়ের ব্যবধানে 'আল' শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে (বঙ্গ+আল) বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়।

'রিয়াযুস্ সালাতীন' গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলীম তাঁর গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন : হযরত নূহ্ আলায়হিস সালামের যুগে যে মহাপ্লাবন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দুনিয়ার কাফেরকুল সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হযরত নূহ্ (আ)-এর সাথে তাঁর অনুসারী মুষ্টিমেয় মুসলমানরাই রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যেই পুনরায় দুনিয়ায় মনুষ্য বসতি শুরু হয়।[১] এ মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্র হাম তাঁর মহান পিতার অনুমতি নিয়ে (পৃথিবীর) দক্ষিণ দিকে মনুষ্য বসতি স্থাপনে মনস্থ
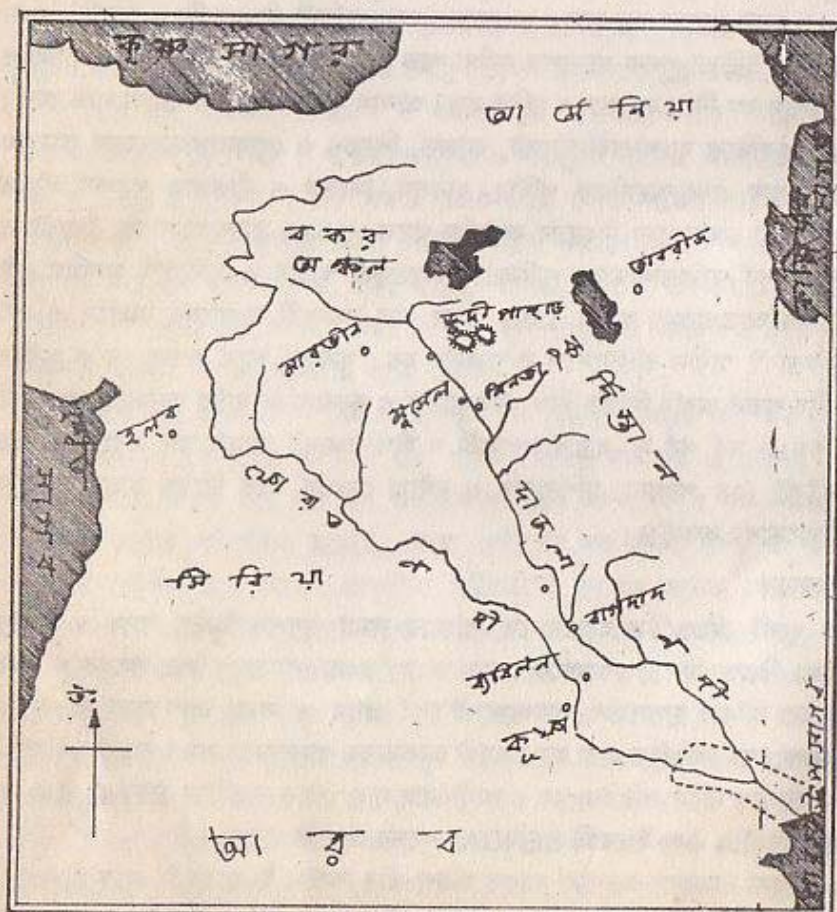
হযরত নূহের সময়ের জনবসতি

করেন। এ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য তিনি পুত্রদের দিকে দিকে প্রেরণ করতে থাকেন। হামের প্রথম পুত্রের নাম হিন্দ, দ্বিতীয়ের নাম সিন্ধ, তৃতীয়ের হাবাস, চতুর্থের জানায, পঞ্চমের বার্বার এবং ষষ্ঠের নাম নিউবাহ। যে সব অঞ্চলে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেন তাঁদের নামানুসারেই সে সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। জ্যেষ্ঠ হিন্দের নামানুসারে তাঁর আবাসভূমির নাম হয় হিন্দ। সিন্ধ জ্যেষ্ঠের সঙ্গে এসে সিন্ধুদেশে বসতি স্থাপন করেন। তাই তাঁর নামানুসারে এ দেশের নাম রাখা হয়। হিন্দের চার পুত্র ছিল : প্রথম পূরব, দ্বিতীয় বং, তৃতীয় দখিন, চতুর্থ নাহার ওয়াল। এরা যে যে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন তাদের নামানুসারেই সেই সব অঞ্চলের নামকরণ হয়। হিন্দের পুত্র দখিনের তিন পুত্র ছিল এবং দখিন (দাক্ষিণাত্য) তাদের মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এ তিন পুত্রের নাম ছিল সারহাট, কানার ও তালং। দক্ষিণ দেশবাসীরা সবাই এদের বংশধর এবং অধ্যাবধি এ তিনটি জাতি এ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। নাহার ওয়ালের ছিল তিন পুত্র : বাব্রুজ, কনোজ ও মালরাজ। এদের নামানুসারেই নগরীসমূহের নামকরণ করা হয়েছে।

হিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূরবের বিয়াল্লিশটি পুত্র ছিল। অল্পকালের মধ্যে এঁদের বংশ বৃদ্ধি হয় ও তাঁরা বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ে তোলেন। যখন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায় তখন তাঁরা সমগ্র এলাকার পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন।

হিন্দের পুত্র বং (বঙ্গ)-এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। বং-এর সঙ্গে 'আল' শব্দ যোগ হওয়ার কারণ হচ্ছে : বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য জমির চারদিকে বাঁধ দেওয়া হতো। প্রাচীনকালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উঁচু ও কুড়ি হাত চওড়া স্তূপ তৈরী করে তার উপর বাড়ি নির্মাণ ও চাষাবাদ করতেন। লোকেরা এগুলোকে বলতো 'বাঙ্গালা'।

'রিয়াযুস্ সালাতীন' লেখকের এ বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু নিহিত রয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভবপর না হলেও এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যে সেমেটিক দ্রাবিড় এবং মধ্য এশিয়া থেকেই তাদের আগমন ঘটেছিল উপরন্তু বাংলায় আর্যদের অনুপ্রবেশ যে বহু পরবর্তীকালের ঘটনা এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত। কাজেই বং বা বঙ্গ থেকেই যে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশ্য সেমেটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ বং-এর আওলাদ বা বংশধর) শব্দের

উৎপত্তিটাকে নেহায়েত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে খৃস্টীয় অষ্টম শতকে বা এর পূর্ব থেকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ দেশটি বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটবর্তী ছিল। হতে পারে এ দেশের অধিবাসীরা বঙ্গ-এর যথার্থ আওলাদ হবার দাবিদার ছিল।

বঙ্গ শব্দটি গঙ্গ শব্দের রূপান্তরও হতে পারে বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন এবং এটা আর্যভাষা ও উচ্চারণ রীতির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। অতীতের শৌর্যশালী গঙ্গরীড়ি বা গঙ্গরিডই জাতি এ গঙ্গের অধিবাসী এবং এক সময় তাদের সাম্রাজ্য কামরূপ থেকে পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই সহজেই অনুমান করা যায় যে, গঙ্গরীড়িদের গঙ্গরাজ্যই পরবর্তীকালে বঙ্গে রূপান্তরিত হয়।[২]

অধিবাসী ঃ বাংলার আদিম জনগোষ্ঠী

বাংলার আদিম অধিবাসী কারা এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। প্রাচীনকালে এ দেশের সবটুকু সমুদ্র গর্ভ থেকে উত্থিত না হলেও এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাই পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বেও এখানে মনুষ্য বসতি ছিল বলে অনুমান করা হয়। অতি প্রাচীনকালে এখানে আর্যদের আগমনের পূর্বে অন্ততপক্ষে আরো চারটি জাতির নামোল্লেখ করা হয়। এ চারটি জাতি হচ্ছে ঃ নেগ্রিটো, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়।

নিগ্রোদের ন্যায় দেহ গঠন যুক্ত এক আদিম জাতির এ দেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের বিবর্তনে বর্তমানে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক জাতি বাংলায় প্রবেশ করে নেগ্রিটোদের উৎখাত করে বলে ধারণা করা হয়। এরাই কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্ব-পুরুষ রূপে চিহ্নিত। বাংলা ভাষার শব্দে ও বাংলার সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব রয়েছে। অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির সমকালে বা এদের কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে। উন্নততর সভ্যতার ধারক হবার কারণে তারা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিকে গ্রাস করে ফেলে। অষ্ট্রো-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রাক আর্য জনগোষ্ঠীই বাঙালী জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক দখল করে আছে। আর্যদের পর এ দেশে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। কিন্তু বাংলার মানুষের রক্তের মধ্যে এদের রক্তের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা

ইত্যাদি উপজাতি এ গোষ্ঠীভুক্ত। পরবর্তীকালে আরব, তুর্কী, মোঙ্গল, ইরানী ও আফগান রক্ত এর সাথে মিশ্রিত হয়। বস্তুত বাঙালী একটি শংকর জাতি হলেও দ্রাবিড়ীয় উপাদান এর সিংহভাগ দখল করে আছে।

খৃস্টপূর্ব শতকের বাংলার সভ্যতা

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বাংলার অধিবাসীদেরকে আলেকজান্ডারের সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ সুসভ্য ও ভারতের শ্রেষ্ঠতম জাতি বলে উল্লেখ করে গেছেন। গ্রীক পণ্ডিতগণ এ জাতিকে গঙ্গরীড়ি বা গঙ্গরীডই নামে উল্লেখ করেছেন। খৃস্টীয় প্রথম শতকের গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী বলেন : গঙ্গ-মোহনার সব অঞ্চল জুড়ে এ গঙ্গরীড়িরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃহত্তম বন্দর। তাদের মতো পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ জাতি ভারতে আর নেই। গ্রীক পণ্ডিতদের উল্লিখিত এ গঙ্গরীড়িরা যে বঙ্গ ব-দ্বীপের অধিবাসী বঙ্গ-দ্রাবিড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৩]

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এ দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়া থেকে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তাইগ্রীস, ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় জীবন অতিবাহিতকারী দ্রাবিড়রা স্বভাবতই ভারতের বৃহত্তম নদীগুলোর অববাহিকা ও সমুদ্রোপকূলকে নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে বেছে নেয়। তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলে।

খৃস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে বাংলার এ দ্রাবিড়দের শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের কাছে স্বয়ং বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার নতি স্বীকার করেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন : এদের চার হাজার সুসজ্জিত রণ-হস্তী ও অসংখ্য রণতরী আছে। এ জন্য অপর কোনো রাজা এ দেশ জয় করতে পারেননি। এদের রণ-হস্তীর বিবরণ শুনে আলেকজান্ডার এ জাতিকে পরাস্ত করার দুরাশা ত্যাগ করেন। মেগাস্থিনিশ থেকে শুরু করে প্লিনি, প্লুতর্ক, টলেমী প্রমুখ সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পণ্ডিত এ সময়কার বাংলার অধিবাসীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এ সময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলার এ গৌরবোজ্জ্বল যুগ সম্পর্কে কয়েকজন বিদেশী লেখকের লেখা ছাড়া আমাদের এতদ্দেশীয় বইপত্রে এর কোনো উল্লেখই নেই। বরং এ দেশের আর্য ধর্মশাস্ত্র পুরাণে বাংলার এ রাজবংশকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে আর্যদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র ঋগেদে এ দেশের অধিবাসীদেরকে দস্যু বা দাস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পুরাণ ও

ঋগ্বেদের বক্তব্য থেকে বাংলার দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে আর্যদের ক্রোধ ও আক্রোশের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্রাবিড় ও আর্যবিরোধের মূল কারণ

অবিশ্যি দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে আর্যদের এ ক্রোধের মূলে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণই নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণও রয়েছে। দ্রাবিড়ীয় ও আর্য সভ্যতার মূল সংঘাত ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত। আর্যরা ছিল শির্‌কবাদী সভ্যতার পূর্ণ অনুসারী। তারা অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, গগন, পবন, ঝড়, বৃষ্টি, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা করতো। পরে প্রস্তর পূজা ও মূর্তি-পূজাও তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। যাগ-যজ্ঞ ও বলিদান ছিল তাদের পূজার অঙ্গ। দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তারা নর বলিদান করতো।

আর্য আগমন কালে দ্রাবিড়দের ধর্ম কি ছিল এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য জানা না গেলেও আর্যরা যে দ্রাবিড়দের ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল তা বেদ প্রভৃতি আর্য ধর্মগ্রন্থাদি থেকে জানা যায়। দ্রাবিড়দের তৈরী যে উন্নততর সিন্ধু সভ্যতাকে আর্যরা ধ্বংস করেছিল তার ধর্ম কি ছিল এ নিয়ে বহু গবেষণার পরও পণ্ডিতগণ কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। মহেনজোদাড়ো, হরপ্পা ও চানহুদাড়োতে যেসব ক্ষুদ্রাকৃতির মৃত্তিকা নির্মিত খেলনা ও সীল পাওয়া গেছে সেগুলো থেকে কেউ কেউ মূর্তি ও দেব-দেবীর কল্পনা করেছেন।[৪] বিভিন্ন বড় বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে এগুলো পাওয়া গেছে। এ বাড়িগুলোর মধ্যে পূজানুষ্ঠানের ন্যায় কিছু নিদর্শন কল্পনা করা হয়েছে। অথচ এ ধরনের কোনো কোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষকে হয়তো উপাসনালয় বলে সন্দেহ করা যায় কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোনো বিগ্রহ, বেদী বা শির্‌কীয় ধর্মানুষ্ঠানমূলক অন্য কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৫]

আমাদের মতে সিন্ধু সভ্যতায় ধর্মীয় সংঘাত ছিল। দ্রাবিড়গণ ছিলেন সেমেটিক। কাজেই তৌহীদবাদী সভ্যতারও সেখানে অস্তিত্ব ছিল। উপরোক্ত উপাসনালয়গুলো ছিল এ তৌহীদবাদী নিরাকার আল্লাহ্‌র উপাসনালয় মসজিদ সদৃশ। হরপ্পায় আবিষ্কৃত সুবিশাল ও সুরক্ষিত সৌধের পরিচয় থেকে হুইলার (WHEELER) অনুমান করেছেন, সুমের ও আক্কাদের মতোই সিন্ধু সাম্রাজ্যও খুব সম্ভব কোনো রকম 'পুরোহিতরাজের' শাসনে ছিল বা এ শাসন ব্যবস্থার প্রধানতম অঙ্গ ছিল ধর্ম।[৬] সম্ভবত হুইলারের এ অনুমান মিথ্যা নয়। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে আল্লাহ্ নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষের জীবন সংস্কারের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী দেশের শাসন পরিচালনারও ব্যবস্থা করেন। সিন্ধু সাম্রাজ্যে প্রথম দিকে সম্ভবত এ ধরনের কোনো নবীর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। নবীর তিরোধানের পর

সেখানে শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটলেও শাসন ব্যবস্থায় তখনও তৌহীদের প্রভাব ছিল। এ সময় বহিরাগত শির্কবাদী ধর্মের অনুসারী আর্যদের সাথে তাদের সংঘষ ও বিরোধ বাধে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতায় তৌহিদী ধর্মের প্রভাবের ফলে যরথুষ্ট্রীয় সত্য ধর্মের সাথে সংঘাতে পরাজিত ও পলায়নপর আর্যরা স্বাভাবিক কারণেই তাদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠে।

আর্য ধর্মের পটভূমি

এ প্রসঙ্গে আর্যদের ধর্মীয় জীবনের পটভূমির উপর কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত হিন্দুস্তানে আর্য উপনিবেশ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। পাঞ্জাব থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের বেনারস পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। এর পূর্বে কয়েক শত বছর ধরে তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। নিছক অধিকতর উর্বর জমি ও উপযোগী আবহাওয়া যাযাবর আর্যদেরকে হিন্দুস্তানে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করেনি, বরং বাদশাহ গশ্‌তাসপের আমলে তাদের মাতৃভূমি ইরানে ধর্ম নিয়ে যে মতবিরোধ, আত্মকলহ ও পরিণামে ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়েছিল তার ফলেই তাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের পথে পাড়ি জমাতে হয়। যরদাশ্‌ত (যরথুষ্ট্র) সেখানে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তার ধর্মের মূল কথা ছিল : আহুরা-মাজদা বা জ্ঞানময় আল্লাহ্ হচ্ছেন পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু। কাজেই মানুষ কোন দেব-দেবীর ইবাদত বা পূজা-অর্চনা করবে না। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে। সোমরস বা অন্য কোনো মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা হারাম। পরকাল ও কর্মফলকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

যরদাশ্‌ত তাঁর সত্যধর্ম প্রচার করে চললেন। কিন্তু বহু বছর পর্যন্ত তিনি বিশেষ কেনো সাফল্য লাভ করতে পারেননি। প্রথম দশ বছরে মাত্র একটি লোক তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর রাজদরবারে তিনি নিজ ধর্ম প্রচারের সুযোগ পান। সেখানে মন্ত্রীর দুই পুত্র ও রাণী তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর জ্ঞানীদের সাথে এক বিতর্কে জয়লাভ করার পর বাদশাহ গশ্‌তাসপও তাঁর ধর্মের বিশ্বস্ত অনুসারী হয়ে পড়েন। গশ্‌তাসপের সাথে তাঁর সভাসদগণও যরদাশ্‌তের সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সময় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের চিরন্তন পোষক ও সমর্থক পণ্ডিত-পুরোহিতের দল বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। দেশের সরকার ও নূতন ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সুযোগে তুরানীরা ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে। নবদীক্ষিত মুসলমানরা

একে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এ জিহাদকে শেষ পর্যায়ে পৌছিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। এর ফলে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ও শির্‌কবাদী সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহী মুশরিক গোষ্ঠীগুলো পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে চলে যেতে থাকে।[৭]

দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা

সত্য ধর্ম বিরোধী যাযাবর আর্যদের বিভিন্ন দল সুবিধাতো বিভিন্ন দিকে চলে যেতে থাকে। তাদের বৃহত্তম দলটি পার্শ্ববর্তী পামীর মালভূমি অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে দ্রাবিড় জাতির সাথে তাদের সংঘর্ষ ও বিরোধ বাধে। দ্রাবিড়রা আর্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে গাঙ্গেয় মোহনা পর্যন্ত তারা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তারা বন্য জন্তু-জানোয়ারকে পোষ মানাতে জানতো। গো-পালন ও অশ্বচালনা বিদ্যাও তাদের আয়ত্তাধীন ছিল। কৃষিকাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। তারা উপাসনালয় ও গৃহ নির্মাণ করা জানতো। মিসর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও ক্রীটের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় উপকূল দিয়ে তারা ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক ও তমদ্দুনিক সম্পর্ক কায়েম রেখেছিল। মোট কথা, তারা নাগরিক সভ্যতার অধিকারী ছিল। তারা ছিল সেমেটিক একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের উত্তরসুরি।

আর্যদের অগ্রগতি

আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার পর রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিজয় লাভের জন্যও মরিয়া হয়ে ওঠে। এটি সম্ভবত ইরানে সত্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের শতাব্দীকালীন বিরোধ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিক্রিয়া। এ জন্য দীর্ঘকাল ধরে তারা নিজেদের সমুদয় শক্তিকে একত্র করার অভিযান চালায়। আর্য ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় এ সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। মনু ব্যবস্থা দিয়েছেন ঃ "আর্যরা আর্যাবর্তের বাইরে কোনো স্থানে জন্মলাভ করলেও তাদের আর্যাত্ব নষ্ট হয়ে যায় না।" হিন্দুস্তানের বাইরে অবস্থানরত স্বধর্মাবলম্বীদেরকে হিন্দুস্তানে ফিরিয়ে এনে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল এ ব্যবস্থাপত্রের উদ্দেশ্য। এভাবে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করে আর্যরা সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অভিযান চালায়। আর্যদের দলীয় শক্তি, উন্নততর অস্ত্র ও কলা-কৌশলের কাছে দ্রাবিড়রা পরাভব স্বীকার করে। নবাগত শত্রুর ভয়ে তাদের অধিকাংশ দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে সরে আসে। আবার অনেকেই তাদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

আর্য ধর্মশাস্ত্র ঋগ্বেদে দ্রাবিড়দেরকে দাস ও দস্যু নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের বর্ণনা মতে আর্যরা দাসদের সাথে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ঋগ্বেদে দাসদেরকে ধ্বংস করার জন্য বারবার দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সব প্রার্থনায় পঠিত ভজনগুলো দেখে মনে হয় ভজন প্রণেতাগণ দাস তথা দ্রাবিড়দের অর্থ-সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস হতে দেখার চেয়ে অধিক আনন্দ আর কিছুতেই পেতেন না। দ্রাবিড়দের প্রবল প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার কারণে আর্যদের বিজয় অভিযান দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে পারেনি বিন্ধ্য পর্বত পার হতে এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে প্রবেশ করতে তাদের শত শত বছর লেগে যায়। খৃস্টের জন্মের কয়েক শত বছর পূর্ব পর্যন্তও বাংলায় আর্যরা কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

উত্তর ভারতের সর্বত্র আর্যরা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে। পরাজিত দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতি লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের অনেকেই আর্য ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ অনার্য জাতি শত্রুধর্ম গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে বাংলার দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘাত সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এ জন্য শত শত বছর ধরে আর্য ধর্মশাস্ত্রগুলোর মাধ্যমে আর্য জনগোষ্ঠীর মনে বাংলার অধিবাসী দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে এক বিষাক্ত আক্রোশ জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি আর্য ধর্মশাস্ত্রগুলোয় এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌধায়ণ ধর্মসূত্রে দ্রাবিড় ও অনার্য অধ্যুষিত বাংলাভূমিকে ম্লেচ্ছদেশ গণ্য করা হয়েছে এবং এ দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করলেও আর্য সন্তানের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলার দ্রাবিড়রা আর্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে তারা আর্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। খৃস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মৌর্য বিজয়কাল থেকে এ প্রভাব বিস্তারের কাজ শুরু হয় এবং গুপ্ত রাজত্বকালে (৩২০-৫০০ খৃ.) চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলাদেশে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।

---

১. হযরত নূহ আলায়হিস সালামের সময় মানব বংশধারা খুব বেশি বিস্তার লাভ করতে পারেনি। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নূহকে আদমের দশম অধস্তন পুরুষ হিসাবে দেখা যায়। তাঁর সময় মানব বসতি ইরাকে আরবের দাজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই নদী দু'টির উৎপত্তি আর্মেনিয়ার উচ্চ পার্বত্য এলাকায়। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে কুর্দিস্তান ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী বিশাল এলাকাকে প্লাবিত করে ইরাকের নিম্নাঞ্চলে গিয়ে এই ধারা দু'টি একত্রে মিশে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। এই দুই নদী-প্লাবিত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকাতেই তখন জনবসতি ছিল বলে মনে করা হয়।

২. বাংগালীর ইতিকথা–অধ্যাপক আখতার ফারুক, ৪০-৪৬ পৃষ্ঠা।

৩. বাংগালীর ইতিকথা।

৪. আর্য আগমনকালীন দ্রাবিড়দের ধর্মকে যারা চোখ বন্ধ করেই পৌত্তলিক ধর্ম বলে চিত্রিত করেছেন তাদের এ চিন্তার পেছনে ঐ মাটির খেলনা ও সীলগুলোই মূল প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু একটি জাতির ধর্মীয় জীবনাঙ্গন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এতটুকু প্রমাণ যথেষ্ট হতে পারে না। তবে এ থেকে এতটুকুন অবশ্যি বলা যায় যে, তদানীন্তন দ্রাবিড়দের ধর্মীয় জীবনে শির্‌কের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু তার পরিধি অনুমান করা সম্ভব নয়।

৫. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শন, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৬. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শন, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৭. আল মিলাল ওয়ান নিহাল ঃ ইমাম ইবনে হাযম ও সাহরাস্তানী, ২—৮০ পৃষ্ঠা।

৭. আল মিলাল ওয়ান নিহাল ঃ ইমাম ইবনে হাযম ও সাহরাস্তানী, ২—৮০ পৃষ্ঠা।

প্রাক-ইসলাম যুগ

প্রাক-ইসলাম বাংলাদেশ

সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরবে ইসলামের চিরন্তন সত্য বাণী প্রচার করছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর, সুষ্ঠু ও সংস্কারমুক্ত জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার শেষ শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র বিশ্ব-মানবতাকে অন্ধকার, অজ্ঞানতা ও পংকিলতা মুক্ত করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। কাজেই তাঁর পরবর্তী কালে তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবাবৃন্দ ইসলামের সত্য জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ সময় আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যেও উন্নত ছিল। তাদের বাণিজ্যবহর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতো। মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমানে কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন।[১] শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর 'তুহ্ফাতুল মুজাহিদীন ফী বা'যে আহওয়ালিল বারতাকালীন' গ্রন্থে এ রাজার শেষ নবী (সা) সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সময় মালাবারের বহুসংখ্যক হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করে।

আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীনদেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। কাজেই বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো। এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্তি (বর্তমানে তমলুক) ও শৎগঙ্গ (বর্তমানে চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর।[২] দক্ষিণের উপকূল পথে এ সময় ইসলামের সত্য বাণী বাংলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া বিজয়ের (১২০৪ খৃ.) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্য বাণী বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকে। বখতিয়ার খলজীর বাংলা অভিযানের পর এ ধারা পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হয়। এ পর্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ধারা অনুধাবন করতে হলে বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ অভিযানের পূর্বে সপ্তম

থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ছয়'শ বছরের বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ পর্যন্ত বাংলার অনার্য অধিবাসীরা আর্যদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিহত করে আসছিল। কিন্তু খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষের দিকে (৩২৩ খৃ. পূ.) পাটলিপুত্রে নন্দরাজ বংশের পতন ও শক্তিশালী মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় আর্যদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ অবধি গুপ্ত রাজবংশের অধিকার পর্যন্ত ৮০০ বছরের মধ্যে বাংলায় আর্যদের পরিপূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ প্রভাব সর্বগ্রাসী রূপ নেয়। দ্রাবিড় ও অনার্য শক্তি স্তিমিত হবার সাথে সাথে আর্য ও হিন্দু দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে থাকে।

শশাঙ্কের শাসন ও কার্যাবলী

৬০৬ অব্দের পূর্বে রাজা শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণ সুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিহার, উৎকল, দণ্ডভূক্তি (মেদিনীপুর জেলা) ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। পূর্বে বঙ্গও তার রাজ্যভুক্ত হয় এবং কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মাকেও তিনি পরাজিত করেন। তিনি মালারাজ দেবগুপ্তের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাহায্য মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং তাঁর স্ত্রী ও থানেশ্বর রাজের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। ফলে মৌখরি রাজবংশের মিত্র থানেশ্বর রাজের সাথে তাঁর সংঘর্ষ ও বিরোধ বাধে। থানেশ্বর রাজ রাজ্যবর্ধনকে তিনি কৌশলে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। হর্ষ চরিত রচয়িতা বানভট্টের বর্ণনা মতে হর্ষবর্ধন নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৃথিবী গৌড়শূন্য করার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে হর্ষ-শশাঙ্ক সংঘর্ষের পরিণাম সম্পর্কে কোনো সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়নি।

হর্ষবর্ধন তাঁর শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরও তিনি আর্যাবর্তে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তাঁর বর্ণনা মতে

৬৩৭ খৃস্টাব্দের অনতিকাল পূর্বে শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ[৩] ছেদন করেন এবং নিকটবর্তী মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি সরাবার আদেশ দেন। এর ফলে শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে ক্ষত হয়, তাঁর মাংস পচে যায় এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। শশাঙ্ক একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি শিবের উপাসনা করতেন। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে হিন্দু ধর্ম প্রচার ও বিস্তারের পথে সমুদয় বাধা দূর করার চেষ্টা করেন। তদানীন্তন ভারতের বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর বৈরী মনোভাব ও নীতির কথা হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। শশাঙ্কের ক্ষমতাসীন হবার পূর্বেই বাংলায় আর্য তথা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন হয় এবং এ সমাজের প্রধান অঙ্গ বর্ণাশ্রম প্রথা সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। শশাঙ্ক এ বিভেদমূলক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করেন।

শতাব্দীকালীন রাজনৈতিক অরাজকতা

শশাঙ্কের হিংসা ও দমন নীতির পরিণাম মোটেই সুখকর হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরই বাংলায় দেখা দেয় অরাজকতা। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অরাজকতা চরমে পৌঁছে। বাংলার ভিতরে অনৈক্য আত্মকলহ দেখা দেয়। এ সুযোগে বহিঃশত্রুও পুনঃ বাংলা আক্রমণ করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করতে থাকে। হর্ষবর্ধন ও কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা একযোগে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে শশাঙ্কের রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উক্ত হয়েছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এখানে একাধিক রাজার অভ্যুদয় হয়। তাদের কেউ কেউ এক সপ্তাহ বা একমাস রাজত্ব করেন। এ যুগের প্রায় এক হাজার বছর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামা তারানাথ এ যুগের বাংলা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ সমগ্র দেশে কোনো রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত লোক ও বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। প্রবলরা অবাধে দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাতো।

রাজনৈতিক নৈরাজ্য থেকে মুক্তি

এ অরাজকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তৎকালীন বাংলার অধিবাসীরা চরম রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়। দেশের নেতাগণ একত্রিত হয়ে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা নির্বাচন করেন। এভাবে পাল রাজবংশের প্রথম রাজা গোপাল ৭৫০

অব্দে দেশের জনসাধারণের মতানুযায়ী রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাল রাজবংশের সকল রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পাল রাজারা বাংলায় ৪০০ বছর (৭৫০-১১৬২ খৃ.) রাজত্ব করেন।

পাল রাজাগণের শ্রেষ্ঠ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০) বাংলা থেকে পশ্চিমে সিন্ধু ও গান্ধার, দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র, বিন্ধ্য এবং উত্তরে নেপাল পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এ বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলা ও বিহার ধর্মপালের নিজ শাসনাধীন ছিল এবং অন্যান্য রাজা ধর্মপালের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতেন। প্রাচীন পাটলিপুত্র ও বর্তমান দিল্লীর ন্যায় তৎকালে কান্যকুব্জ সমগ্র আর্যাবর্তের রাজধানী রূপে বিবেচিত হতো। ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করার পর কান্যকুব্জে এক বৃহৎ রাজ্যাভিষেকের দরবার অনুষ্ঠান করেন। এ রাজদরবারে আর্যাবর্তের বহু সামন্ত নরপতি উপস্থিত হয়ে ধর্মপালের অধিরাজত্ব স্বীকার করেন। তিনি প্রাচীন পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) রাজধানী স্থাপন করে এ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন। সারাজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করলেও তিনি রাজ্যে এমন শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন যা সমগ্র ভারতে আজও দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। পাল রাজাগণের চারশ বছরের শাসনকাল বাংলার মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠার যুগ। মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে দেশ পর পদানত, অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল সেই দেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে বাংলার মানুষের জীবনে নবপ্রভাতের সূচনা করলো।

ধর্মপাল বহু বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। তিব্বতীয় লেখক তারানাথের মতে ধর্মপাল ধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও তিনি সহায়তা করেন। গর্গ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। হিন্দু সমাজ বিধানের বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তাঁর পরবর্তী রাজা দেবপাল অন্তত ৩৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে পালরাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। তাঁর সেনাদল ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধুনদের তীর এবং সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিজয় অভিযান চালিয়েছিল। ভারতের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মালয়, যবদ্বীপ ও সুমাত্রার অধিপতি তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সময় নালন্দা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালের অনুরূপ শক্তি ও সমৃদ্ধির পরিচয় এর পূর্বে আর কখনও পাওয়া যায়নি।

দেবপালের পর বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, মহীপাল, রামপাল প্রভৃতি পালবংশের বহু শাসক প্রায় তিন শতাব্দীকাল বাংলাদেশ শাসন করেন। কিন্তু এদের মধ্যে মহীপাল ও রামপাল ব্যতীত আর কোনো শাসকই সফলতা লাভ করতে পারেননি। এ সময় বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। বিশাল পাল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। গৌড়ে (তৎকালীন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ) কম্বোজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

একখানি তাম্রশাসনে এ যুগে পূর্ব বঙ্গে একটি নতুন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এ রাজবংশ দেববংশ নামে খ্যাত। ভবদেব ছিলেন এ রাজবংশের শক্তিশালী রাজা। সম্ভবত কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত দেব পর্বত ছিল এ রাজাদের রাজধানী। ইতিপূর্বে কুমিল্লার-ময়নামতি পাহাড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে যে কতিপয় তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এ রাজবংশ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ময়নামতির শালবন বিহার নামে পরিচিত বৌদ্ধ বিহারটি রাজা ভবদের কর্তৃক নির্মিত। এ রাজবংশে বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে। সম্ভবত দেবপালের পরবর্তী দুর্বল পাল রাজাগণের আমলে দেব বংশীয় রাজাগণ পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এ অঞ্চলে কান্তিদেব নামে আর একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি সম্ভবত পূর্বোক্ত দেব বংশীয় রাজাগণের পরবর্তী। কিন্তু দেব বংশের সাথে এঁর কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানা যায়নি, তিনি হরিকেলে রাজত্ব করতেন। হরিকেল বলতে সাধারণত পূর্ববঙ্গ বোঝায়। কান্তিদেব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

কান্তিদেবের পরে প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্র বংশ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজত্ব করেন। মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্রই এ বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা। তাঁর পিতা সুবর্ণ চন্দ্র ও পরবর্তী এ বংশের সকল রাজাই বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ছিলেন। ত্রৈলোক্য চন্দ্র হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ জয় করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল ক্ষীরোদা নদীর তীরে দেবপর্বতে। ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পর শ্রীচন্দ্র রাজা হন। তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। তিনি অন্তত ৪৪ বছর রাজত্ব করেন। তিনি গৌড় ও কামরূপ রাজের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রের পরে কল্যাণ চন্দ্র, লডহ চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র পর্যন্ত এ চারজন চন্দ্র বংশীয় রাজা ঊর্ধ্বতন ১২০ বছর রাজত্ব করেন। গোবিন্দ চন্দ্রের আমলে দাক্ষিণাত্যের শৈব ধর্মাবলম্বীর চোল রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করেন।

হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় দমন নীতি

একাদশ শতকের শেষভাগে যখন পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন পূর্ববঙ্গে বর্ম উপাধিধারী এক রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ম রাজারা বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেন এ রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে এ বর্ম রাজাগণ জড়িত। এ বর্ম রাজাগণের মধ্যে হরিবর্মা, জাতবর্মা, সামল বর্মা ও ভোজবর্মাই অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদের রাজনৈতিক বিজয় সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায়নি। তবে বাংলায় হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সাথে তাঁদের নাম জড়িত।

পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা রামপালের মৃত্যুর পর যখন পাল রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় তখন বিজয় সেন নামক জনৈক শক্তিশালী সামন্ত রাজা সমগ্র বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন। তিনি বর্ম রাজকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করেন। এ সেন রাজাগণ সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁদের পূর্ব পুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে বাংলায় আগমন করেন এবং এক শতাধিক বছরকাল এ দেশে রাজত্ব করেন। বাংলার সীমানা পেরিয়ে তাদের রাজত্ব কামরূপ ও কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

লক্ষ্মণ সেন

এ বংশের শক্তিশালী রাজা লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯–১২০৫ খৃ.) ২৬ বছর রাজত্ব করেন। তিনি লক্ষ্মণাবতীতে (লখনৌতি) রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নদীয়া (নবদ্বীপ)। যৌবনকালে তিনি পিতা বিজয় সেনের সাথে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১১৯৬ অব্দের একখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, ডোম্মন পাল নামক এক ব্যক্তি সুন্দরবনের খাড়ি পরগণায় বিদ্রোহী হয়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সময় ১২০৪ খৃস্টাব্দে যখন তিনি রাজধানী নদীয়ায় (নোদীয়া) অবকাশ যাপন করছিলেন তখন মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী এক বিরাট সেনাবাহিনী পশ্চাতে রেখে অতি দ্রুতগতিতে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন যুদ্ধে অসমর্থ হয়ে রাজপুরীর পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে বের হয়ে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। সেখানে অল্পদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর বংশধরগণ ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন। অতঃপর বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণাবতী (লাখনৌতি)

অধিকার করেন এবং নদীয়া ত্যাগ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবত লক্ষণ সেনের আমলেই প্রাচীন গৌড় নগরীর লক্ষণাবতী নামকরণ করা হয়। সমগ্র মুসলিম শাসন আমলে এ শহরটি লখনৌতি ও গৌড় নামে পরিচিত থাকে।

কোনো কোনো হিন্দু ঐতিহাসিক ১৮ জন মুসলিম সেনা কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের ঘটনাকে অলীক[৪] কল্পনা-প্রসূত বলে দাবি করেছেন। এমন কি নদীয়া কোনোদিন সেন রাজাদের রাজধানী ছিল এ কথা মানতেও তাঁরা দ্বিধান্বিত।[৫] তাঁদের এ দাবির কারণ স্বরূপ যা জানতে পারা যায় তা হচ্ছে এই যে, মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সেনার ভয়ে পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে পালিয়ে যাবার মতো কাপুরুষ লক্ষণ সেন ছিলেন না।[৬] যৌবনে তিনিও একজন বিজেতা ছিলেন। সমগ্র বাংলার প্রবেশ-দ্বার রাজমহল ও গৌড় দখল না করে বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করতে পারেন না।

দাবির কল্পরাজ্যে মূলত তাঁরা সত্যকে আত্মসাৎ করে গেছেন। ঐতিহাসিক সত্য ও সততার পরিবর্তে তাঁরা জাতীয় পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা পূর্ব থেকে একটি বদ্ধমূল ধারণার শিকার হয়েছেন। তাঁরা ধারণা করে নিয়েছেন যে, লক্ষণ সেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, দানশীল ও প্রজাবৎসল রাজা, বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত। বখতিয়ার খলজীর ন্যায় এক লুটেরা (তাঁদের ধারণা মতে) হঠাৎ কেমন করে এ শান্তি রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে ? আসলে সত্যিই কি বাংলা রাজ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছিল ? মোটেই নয়। বরং বাংলার অভ্যন্তরে এক নীরব বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। একদিকে বর্ণাশ্রম রীতি ও ব্রাহ্মণকে সমাজপতির আসনে বসাবার কারণে বাংলার সমাজে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং সমাজ-অঙ্গনে উঁচু-নীচের বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে বর্ম-রাজাদের ন্যায় সেন-রাজাগণও ছিলেন হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষক। তাঁরা বৈদিক ও পৌরানিক ধর্মকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও অনার্যদের অন্য সকল ধর্মমতের টিকে থাকার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

বাংলার অভ্যন্তরের চিত্র তখন কি ছিল ? এখানে আমরা এর একটু আভাস দিচ্ছি। একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংলা বর্ম ও সেন রাজাদের দ্বারা শাসিত হলেও মূলত তা ছিল ব্রাহ্মণ-শাসিত রাষ্ট্র। সামাজিক ক্ষেত্রের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণ পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পাল আমল থেকে ব্রাহ্মণদের এ রাজনৈতিক আধিপত্য শুরু হয়েছিল। পাল আমলে দর্ভপানি কেদার মিশ্রের বংশ এবং বৈদ্যদেবের বংশ রাজকার্য পরিচালনা করতেন। বর্মরাষ্ট্রে ভবদেব ভট্টের বংশ এবং

সেন আমলে হলায়ুধের বংশ রাজকার্য পরিচালনা করতেন। হিন্দুযুগে ব্রাহ্মণগণের এ রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ফলে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক নিগ্রহ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে নেপালে আবিষ্কৃত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে এর বহু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মেলে। এ চর্যাপদগুলো দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত। এর একটি পদে কবি ঢেণ্ডনপাদ বলছেন ঃ

জো সো বুধি সোহি নিবুধি।
জো সো চোর সোহি সাধী ॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সমজুঝই।

অর্থাৎ "যে বুঝে সে নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু—প্রতিদিন শিয়াল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে।" সিংহ হচ্ছে পশুর রাজা। রাজা যেখানে অত্যাচারী হয়ে ওঠে সেখানে প্রজার দুর্গতি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সেকালের বৌদ্ধ তথা বাংলার সাধারণ মানুষের উপর হিন্দু রাজন্যবর্গের অত্যাচার কত চরমে পৌঁছেছিল, কি কঠিন ছিল সেই জীবন-সংগ্রাম যেখানে শিয়ালের মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকবার চেষ্টা করছে।

আর একটি চর্যায় কবি ভুসুকুপাদ বলেছেন ঃ

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহুঁ কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদিস ॥
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী।
তিন ন ছবুই হরিণা পিবই না পানি।
হরিণা হরিণীর নিলঅ না জানি ॥
হরিণী বোলই হরিণা সুন তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥

অর্থাৎ "কাকে নিয়ে (বা কাকে) ছেড়ে কেমন করে আছো। আমাকে ঘিরে চারদিকে হাঁক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ (নিজের) শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারী ভুসুকু (তাকে) ছাড়ে না। হরিণ ঘাসও ছোঁয় না, পানিও পান করে না। হরিণ-হরিণীর নিলয় জানা যায় না। হরিণী বলে—হরিণ, তুমি শোনো, এ বন ছেড়ে দূরে চলে যাও।" ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষ্যমতে এখানে হরিণের স্থানে যদি ভুসুকুকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজে বিচরণশীল মানুষটিকে বসানো যায় তাহলে চিত্রটা এরূপ দাঁড়ায় ঃ ভুসুকুকে মারবার জন্য চারদিকে ষড়যন্ত্রের কলরব শোনা

যাচ্ছে। তার নিজের গুণের জন্যই তার এ বিপদ। তাই মনের দুঃখে সে পানাহার ত্যাগ করেছে। কিন্তু মুক্তির পথ কি তা সে জানে না। মুক্তির প্রেরণা তাকে বলছে, এ এলাকা ছেড়ে আর কোথাও চলে যাও। .... এ চিত্রটি এবং ভুসুকুর অচেতন অব্যক্ত মুক্তি প্রেরণা বিন্দুমাত্রও অসঙ্গত মনে হয় না।[৭] রাজার অত্যাচারে এদেশ আর বাসযোগ্য নয়। এদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রেরণা তাই জাগে সহায়-সম্বলহীন অত্যাচারিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মনে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক দেবেন্দ্র কুমার ঘোষের বক্তব্যটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ "পাল বাংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেনবংশের রাজারা সবাই ব্রাক্ষণ্য ধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বংগদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজা তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোও তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।"[৮]

হিন্দু রাজাদের হিংসা ও দমন নীতি বাংলার সাধারণ মানুষকে এভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে ধীরে ধীরে তা দেশব্যাপী এক চাপা বিক্ষোভ ও আক্রোশে পরিণত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত তাঁর শূন্য পুরাণে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কবিতায় দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের জুলুম ও নিষ্পেষণের চিত্র এঁকেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

জাজপুর পুরবাদি, সোল শঅ ঘর বাদি
বেদি লয় কন্নএ নগুন।
দক্ষিণা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন ॥
মালদহে লাগে কর, ন চিনে আপন পর
জালের নহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইআ বড় দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ ॥
বেদে করি উচ্চারণ বের্য়াঅ অগ্নি ঘন ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।

মনেত পাইআ মর্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহরণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধর্ম, মনেত পাইআ মর্ম,
মায়াত হইল অন্ধকার ॥

আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করলে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ

জাজপুরে (উড়িষ্যা) ষোল'শ বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তারা কানে পৈতা তুলে দক্ষিণা চাইতে যায়। যার ঘরে দক্ষিণা পায় না তার সংসার অভিশাপ দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। মালদহে তারা আপনপর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়—তাদের জাল জুয়াচুরীর শেষ নেই। তারা বড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, দল বেঁধে (দশ বিশ জড় হয়ে) সদ্ধর্মীকে (বৌদ্ধ জনসাধারণকে) বিনাশ করছে। তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের মুখ থেকে ঘন ঘন অগ্নি বের হয়,—সকলে তা দেখে কম্পমান। সকলে মনে মনে এর অর্থ বুঝে বলে—"হে ধর্ম দেবতা রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কে (আমাদের এ বিপদ থেকে) উদ্ধার করবে ?" ব্রাহ্মণেরা এভাবে সৃষ্টি বিনাশ করতে লাগলো, এ যে বড় অত্যাচার। ধর্ম দেবতা বৈকুণ্ঠে বসে মনে মনে সব বুঝতে পেরে মায়াতে আচ্ছন্ন হলেন।

বাংলায় যে সময় সাধারণ মানুষের উপর এ সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতন চলছিল সে সময় দশম-একাদশ শতক থেকে আল্লাহ্‌র মনোনীত সত্য ধর্ম ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত সমগ্র বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র। ইসলামের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণ ইসলামের সত্য বাণী প্রচার করার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছিলেন। দ্বাদশ শতকের শেষ অবধি বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকার অভ্যন্তরে একটি নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলছিল। বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর থেকে আর্যদের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল ইসলামের আগমন তাদের সে প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রতি-আক্রমণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার অধ্যায়ে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা পেশ

করবো। তাই দেখা গেছে ইসলাম প্রচারকদের সাথে কুফরী শক্তির সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রে বাংলার সাধারণ মানুষ ইসলাম প্রচারক আলেম-সূফী-মুজাহিদগণের সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে এবং ইসলামের সামান্য শক্তি বিপুল কুফরী শক্তির মোকাবিলায় জয়যুক্ত হয়েছে।

বাংলায় যখন এ অন্তর্বিপ্লব চলছিল তখন দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করে ভারতে মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। দিল্লীর পরবর্তী মুসলিম শাসনকর্তা কুতুবুদ্দীন আইবকের সময় মুসলিম শাসন বিহার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মুসলিম শাসনের সুফল-বার্তা বাংলার অভ্যন্তরেও পৌছে। বাংলার অন্তর্বিপ্লবের গতি এতে দ্রুত হয়। এ বিপ্লবের মুখে রাজধানী শহরেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে ভীতি, হতাশা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন প্রধান রাজধানী শহর লক্ষণাবতী ত্যাগ করে অবকাশ যাপনকালীন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বিহারের বিভিন্ন স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে করতে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং অতর্কিত আক্রমণে রাজ বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে রাজপ্রাসাদ অধিকার করলেন। বৃদ্ধ রাজা গত্যন্তর না দেখে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পলায়ন করলেন।

বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের কাহিনী ঐতিহাসিক মিনহাজুস সিরাজ তাঁর 'তাবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। মিনহাজ দিল্লীর সুলতানের অধীনে উচ্চতর রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নদীয়া বিজয়ের প্রায় ৪০ বছর পর হিজরী ৬৪১ অব্দে (১২৪৪ খৃ.) মিনহাজ গৌড়ে আগমন করেন এবং সেখানে নদীয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিজাম উদ্দীন ও শামসাম উদ্দীন নামক দু'জন বৃদ্ধ সৈনিকের কাছ থেকে নদীয়া জয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালের প্রায় সকল ঐতিহাসিক মিনহাজের এ বিবরণের উপর নির্ভর করেছেন।

মিনহাজ তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণে লিখেছেন ঃ "........... পরবর্তী বছর মুহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর সেনাবাহিনী সজ্জিত করলেন। তিনি বিহার থেকে যাত্রা করলেন। এত দ্রুত অগ্রসর হয়ে তিনি অতর্কিতভাবে নদীয়া শহরে প্রবেশ করলেন যে, মাত্র ১৮ জন সৈনিক তাঁর সঙ্গে ছিল। বাকি সৈন্যদল পিছনে আসছিল। নগরদ্বারে পৌছে তিনি কাউকে কিছু না বলে নীরবে ধীরে-সুস্থে সামনে এগিয়ে গেলেন। যার ফলে কেউ তাঁকে মুহাম্মদ বখতিয়ার বলে অনুমান করতে পারলো না। তবে খুব সম্ভবত লোকেরা মনে করেছিল, এরা একদল সওদাগর এবং মূল্যবান অশ্ব বিক্রয় করাই এদের কাজ। যখন তিনি রায় লখমনিয়ার প্রাসাদ দ্বারে উপনীত হলেন, তখন তরবারি উন্মোচন

করে অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা করতে লাগলেন। ঐ সময় রায় লখমনিয়া ...... আহারে বসেছিলেন .... এমন সময় তাঁর প্রাসাদ দ্বার ও শহরের মধ্যস্থল থেকে তুমুল কলরব শোনা গেল। রাজা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হবার পূর্বেই মুহাম্মদ বখতিয়ার রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন এবং বহু লোককে হত্যা করলেন। তখন রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পলায়ন করলেন।"

বখতিয়ার খলজী বিহার থেকে নদীয়ায় কিভাবে পৌঁছলেন মিনহাজের বর্ণনায় তার কোন উল্লেখ নেই। রাজমহলের পথে বাংলায় প্রবেশ করলে অবশ্য গৌড়রাজের সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর সংঘর্ষ হতো। ফলে নদীয়ায় বসে লক্ষণ সেন যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারতেন। তাই আমাদের মনে হয় বখতিয়ার খলজী অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রাজমহলের স্বাভাবিক পথ অবলম্বন না করে রাজমহলের দক্ষিণে ঝাড়খণ্ডের নিবিড় বনানীর পথ অবলম্বন করেন। এভাবে বাংলার সেনাদলের চক্ষু এড়িয়ে নদীয়ায় উপস্থিত হন।

অবশ্য নদীয়া তৎকালে সেন রাজাদের প্রধান রাজধানী ছিল কিনা এবং তা কতদূর সুরক্ষিত ছিল সে সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে মিনহাজের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, লক্ষণ সেন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত নদীয়া লক্ষণ সেনের অবকাশকালীন রাজধানী ছিল। 'বাংলার কূলজী' গ্রন্থেও নদীয়াকে সেন রাজাদের রাজধানী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কূলজী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে রাজধানী নবদ্বীপে (নদীয়া) বাস করতেন। রাজা অবশ্যই রাজধানীতে বাস করবেন এ কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি রাজধানী নবদ্বীপে বাস করতেন, একথা বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, নবদ্বীপ বা নদীয়া তাঁর প্রধান রাজধানী ছিল না। দ্বিতীয় বা অবকাশ যাপনকালীন রাজধানী হিসেবে এ শহরটিকে ব্যবহার করা হতো। কাজেই এ শহরটি সেই হিসেবেই সুরক্ষিত থাকবে। সম্ভবত বখতিয়ার খলজী চরমুখে লক্ষণ সেনের তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ায় অবস্থানের কথা শুনে গৌড়ের পথে অগ্রসর না হয়ে নদীয়ায় আগমন করেন।

তবে নদীয়া বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজী নদীয়ায় অবস্থান না করে গৌড় অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন, মিনহাজের পরবর্তী বর্ণনা থেকে এ কথা জানা যায়। আর এর অর্ধ শতাব্দী পর মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহের মুদ্রায় 'নদীয়া' শব্দ অঙ্কিত দেখে এ ধারণা করাও সঙ্গত হবে না যে, নদীয়া জয় করার পর পুনর্বার তা মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যায় এবং ১২৫৫ খৃস্টাব্দে মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহ তা পুনরাধিকার করেন। আর যেহেতু নদীয়া মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যায় কাজেই তা

লক্ষণ সেনের সন্তানদের হস্তগত হয় এবং তারা বীর-বিক্রমে সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন, এটা ঐতিহাসিক কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহের যে সব মুদ্রার বরাত দেয়া হয় সেগুলোতে লিখিত হয়েছে, এগুলো "নদীয়া ও অর্জবদন-এর ভূমি রাজস্ব থেকে প্রস্তুত।" কাজেই এ থেকে এ কথা বোঝায় না যে, মুগীসুদ্দীন য়ুজবকের সময় নদীয়া বিজিত হয়েছিল এবং সেই বিজয়ের স্মারক-মুদ্রা হিসেবে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

আর্যদের আগমনের পূর্বে এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়রাই ছিল প্রধান। বাংলার তৎকালীন দ্রাবিড়দের ধর্মমত ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু দ্রাবিড়রা সেমেটিক ধর্ম অনুসারীদের উত্তর পুরুষ ছিল, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এ হিসেবে তৌহিদবাদ ও আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সম্ভবত তাদের একটি অংশ তখনও তৌহিদবাদের সাথে জড়িত ছিল। এ কারণেই শিরকবাদী ও পৌত্তলিক আর্যদের সাথে বিরোধ চলতে থাকে। এ বিরোধ যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল তার প্রমাণ হিন্দুদের পুরাণাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় আর্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে পাটলিপুত্রের অধিপতি বাংলার নন্দ রাজবংশকে পুরাণে শূদ্র গোষ্ঠীভূত করাই তার প্রমাণ। অবশ্য এর পূর্ব থেকেই যে বাংলায় আর্যদের প্রভাব অনুপ্রবেশ করেনি তা বলা যায় না। কারণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে (ব্রহ্মবর্ত) ও উত্তর ভারতের একাংশে একাধিক আর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে এর কিছু না কিছু প্রভাব বাংলায় অবশ্যই পড়েছে। মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর এ প্রভাব শত গুণে বৃদ্ধি পায়।

আর্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ

আর্যদের ধর্ম সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, তা ছিল তৌহিদবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুন, পবন, প্রভৃতির পূজা করতো। স্বাভাবিকভাবে এ পথে পৌত্তলিকতাও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত হোম, যাগ-যজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের এ সব পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হতো। এ সব পূজা-অর্চনায় পৌরহিত্যকারীদেরকে বলা হতো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করে পূজা কার্য সম্পাদনা করতেন। ধর্মকার্য অনুষ্ঠানে নিজেদের এ প্রাধান্যের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণগণ ধীরে ধীরে নিজেদেরকে ব্রহ্মার অবতার, অতিমানব (Super Human) ও

মানবশ্রেষ্ঠরূপে প্রচার করতে থাকেন। এভাবে আর্যধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পরিণত হয়। আর্যধর্মে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পর সমাজ জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। সমাজে বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়। এ সমাজের পুরোহিত হয় ব্রাহ্মণ, তার নিচে স্থান লাভ করে ক্ষত্রিয়। অস্ত্র চালনা ও শাসনকার্য পরিচালনা হয় তাদের কাজ। তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান লাভ করে বৈশ্যগণ। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কাজ-কারবার হয় তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বনিম্ন শ্রেণীতে সমাজের বিরাট অঙ্গন জুড়ে থাকে শূদ্রের দল। দ্রাবিড়সহ দেশের বিজিত অন্যান্য অনার্য জাতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর্য প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের বিরাট এলাকা জুড়ে এভাবে জন-মানুষের উপর নিগ্রহ চলতে থাকে।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম

এমনি এক সময়ে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। জৈন ধর্মের প্রচারক বর্ধমান মহাবীর খৃস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গৃহে অবস্থান করেন। বিবাহ করে সংসারী হন। তাঁর এক কন্যা সন্তানও জন্মে। কিন্তু ২৮ বছর বয়ঃক্রমকালে মানবতার দুর্দশা দূরীকরণার্থে তিনি গৃহত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হন। একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর ধ্যান, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার পর তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। অতঃপর তিনি এ নতুন ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধর্ম প্রচারের পর খৃস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে বিহারের বাওয়াপুরী নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জৈনগণ বর্ধমান মহাবীরকে নিজেদের ধর্মের প্রবর্তক বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বর্ধমান মহাবীরের হাজার বছর পূর্বের ঋষভ নামক এক ব্যক্তিকে নিজেদের ধর্ম প্রবর্তক বলে মনে করেন। খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতকে পার্শ্বনাথও (মৃত্যু ঃ খৃস্টপূর্ব ৭৭৮) এ ধর্ম প্রচার করে যান। তবে জৈনদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের একমাত্র উৎস হচ্ছেন মহাবীর। আসলে জৈনদের কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থ ছিল না। তাই তাদের সমাজে ও ধর্মীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে জৈনগণ নিজেদের ধর্মীয় বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এ বিধানও মাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের ছিল। অবশেষে ৮শ বছর পরে খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে জৈনগণ বীলা নামক স্থানে এক মহাসম্মেলন আহ্বান করে নিজেদের ধর্মীয় বিধান ও আইন পরিপূর্ণ করেন।

জৈন ধর্মের যথার্থ শিক্ষা কি এ বিষয়ে সবিশেষ কিছু জানা এক দুরূহ কঠিন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমন কি ধর্মের শিক্ষাসমূহ বিকৃতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম

করে আজ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যেখানে এ ধর্মের মূল প্রচারক বর্ধমান মহাবীরকে আল্লাহ্র সৃষ্টি ক্ষমতা অস্বীকারকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। এ অহিংসা মানুষ, জীব-জন্তু, পক্ষী, উদ্ভিদ সবার প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। পরবর্তীকালে এ অহিংসা হিন্দু ধর্মেরও অংশে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ খৃস্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শুদ্ধোধন। যৌবনে তিনি বিবাহ করে সংসার কর্মে রত থাকেন। যশোধরা নাম্নী এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর পুত্রের নাম ছিল রাহুল। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী ও গৃহ-সংসারের আরাম-আয়েশ তাঁর অস্থির চিত্তকে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা দানে সক্ষম হয়নি। মানুষ ও স্রষ্টার অস্তিত্বের গূঢ় রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে তিনি একদা গভীর রাতে সংসারের মায়া ত্যাগ করে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হন। বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আর্য দর্শন তাঁর তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়নি। অবশেষে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। চল্লিশ বছর অবধি অব্যাহতভাবে সত্য ধর্ম প্রচারের পর ৮০ বছর বয়সে খৃস্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে কুশী নগরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন মধ্যদেশ (আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ) সফর করেন। এ সফরে মধ্য দেশের একটি বিরাট প্রভাবশালী ও বিত্তশালী দল তাঁর সত্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাঁর নিজের সমগ্র পরিবার ও গোত্র তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ধর্ম বিপুল সাড়া জাগায়। কিছুকালের মধ্যে তাঁর ধর্ম ভারতের প্রধানতম ধর্মে পরিণত হয়। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির কাছেও তা সমাদৃত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম জাতিভেদকে প্রশ্রয় দেয়নি। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ঃ অহিংসা, দয়া, দান, সৎচিন্তা, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্য সাধন, স্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি মানুষের মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলী দিয়ে ধর্ম পালন করা যায় না। ধর্ম পালন করতে হলে ষড়রিপুকে বশ করে আত্মাকে নিষ্কলুষ করতে হয়।

জৈন ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মের যথার্থ রূপ আবিষ্কার করাও আজ মোটেই সহজসাধ্য নয়। বিকৃতি ও ষড়যন্ত্রের অসংখ্য তরঙ্গাভিঘাতে বৌদ্ধ ধর্মের আসল চেহারা অতলে তলিয়ে গেছে। এমনকি বহু সাধনার পর সত্যের বাণী নিয়ে যিনি আসলেন সেই গৌতম বুদ্ধকে তাঁর অনুসারীরা অবশেষে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব রূপে চিত্রিত করলেন। সত্যধর্মের কোন মহাপ্রচারকই (পয়গম্বর) আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষকে অস্পষ্টতার মধ্যে রাখতে পারেন না। তিনি মানুষকে একমাত্র

আল্লাহ্‌র ইবাদত ও উপাসনা করার প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল প্রকার খোদার আনুগত্য থেকে মানুষকে বিরত থাকার উপদেশ দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। এ মানদণ্ডে বিচার করলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে সত্য ধর্মের গোত্রভুক্ত করা যায় না। কিন্তু এ ধর্ম প্রচারকদ্বয়ের জীবনধারা এবং যেভাবে তাঁরা সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন ও অবশেষে তা লাভ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে তাঁদেরকে সত্যধর্ম প্রচারকই বলতে ইচ্ছা হয়। অর্থাৎ তাঁরা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাঁদের সে সত্যধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোনো চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হবার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্ নড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আর্যও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরূপণ করে যে, বেদ বিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদ প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে। জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে এ কথা প্রমাণের প্রচেষ্টা কিছুটা সফলকাম হলেও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে এর কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কারণ গৌতম বুদ্ধকে তারা বড়জোর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব প্রমাণ করতে পেরেছেন। এর বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বজাহানের পরিচালক সম্পর্কে কি নীরব ছিলেন ? বিশ্ব জাহানের সৃষ্টি, পরিচালনা ও ধ্বংস সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করতেন ? তিনি স্রষ্টাকে আর্যদের ঈশ্বর বা ভগবান পর্যায়ে ফেলতে রাজী ছিলেন না। কারণ এ ভগবান ও ঈশ্বর ছিলেন নিষ্ক্রীয় প্রতিমা। এ ঈশ্বরের নামেই চলতো সমাজে যাবতীয় অনাচার ও স্বেচ্ছাচার। এ জন্য আর্যদের এ ঈশ্বর ও ভগবানের প্রশ্নে তিনি নীরব ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ধর্মদ্বয়কে তারা আর্য তথা বৈদিক ধর্মের গোত্রীভূত করার চেষ্টা করে। বুদ্ধের মৃত্যুর পরপরই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চিন্তা ও আকীদা বিশ্বাসের বিকৃতি দেখা দেয়। এ চিন্তা-বিকৃতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রথম মহা সম্মেলন আহূত

হয়। কিন্তু এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও এর কিছুদিন পরই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা একাধিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধ ধর্মকে আর্য ধর্মের একটি শাখা বলে দাবি করতে থাকে। সম্রাট অশোকের আমল (খৃ. পূ. ২৬০–২৩২) পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে।[৯] খৃস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রদায়গত বিরোধ মিটাবার জন্য কাশ্মীরের কুন্দলাওয়ানা নামক স্থানে বৌদ্ধগণের চতুর্থ মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে ৫ শতাধিক বৌদ্ধ পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দারুমিত্র, অশ্বঘোষ ও নাগার্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য।[১০] এ সম্মেলনে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন কতকগুলো হিন্দু ও নতুন দেবদেবী স্বীকার করে নিয়ে যে সংশোধিত ও উদার (আর্য ধর্মের দৃষ্টিতে) বৌদ্ধ মতের প্রবর্তন করেন তা-ই হলো বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান শাখা মহাযান ধর্ম। আর প্রাচীন অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতে যারা বিশ্বাসবান রইলেন তারা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন। একে প্রাচীন বা স্থবির মতও বলে। ক্রমে সুবন্ধু নামক বৌদ্ধ মুনি পাতঞ্জল দর্শনের যোগাচার ও মন্ত্রাদি মহাযানের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন থেকে নাগার্জুনের মতের নাম মাধ্যমিক এবং সুবন্ধু প্রবর্তিত নব মহাযান মতে 'যোগাচার' নামে অভিহিত হলো। এভাবে হিন্দু তান্ত্রিকতা যত বৌদ্ধ ধর্মে প্রবিষ্ট হতে লাগলো এবং হিন্দু দেবদেবী যত বৌদ্ধ মূর্তি পরিগ্রহ করতে লাগলো ততই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে একটা মিলন হয়ে গেলো। বুদ্ধদেব হিন্দুদের দশ অবতারের অন্তর্গত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে পুরুষোত্তমে বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম—বৌদ্ধদের এ ত্রিমূর্তি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে (হিন্দু-বৌদ্ধ) সকল ভারতবাসী দ্বারা পূজিত হতে লাগলো।[১১]

এ ভাবে বিভিন্ন স্তরে স্তরে বিকৃতি পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন করে দেয়। এমনকি এ দু' ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতভূমিতে আজ তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ ভারতের বাইরে পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ জুড়ে তিব্বত, হিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, ভিয়েতনাম, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধরা এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে বসবাস করছে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তা বাংলায় প্রবেশ করে। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে বর্ধমান মহাবীরের রাঢ় প্রদেশে আগমনের ঘটনা লিখিত আছে। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জৈন ধর্ম বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন হতে জানা যায়, খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে বা এর পূর্বে ঐ স্থানে একটি জৈন বিহার ছিল। সপ্তম শতকের চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের বিবরণে দেখা যায়, তৎকালে বাংলায় দিগম্বর জৈনের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তারপরই বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়।

সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে এর পূর্ব থেকেই এ দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার চলছিল। খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বাংলা বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণী থেকে তা জানা যায়। তিনি একমাত্র তাম্রলিপ্তি নগরে ২২টি বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ করেছেন। ৫০৬–৫০৭ অব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, কুমিল্লা অঞ্চলে তখন বৌদ্ধ বিহার ছিল। তার মধ্যে একটির নাম ছিল রাজবিহার। কাজেই পঞ্চম শতকে বাংলার সর্বত্রই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি ছিল, তা অনুমান করা যায়। সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বেশ প্রভাবশালী ছিল, বিভিন্ন চীন দেশীয় পরিব্রাজকের উক্তি থেকে তা জানা যায়। তন্মধ্যে হিউয়েন সাং সারা বাংলা ভ্রমণ করে এ সম্পর্কে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন।

তিনি লিখেছেন ঃ কজঙ্গল প্রদেশে (রাজমহলের নিকটবর্তী) ছয়-সাতটি বিহারে তিন শতেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করে। এ প্রদেশের উত্তর ভাগে গঙ্গাতীরের কাছে বিশাল উচ্চ দেবালয় আছে। দেবালয়ের চতুর্দিকের দেয়ালে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বুদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও সাধু পুরুষদের মূর্তি উৎকীর্ণ। পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তর বঙ্গ) ২০টি বিহারে তিন শতেরও অধিক হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। রাজধানীর তিন-চার মাইল পশ্চিমে গো-চি-পো সংঘারাম-এর ভিক্ষু সংখ্যা সাত'শ। সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। পূর্ব ভারতের বহু প্রসিদ্ধ আচার্য এখানে বাস করেন। সমতট (পূর্ববঙ্গ) প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ৩০টি বৌদ্ধ বিহারে দু'হাজার ভিক্ষু থাকেন। তাম্রলিপ্তে দশটি বিহারে সহস্র ভিক্ষু বাস করেন। কর্ণসুবর্ণে দশটি বৌদ্ধবিহারে হীনযান মতাবলম্বী দু' সহস্র ভিক্ষু বাস করেন। সপ্তম শতকের শেষের দিকে পেংচি নামক একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক লিখেছেন, সমতটের রাজধানীতে চার হাজারেরও বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ছিলেন। এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং জ্ঞান ও ধর্মানুশীলনের দিক থেকে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত এরই কারণে অষ্টম শতকের মধ্যভাগে রাজনৈতিক নৈরাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে বাংলার অধিবাসী ও নেতৃবৃন্দ গোপালের ন্যায় একজন বৌদ্ধকে তাদের রাজা ও শাসক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

মোটকথা, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে একদিকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার ও

নিপীড়নে সারা ভারতের জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে দ্রাবিড় অধ্যুষিত বাংলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। সপ্তম শতকের পর বৌদ্ধ ধর্মই বাংলায় প্রবল হয়। অষ্টম শতকে বাংলায় পালরাজাগণের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থাকে। একাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম ও সেন রাজবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। বৌদ্ধরা নিপীড়িত হতে থাকে।

হিন্দু ধর্ম

বর্ম ও সেন রাজাগণ ছিলেন বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মাবলম্বী। এ দুটি ধর্ম ছিল পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের শাখা। বিষ্ণু ও শিবের পূজা ছাড়াও অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজাও বাংলায় প্রচলিত হয়। কার্তিক ও সূর্য দেবতার পূজার উল্লেখও পাওয়া যায়। রাজা বিজয় সেন ও বল্লাল সেন শৈব ছিলেন কিন্তু লক্ষণ সেন ও তাঁর বংশধরগণ ছিলেন বৈষ্ণব। এ বর্ম ও সেন রাজাগণ যারা বাংলায় মূর্তি পূজার প্রচলন করেন। ধর্মের নামে সতীদাহের ন্যায় গর্হিত প্রথার প্রচলন এখানে ছিল। বাংলায় বৈদিক রীতিতে পূজাপাঠ করার জন্য বর্ম ও সেন রাজাগণ বৈদিক ব্রাহ্মণ আমদানি করেন। বাংলায় কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তনও তাঁদের একটি কীর্তি। জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথাকে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপটে হিন্দু ধর্মের অগ্রাভিযান চললেও সাধারণত ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই হিন্দু ধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনসাধারণের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের চূড়ান্ত পরিণতি

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় সতের 'শ বছর পর বৌদ্ধ ধর্মের চেহারা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। হিউয়েন সাং সপ্তম শতকে ভারতে যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত দেখেছিলেন, তা ছিল গৌতম বুদ্ধ, অশোক এমন কি কনিষ্কের সময়কার বৌদ্ধ ধর্ম থেকে অনেক পৃথক। অতঃপর পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম যে রূপ ধারণ করেছিল তার প্রকৃতি ছিল এ সব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয় প্রভৃতি বৌদ্ধমত তখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান মতবাদও বজ্রযান, তন্ত্রযান ও কালচক্রযান প্রভৃতিতে বিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন আকার ধারণ করেছে। এ সবগুলোর মধ্যে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মই ছিল প্রবল। এ ধর্মের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে

সম্ভবত এ সিদ্ধাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন চর্যাপদগুলো এ সিদ্ধাচার্যগণের রচনা। এ চর্যাপদ ও সিদ্ধাচার্য সরহ ও কৃষ্ণের দোঁহাকোষ প্রভৃতি কয়েকখানি মূল সহজিয়া গ্রন্থ থেকে এ নতুন ধর্মমত সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যেতে পারে। এ ধর্মে গুরু হচ্ছে প্রধান। এমন কি গুরুর স্থান বুদ্ধের চেয়েও উর্ধ্বে। এ ধর্মের সাধন প্রণালী অনেক পরিমাণে গুহ্য ও রহস্যে আবৃত। গুরু প্রথমত সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করে তার জন্য তদনুযায়ী সাধন-মার্গ নির্দিষ্ট করে দিতেন। এ শক্তির পরিমাণ অনুসারে পাঁচটি কুল (শ্রেণী) কল্পিত হয়েছিল—এদের নাম ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। যে পঞ্চ মহাভূত দেহের প্রধান উপকরণ (স্কন্ধ) তার উপরই এ কুল-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। উপাসকের মধ্যে কোন্ স্কন্ধটি কিরূপ প্রবল, তা স্থির করে গুরু তার প্রজ্ঞা ও শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেন। পরে যে সাধন প্রণালী অনুসরণ করলে ঐ বিশেষ শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে, প্রতি সাধকের জন্য তিনি তার ব্যবস্থা করেন।

এ সাধন প্রণালী এক প্রকার যোগ বিশেষ। শরীরের মধ্যে যে ৩২টি নাড়ী আছে, তার মধ্য দিয়ে শক্তিকে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ প্রদেশে প্রবাহিত করা এ যোগের লক্ষ্য। এ স্থানটি চতুঃষষ্টি অথবা সহস্রদল পদ্মরূপে কল্পিত হয়েছে। রেলওয়ে লাইনে যেমন স্টেশন ও জংসন আছে, দেহাভ্যন্তরে নাড়ীগুলোরও সেরূপ বিরাম ও সংযোগস্থল আছে, এদেরকে পদ্ম ও চক্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উর্ধ্বগমনকালে শক্তিকে এ সব অতিক্রম করতে হয়। শক্তি যখন মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে, তখন সাধনার শেষ ও সাধকের চরম ও পরম আনন্দ অর্থাৎ মহাসুখ লাভ হয়। সাধকের কাছে তখন বহির্জগত লুপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়াদি কিছুরই জ্ঞান থাকে না। সাধক জগত, বুদ্ধ সব একাকার হয়ে যায়। এ হলো সহজিয়া ধর্মের মূলতত্ত্ব। চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবৃত থাকায় সহজিয়া ধর্ম ক্রমশ আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমে হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক সাধনাও এর সাথে মিশে বাংলার ধর্ম-জগতে এক নারকীয় বীভৎসতার সৃষ্টি করে।

গৌতম বুদ্ধের সহজ সত্য ধর্ম দ্বাদশ শতকের বাংলায় এসে সহজিয়া ধর্মের মাধ্যমে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হিন্দু ধর্মের যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এর ফলে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

ষষ্ঠ শতকের বাংলায় আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর্য সমাজনীতি অর্থাৎ বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তখন বাংলাদেশে পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে

গেছে। এ সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সমাজের শীর্ষে স্থান লাভ করেছিল। ভগবানের পরেই ছিল ব্রাহ্মণের স্থান। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, গো-দান, জল-দান প্রভৃতি অন্য বর্ণের লোকদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। ধর্মীয় কার্যাদি যেমন পূজানুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন, যাগ-যজ্ঞের পৌনপুনিক আচরণাদি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এ ছিল যথার্থ রূপ। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে এ ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ-সংস্কৃতির ভাব-কল্পনা নিম্নোক্তভাবে মূর্ত করে তুলেছেন ঃ

"বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত সমন্বয় নয়, ঔদার্যময় বিন্যাস নয়, এক বর্ণ এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মণ যুগের একমাত্র কামনা ও আদর্শ। সে বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ, সে ধর্ম ব্রাহ্মণ ধর্ম এবং সে সমাজাদর্শ পৌরাণিক বাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। একালের স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসা গ্রন্থে ...... ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের জয়জয়কার—সেই আদর্শই হইল সমাজ-ব্যবস্থার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের শীর্ষে যাঁহারা আসীন সেই রাজারা এবং রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রধানতম সমর্থক সেই ব্রাহ্মণেরা দুইয়ে মিলিয়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠি গড়িয়া তুলিলেন : পরস্পরের সহযোগিতায়, পোষকতায় ও সমর্থনে মূর্তিতে মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্রে সর্বদা সর্ব উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠি সবলে সোৎসাহে প্রচার করিলেন।"

ব্রাহ্মণ সমাজ এভাবেই তৎকালীন বাংলার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। "সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি এমন কৃপা বর্ষণ করেছিলেন এবং সেই কৃপায় তাঁরা এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন যে, সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীরা যাতে মুক্তা, মরকত, মণি, রূপা, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাসবীজ, শাকপাত্র, অলাবু পুষ্প, দাড়িম্ববীজ এবং কুষ্মণ্ডলতা পুষ্পের পার্থক্য চিনতে পারেন, সেই জন্য একদল নাগরিক রমণীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।"[১২]

একদিকে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতি এভাবে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হতো, তাঁদের ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তো এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীতে চলতো নিদারুণ অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। চর্যাপদের কবি ঢেণ্ডনপাদ ৩৩ নং চর্যায় এ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সকরুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।"

অর্থাৎ টিলার উপর আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ নিত্যই (ক্ষুধার্ত) অতিথি এসে ভিড় করে।

বাংলায় এ বর্ণ বিন্যস্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে কিছুই ছিল না। সকলেই শূদ্রের পর্যায়ে গৃহীত হতো। এ দু'টি বর্ণ ছাড়াও অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলে শূদ্রের নিচে আরো একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন ছিল, বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থেও এর প্রমাণ আছে।[১৩] এ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শ্রেণী হচ্ছে ঃ কাপালিক, যোগী, চণ্ডাল, শবর, ডোম্বী, মলেগ্রহী, কুড়ব, বরুড় (বাউরী ?) তক্ষণকার, চর্মকার, ঘট্টজীবি (পাটনী), ডোলাবাহী, মল্ল, পুক্কস, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, সুম্র, কর্মকার, শৌণ্ডিক, ব্যাধ, তাঁতী, ধুনুরী, শুড়ী, মাহুত, নটনটী প্রভৃতি।

ব্রাহ্মণরা সমাজে যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন বৌদ্ধ রাজাদের শাসনামলেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। কারণ তৎকালীন বৌদ্ধরা বেদ বিরোধী হলেও আর্য সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। আর্য সংস্কারের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধ রাজারা সেই সামাজিক ঐতিহ্যের স্রোতে বাঁধ দিয়ে নতুন সমাজ বিধান প্রণয়ন ও জন-জীবনকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার দুঃসাহস বা সৎসাহস দেখাতে পারেন নি। এ জন্যই বৌদ্ধ আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধ বিপ্লব ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাস বা বর্ণাশ্রম রীতিকে আঘাতও করেনি। বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা যে বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপিতে। তাতে ধর্মপাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ধর্মপাল শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসন কৌশলে (শাস্ত্র শাসন থেকে) বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন।[১৪] এ থেকে বোঝা যায়, তখন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাস অনুযায়ী প্রত্যেক বর্ণের যথা নির্দিষ্ট স্থান ও সীমায় সুবিন্যস্ত করে সামাজ গঠন করা হয়েছিল। এ জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, অর্থদান, গ্রামদান অব্যাহত ছিল।

যদিও বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রম রীতির বিরোধিতা করে গেছেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম বর্ণাশ্রমকে স্বীকৃতি দেয়নি, কিন্তু গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর অনুসারীরা শ্রেণীমুক্ত কোনো সমাজ কাঠামো প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলেন নি। উপরন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর হাজার দেড় হাজার বছর পর বৌদ্ধ ধর্ম স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিশেষত কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় বৌদ্ধাচার্যগণ নিস্তেজ হয়ে পড়েন। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ধর্ম নিয়ে বিতর্ক করতেন ঠিকই, কিন্তু বৌদ্ধ সমাজ বিধি-বলে নতুন কোনো সমাজ কাঠামো সৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যার ফলে বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে

হিন্দু সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তারানাথ ও অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যের মতে তখন থেকেই বোধ হয় মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম আস্তে আস্তে তন্ত্র ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল—নতুন নতুন ধর্মাদর্শ, ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপ্রকরণ ইত্যাদি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করলো, তন্ত্রধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারস্পরিক আদান-প্রদানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু জিনিস বৌদ্ধ তন্ত্র ধর্মে প্রবেশ করলো এবং এভাবেই বোধ হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভেদ ঘুচে যেতে থাকলো।

বৌদ্ধরা কোনো নতুন সমাজ গঠনে সক্ষম না হবার কারণে এহেন ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো। শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণী দলিত ও নিগৃহীত হচ্ছিল। তারা ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণরা রাজকার্য, শাস্ত্রপাঠ, যাগ-যজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব বহন করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন দখল করে বসেছিল। আর শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তাদের ব্রাহ্মণদের স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হতো। ব্রাহ্মণরা তাদের অধ্যাপনা ও তাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে পারতেন না। তাদের অন্নগ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধান অমান্য করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। শহরের প্রান্তে টিলায় ঘর বেঁধে অন্ত্যজরা বাস করতো। তাদের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণদের পাপ হতো।

সামাজিক কদাচার ও নৈতিক অধঃপতন

তদানীন্তন বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সামাজিক কদাচারের জন্যও অনেকাংশে দায়ী। যেমন বিবাহ ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোক কোনো ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করতে পারতো না। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের যে কোনো রমণীকে বিবাহ করতে পারতেন। তবে এ স্ত্রীর মর্যাদা কোনোক্রমেই ব্রাহ্মণীর সমান বলে স্বীকৃত হতো না। জীমূতবাহন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ঃ ব্রাহ্মণ নিজের সঙ্গে বিবাহিত নয় এমন নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করলে বা তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গদোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হয় না ; সেই দোষও আবার সামান্য মনস্তাপ প্রকাশ করলেই খণ্ডিত হয়। ব্যভিচারকে এভাবে একটা নিয়মের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই বেঁধে দেন। ব্রাহ্মণদের অনুকরণে সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি নিজেদের মধ্যে এবং তাদের নিম্নতর বর্ণের লোকদের মধ্যে একটা নিয়মের প্রাচীর গড়ে তুললো। এ নিয়ম সমাজে সুস্পষ্ট নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিল। বাৎস্যায়ন পরিষ্কারভাবে বলেছেন, গৌড়বঙ্গের রাজান্তঃপুরে মহিলারা নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কামচর্চা, কামষড়যন্ত্র ও কামসম্ভোগ করতেন।

তিনি আরো বলেছেন, কামচরিতার্থতার জন্য নগরে ও গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখা হতো এবং এ ছাড়াও ছিল বাররামা ও দেবদাসী।[১৫] বাৎস্যায়নের পরবর্তী কালেও বাংলাদেশের কোনো শ্রেণীর মধ্যেও কাম বাসনা চরিতার্থতার ব্যাপারে সংযমের আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না। ধোয়ীর 'পবন দূত' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম চরিত' তার প্রমাণ। এ দু'টি কাব্যেই সভানর্তকী ও সভানন্দিনীদের স্তবগান করা হয়েছে অতি উচ্ছ্বাসভরে। এতে সমাজে ও রাজসভায় এদের আকর্ষণ ও প্রভাব অনুমান করা যায়।

অষ্টম শতক থেকে বাংলাদেশে ধর্মের নামে যৌন অনাচারও কম উৎসাহ পেয়ে আসেনি। কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনের কোহনা মন্দিরের কমলা নাম্নী প্রধানা দেবদাসীর কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৬] এ দেবদাসীরা সবাই নৃত্য-গীত-বাদ্যে পারদর্শিনী ছিল। কিন্তু কমলা ছিল তাদের সেরা। দেবদাসীরা দেবতাদের নামে উৎসর্গীত হলেও আসলে তারা ছিল বাররামা বা দেববারবনিতা। পরবর্তীকালে এ দেববারবনিতারাই স্পষ্টত সমাজের উচ্চতর লোকদের কামনা ও বাসনা পূরণের উপায়ে পরিণত হয়েছিল। তাই ধোয়ী, সন্ধ্যাকর নন্দী, ভবদেব ভট্ট প্রমুখ কবি বিবিধ শব্দালংকারে তাঁদের সৌন্দর্য, বিলাসলাস্য ও কামকলাভিজ্ঞতার প্রশস্তি রচনা করেছেন। ভবদেব ভট্ট এ বাররামাদের রূপ-যৌবন বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, বিষ্ণুমন্দিরে উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসী যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সংগীতলাস্য ও সৌন্দর্যের সভামন্দির এবং এদের দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়। শারদীয় দুর্গাপূজার সময় দশমী তিথিতে শারদোৎসব নামে একটি নৃত্যগীত বহুল উৎসবের প্রচলনও তখন ছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন।[১৭] এ উৎসবের সময় গ্রামে-নগরে নারী-পুরুষ সামান্য গাছের পাতার পোশাক পরিধান করে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণের ছলনায় সারা গায়ে কাদা মেখে নানা রকম যৌন ক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গী সহকারে এবং কুৎসিত ভাষায় অশ্লীল যৌন বিষয়ক গান গেয়ে গেয়ে উন্মত্তের মতো নৃত্য করতো। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কতিপয় অশ্লীল শব্দ উল্লেখ করে আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিনে তা উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। এর স্বপক্ষে এ পুরাণে যে যুক্তি দেয়া হয়েছে, শ্লীলতা বজায় রেখে তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। চৈত্র মাসে 'কাম মহোৎসবে' বাদ্য সহকারে এক প্রকার অশ্লীল সঙ্গীত গীত হতো। কারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, এতে পরিতুষ্ট হয়ে কামদেব ধন, পুত্র প্রভৃতি দান করবেন। হোলাকা—বর্তমান কালের হোলি একটি প্রধান উৎসব ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এতে যোগদান করতো। 'দ্যূত প্রতিপদ' নামে একটি বিশেষ উৎসব কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হতো

বলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৮] এ উৎসবের দিন সকালে বাজী রেখে পাশা খেলা হতো। লোকেরা বিশ্বাস করতো, এর ফলাফল আগামী বছরের শুভাশুভ নির্দেশ করে। তারপর বসন-ভূষণ পরিধান ও গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন করে সবাই গীত-বাদ্যে যোগদান করতো এবং বন্ধু-বান্ধবসহ ভোজন করতো। রাতে শয়নকক্ষ ও শয্যা বিশেষভাবে সজ্জিত হতো এবং প্রণয়িরা প্রণয়িনীসহ একত্রে রাত যাপন করতো।

সমাজের নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে নৃত্য-গীত বাদ্যের গভীর সম্পর্ক থাকে। বর্ম-সেন যুগে এ সবের ব্যাপক প্রচলন ছিল। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদগুলোতে এর চাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটি চর্যায় এক অসাধারণ নৃত্য পটিয়সী ডোম্বীর চিত্র নিম্নোক্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঃ

"এক সো পদমা চটসটঠি পাখুড়ি !
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি ॥"

অর্থাৎ—একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়িতে চড়ে ডোম্বি নাচে। আর একটি চর্যায় পাওয়া যায় ঃ

"নাচন্তি বাজিল গা অন্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হই ॥"

অর্থাৎ—বজ্রধর নাচছেন, দেবী গাইছেন—এ ভাবেই বুদ্ধ নাটকের কঠিন অভিনয় সুসম্পন্ন হচ্ছে। মনে হয় নৃত্য-গীত-বাদ্যের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের যে জীবন লীলা অভিনীত হতো তাকেই বলা হতো বুদ্ধনাটক। চর্যাগুলোতে সেই যুগের বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়, যেমন পটহ, মাদল, করাণ্ড, কসাল, দুন্দুভি, ডমরু, ডমরুলি, বীণা ইত্যাদি। ধর্মীয় উৎসব কিংবা বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বাদ্যসহযোগে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হতো।

সমাজের নৈতিক অধঃপতনে মদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সেকালে মদের দোকানে মদ বিক্রি হতো। মদের দোকানের গায়ে চিহ্ন লাগানো থাকতো, যা দেখে খদ্দের সেখানে আসতো। এ ছাড়া অনেকে নিজের বাড়িতেই মদ তৈরি করতো। মদ তৈরির উপাদান রূপে চর্যাপদের একটি কবিতায় চিকন বাকল ও কঙ্গুচিনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমাজে পতিতাবৃত্তিরও প্রচলন ছিল। অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন বোধ হয় কিছুটা শিথিল ছিল। উচ্চ সমাজের লোকেরা অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ

নাড়িয়া'রাও তাদের কুঁড়ে ঘরের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করতেন বলে চর্যাপদের একটি কবিতায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গৃহস্থ বধূর নৈশ অভিসারের প্রমাণও চর্যায় পাওয়া যায়।

"দিবসবি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামারু জাই ॥"

অর্থাৎ—দিবসে বউটি কাকের ভয় পায় কিন্তু রাতে অভিসার যাত্রায় যত দূরেই যেতে হোক না কেন তাতে সে পিছপাও হয় না। সমাজের নীতিবন্ধনের শিথিলতার আর একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ভাষায় অশ্লীল শব্দের নির্বিচার প্রয়োগে। নাগরালি, কামচণ্ডালি, ছিনালী, পতিতা, লম্পট প্রভৃতি শব্দ ও রূপক চর্যাপদের কবিতাগুলোতে যত্রতত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কোনটিকেই অশ্লীল বিবেচনা করা হয়নি। যেমন—'নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা' (ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষ্য অনুসারে এর অর্থ—'নর ও নারী মাঝে ঊর্ধে করিলাম লিংগ'[১৯])। 'ডোম্বি তো আগলি নাহি ছিনালী' (ডোম্বি, তোর মতো ছিনাল আর নেই)। 'বাণ্ড কুরণ্ড সন্তারে জানী' (লিঙ্গাকুরাও টের পাওয়া যায় সাঁতার দেবার সময়)। বিশেষ করে চর্যাপদের কবিতাগুলোতে যেখানে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতের গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এ ধরনের বাক বিন্যাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের ব্যবহার সমাজ মানসের চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতনের ইঙ্গিতবহ।

সমাজ মানসে বিদ্রোহ

প্রাক-ইসলাম যুগে বাংলার সমাজ-দেহে সর্বস্তরে অধঃপতন নেমে এসেছিল। এ অধঃপতনের জন্য সমাজে ব্রাহ্মণের নির্বিচার প্রধান্যই ছিল বহুলাংশে দায়ী। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সমগ্র সমাজ দেহকে অসার করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের উচ্চমঞ্চে। সাধারণ লোকের চিন্তা-ভাবনা-কর্ম-প্রচেষ্টা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারতো না। নবম ও দশম শতকে রচিত বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থ এবং বর্ম-সেন আমলের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল। সমাজে ব্রাহ্মণের পরে ছিল শূদ্রদের স্থান। আর তাদের পরে ছিল অগণিত অসংখ্য অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়—দুঃখের দাহনে দগ্ধীভূত এবং সর্বপ্রকার সামাজিক সুযোগ, সুবিধা, মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত গণ-মানুষের দল। সমাজে এ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। এরই পরিণতিতে সমাজ দেহে এক গোপন বিষক্রিয়া শুরু হলো। তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের অন্তর্বিরোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাস।

এ অন্তর্বিরোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাস একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংলার সমগ্র সমাজ দেহকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে তুলেছিল।

বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি ও অধিকার বঞ্চিত ব্রাহ্মণেতর মানুষের নিদারুণ হাহাকার, অন্যদিকে ঐশ্বর্যবিলাস ও কাম-বাসনার উচ্ছ্বাসময় আতিশয্য। একদিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও দেহগত বিলাস, চারিত্রিক লাম্পট্য, অমানুষিক ঘৃণা ও অবহেলা এবং অন্যদিকে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার মধ্যেও যৌন কাম-বাসনার মদিরতা বাংলার সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল। অধিকার বঞ্চিত মানবতা কোথাও একটু আশার ক্ষীণ আভাও দেখছিল না। চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র সুগভীর অন্ধকার। একটুখানি আশা, এক টুকরা আলো তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা ও মহামূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ আর্থিক প্রাচুর্য

খৃস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের দ্রাবিড় ও অনার্য জাতিরা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতো বলেই আর্যরা তাদেরকে দাস বলতো। নদী-বিধৌত পলিমাটির দেশ হবার কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল এতে সন্দেহ নেই। এ দেশের বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করতো। গ্রামের চারপাশের জমিতে তারা নানারূপ শস্য, ফলমূলাদি উৎপাদন করতো।

সম্ভবত রাজাই ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। যারা জমি চাষ করতো বা অন্য প্রকারে জমি ভোগদখল করতো তাদের কতকগুলো নির্দিষ্ট কর দিতে হতো। রাজা মন্দির ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করার জন্য জমি দান করতেন। এ জমির কোন কর দিতে হতো না। বংশানুক্রমে গ্রহীতারা এগুলো ভোগ-দখল করতে পারতো।

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশেষ করে খৃস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন করেছিল। বস্ত্রশিল্প ছাড়াও প্রস্তর, ধাতু ও মৃৎ শিল্পও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। বিলাসিতার উপকরণ যোগাবার জন্য স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি শিল্পও উন্নতি লাভ করেছিল। কর্মকার ও সূত্রধর গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নির্মাণ করতো এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নানা উপকরণ যোগাতো। কাষ্ঠশিল্প ও হস্তিদন্তের কাজও উন্নতি লাভ করেছিল।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। দেশে-বিদেশে বাংলার এ ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো। বিশেষ করে সপ্তম শতকের পূর্বে শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য এ তিনটিই ছিল বাংলাদেশের ধনোৎপাদনের প্রধান নির্ভর। কৃষিও সমাজে ধনোৎপাদনের কিছুটা উপায় হিসেবে স্বীকৃত ছিল কিন্তু ধন উৎপাদন ও ধন বন্টনের উপায় হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা ছিল শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের। অষ্টম শতক থেকে শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য কমে আসে এবং কৃষি-নির্ভরতা বেড়ে যায়। ফলে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সামাজিক মানও নেমে আসে।

সমাজের অভ্যন্তরে দারিদ্র্য ও শোষণ

কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর পরিমাণে বেড়েছিল। এ ঐশ্বর্যে ধনীর ধনাঢ্যতা ও বিলাস-আড়ম্বর বৃদ্ধি পেলেও এবং রাজপরিবার, রাজ কর্মচারী ও ব্রাহ্মণ সমাজের উদর স্ফীত হলেও বাংলার সাধারণ মানুষ এ থেকে লাভবান হয়নি। এর একমাত্র কারণ সামাজিক অবিচার ও অসম ধন-বণ্টন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনে যাদের ভূমিকা ছিল শূন্যের কোঠায় সেই ব্রাহ্মণ সমাজই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল। আর সাধারণ মানুষ হয়েছিল শোষিত ও নির্যাতিত। সাধারণ মানুষ ছিল করভারে জর্জরিত। এ কর রাজপুরুষদের পক্ষ থেকে নেওয়া হতো, ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকেও নেওয়া হতো। এ ছাড়াও ছিল চাটভাট প্রভৃতি উপদ্রবকারী এবং আচারান্ধ সমাজপতিদের নিদারুণ বিধান—এ সবের সর্বগ্রাসী পীড়ন, অবিচ্ছিন্ন অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের নির্মম আঘাতে ভূমিহীন, অর্থ-সম্বলহীন, সামাজিক সম্মানহীন, নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবস্থা ছিল কল্পনাতীত। অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার তাঁর 'চর্যাপদ' গ্রন্থে 'সদুক্তি কর্ণামৃত' থেকে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করে তৎকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের করুণ ছবি অঙ্কন করেছেন।[২০] একটি শ্লোকে জনৈক নাম পরিচয়হীন বাঙালি কবি তাঁর সংসারের অভাব ও দারিদ্র্যের চিত্র নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

> ক্ষুৎকাম শিশবঃ শবা ইব তনুমন্দাদরো বান্ধবো
> লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো সাং তথা বাধতে।
> গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটায়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
> কুপান্তি প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সুচিং যথা যাচিতা ॥

অর্থাৎ—শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-বান্ধবেরা প্রীতি বর্জিত, পুরানো জীর্ণপাত্রে স্বল্প মাত্র পানি ধরে—এ সবও আমাকে তেমন কষ্ট দেয়নি, যেমন দিয়েছিল, যখন দেখেছিলাম করুণ হাসি হেসে গৃহিণী কাপড় সেলাই করার

জন্য রুষ্টা ও কুপিতা প্রতিবেশিনীর কাছে সূঁচ চাইছেন। আর একটি শ্লোকে এ নির্মম দারিদ্র্য আরো তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

বৈরাগ্যেকসমুন্নতা তনুঃতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষমেক্ষণ কুক্ষিভেশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যার্থিতা।
দীনা দুঃস্থ কুটুম্বিনী পরিগলদ বাষ্পাম্বু ধৌতাননা
প্যেকং তুণ্ডুলমানকং দিনশতঃ নেতুং সমাকাংক্ষতি ॥

অর্থাৎ—বৈরাগ্যে তার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কোটরাগত, পেট বসে গিয়েছে, তারা আকুলভাবে খাদ্য চাইছে। দীনা, দুঃস্থা গৃহিণী চোখের পানিতে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছেন, এক মান (মণ ?) চালে যেন তাদের একশ দিন চলতে পারে।

আর একটি শ্লোকে কবি তাঁর দারিদ্র্য পীড়িত জীর্ণ-দীর্ণ গৃহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ন।
গণ্ডুপদার্থি মণ্ডকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম ॥

অর্থাৎ—কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙেরা আমার জীর্ণ গৃহ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত চর্যাপদগুলোয় বাঙালি গৃহের এ নিদারুণ দারিদ্র্যের ছবি আরো করুণভাবে ফুটে উঠেছে। চর্যায় বিভিন্ন সময়ের মোট ২৩ জন কবির কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ কবিতাগুলোর অন্তর্নিহিত হতাশা পাঠক চিত্তকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দারিদ্র্য সমাজের বৃহত্তম অংশে পরিব্যাপ্ত ছিল বলেই চর্যার কবিদের কাব্যে এ হতাশা ও শূন্যতার বোধ ছড়িয়ে আছে। এ কবিতাগুলোর প্রায় সর্বত্রই দুঃখ ও নিরানন্দের ব্যথাময় সুর অনুরণিত। কবি ঢেণ্ডনপাদ ৩৩ নং চর্যায় বলেছেন ঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামাঅ ॥

অর্থাৎ—টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি) আসে। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে (ব্যাঙের অসংখ্য ব্যাঙাচির ন্যায় আমার সন্তান সংখ্যা ক্রমবর্ধমান)। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে

যাচ্ছে (যে খাদ্য প্রস্তুত তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে)। এই একটি কবিতাতেই তৎকালীন বাঙালি গৃহের দারিদ্র্যের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

---

১. বিশ্বকোষ ঃ ১৪-২৩৪ উদ্ধৃত মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।
২. তারিখে হিন্দে কদীম ঃ কে. এম. পানিক্কর, ৬৭ পৃষ্ঠা
৩. যে বৃক্ষের মূলে ধ্যানরত থেকে গৌতমবুদ্ধ মোক্ষলাভ করেন।
৪. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা।
৫. ঐ ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা।
৬. ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ১০১—১০২ পৃষ্ঠা।
৭. অরবিন্দ পোদ্দার—মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৯৫২, পৃষ্ঠা-২০।
৮. শ্রী দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, ৯—১০ পৃষ্ঠা।
৯. তারিখে হিন্দে কদীম ঃ কে. এম. পানীক্কর, ২১—২৩ পৃষ্ঠা।
১০. পুনশ্চ, ৪৫ পৃষ্ঠা।
১১. সতীশ চন্দ্র মিত্র—যশোর খুলনার ইতিহাস।
১২. চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার, ৩১ পৃষ্ঠা।
১৩. চর্যাগীতি পরিচয়, সত্যব্রত দে, ১১১—১১২ পৃষ্ঠা।
১৪. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা—৩৫ ও ৪২ পৃষ্ঠা।
১৫. বাৎস্যায়ন—কামসূত্রম্ ।
১৬. রাজতরঙ্গিণী, ৪/৩৩২, ৪/৪২২।
১৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস—৫২৬ পৃষ্ঠা।
১৮. বাংলাদেশের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ—২০৩ পৃষ্ঠা।
১৯. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—Buddhist Mystic Songs, Dacca, 1966—P.12.
২০. চর্যাপদ, ৪১—৪২ পৃষ্ঠা।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

আগেই বলেছি, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন শেষ নবী, তৌহিদবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ শিক্ষক ও সত্য ধর্ম ইসলামের সর্বশেষ প্রচারক। নবুয়ত লাভ করার পর ২৩ বছর ধরে তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করে যান। তৌহিদবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করেন। ১৩ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনায় একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব মানবতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালনা করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নিজের জীবদ্দশায় এ দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন করে যান। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবাগণ, সাহাবগণের কাছ থেকে সত্যের আলোকে উদ্দীপিত তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীগণের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাবা-তাবেয়ীগণ এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ইসলামের সত্য বাণী ও তৌহীদবাদী সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

বণিকদের ইসলাম প্রচার

ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকেই আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে পারদশী হবার এবং বাণিজ্যোপলক্ষে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার কারণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের সত্য বাণী দুনিয়ার বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এক একজন ব্যবসায়ী এ ক্ষেত্রে এক একজন ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণ, ইসলামী আদর্শবাদের কাঠামো এমনভাবে রচিত হয়েছে, যার ফলে ইসলামের সত্যের আলোকে অন্যের হৃদয়দেশ উদ্ভাসিত করে তোলা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানরা তাঁদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই প্রথম যুগেই ইসলামের সত্য বাণী পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল থেকে পূর্বে সুদূর চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিজেতাগণের দেশ জয় অভিযান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও দুনিয়ায় এমন কয়েকটি দেশ রয়েছে যেখানে কোনোদিন কোনো মুসলিম বিজেতার আগমন হয়নি এবং একমাত্র ইসলাম প্রচারকদের নিঃস্বার্থ সত্যপ্রচার

আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যই সেই সব দেশে ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এভাবেই মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের সত্য বাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তবে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদির অভাবে এ যুগকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। দক্ষিণ ভারতের মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেরুমল পেরুমল শেষ নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই যে মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। তাহলে দেখা যায়, হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই (খৃস্টীয় সপ্তম শতকে) ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্য বাণীর সংস্পর্শে আসে। নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহাজ কেবলমাত্র ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে থেমে যায়নি। কারণ তৎকালে আরবদের বাণিজ্য পূর্বে চীন উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর সপ্তম শতকে বঙ্গোপসাগর বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কাজেই সপ্তম শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শুরুতেই আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দরসমূহে নোঙ্গর করেছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

উপরন্তু আরব দেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যে তাদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। ভারত থেকে তারা প্রধানত গরম-মসলা, গজদন্ত ও নানাবিধ মূল্যবান রত্ন ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করতো। গরম-মসলা উৎপন্ন হতো সরন্দীপ (সিংহল) ও তার নিকটবর্তী ভারতের দক্ষিণ এলাকায়। কিন্তু হাতীর জন্য বঙ্গ (বাংলাদেশ) প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ-কালে আমরা বঙ্গরাজের চার সহস্র সুসজ্জিত হস্তি সেনার কথা শুনি। আরবী ইতিহাস গ্রন্থে বঙ্গরাজ দেবপালের (৮১০–৮৪৫ খৃ.) ৫০,০০০ রণহস্তীর উল্লেখ দেখি।[১] হাজার বছর আগে লেখা চর্যাপদগুলোয় আমরা হাতীর স্বচ্ছন্দ উল্লেখ দেখি। চতুর্দশ শতকের পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আরকান (বরহনকার) ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতীর প্রাচুর্যের উল্লেখ করেছেন।[২] ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "বাঙ্গালার পূর্বে ও দক্ষিণে আরখংগ (আরাকান) নামে একটি বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও হচ্ছে তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে হাতী প্রচুর পাওয়া যায়।" কাজেই হাতীর দাঁত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই

সে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হতো এবং এ হাতীর দাঁত সংগ্রহ করার জন্য আরব বণিকদেরকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে হতো এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

১৪৯৮ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল দিয়ে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার এবং অন্য একজন পর্তুগীজ নাবিক কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরব বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। কর্ডোভা থেকে শুরু করে চীন সাগরের উপকূল পর্যন্ত স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমস্ত কেন্দ্রস্থলে তাদের যাতায়াত ছিল। আরব ও ইরানের ইতিহাস পাঠে হিজরী প্রথম শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত শত শত খ্যাতিমান মুসলমান ভূগোলবিদ ও বিশ্ব পর্যটকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বজোড়া খ্যতি অর্জন করেছিলেন। এ ভূগোলবিদ-গণের অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আবার অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীর সাহায্যে নিজেদের গ্রন্থ রচনা করেন। আরব ভূগোলবিদদের বর্ণনায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সমন্দর নামক একটি বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ইবনে খুরদাবা (মৃত্যু ঃ ৩০০ হিজরী) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়ালা মামালিক' গ্রন্থে বলেন ঃ "কামরুত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (নদীপথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে আনীত হয়।" আল ইদ্রিসী (মৃত্যু ঃ ৫৪৯ হিজরী) তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেন ঃ "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। এখানে অনেক লাভবান (ব্যবসায়-বাণিজ্যে) হওয়া যায়। এ বন্দর কনৌজের অধীন। এটা এমন এক নদীর তীরে অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভুত। এখানে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বিশেষ করে গম পাওয়া যায়। পনের দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরুত (কামরূপ) থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্ট। .... এ শহরের (সমন্দর) এক দিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বাস এবং দেশের সকল ব্যবসায়ী রীতিমত সেখানে যাতায়াত করে।" ডঃ আবদুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৩] ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালার সূক্ষ্মসুতি বস্ত্রের (মসলিন) উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন দেশ সফরকালে তিনি ও তাঁর সহযাত্রী বণিকদল বিদেশী রাজা ও শাসকগণকে অন্যান্য উপহার দ্রব্যের সঙ্গে বাংলার সূক্ষ্মসুতি বস্ত্রাদি অবশ্যই উপহার দেন। বলা বাহুল্য, বাংলার এ সূক্ষ্মবস্ত্র (মসলিন) ও চন্দন কাঠ আরব বণিকদের কাছে সুপরিচিত ছিল। এ মসলিন ঢাকায় তৈরি হতো এবং চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বিদেশে রপ্তানী হতো।

ডক্টর এ. রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বাংলার উপকূলভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, এমন কি চাটগাঁ নামটাও আসলে তাদেরই দেওয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপে বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির অবস্থিতি বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি-উল-গঙ্গ (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও ও চিটাগং-এ রূপান্তর ঘটেছে।[৪]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে যে অতি প্রাচীন কাল থেকে আরব বণিকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজা তুয়ে' বর্ণিত একটি উপাখ্যান পেশ করা যেতে পারে। ডঃ আবদুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ উপাখ্যানটি উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ "এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রাদজাগীর বংশধর মহত ইঙ্গত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা ২২ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে, তাঁর সময়ে (৭৮৮–৮১০) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রনবী (বর্তমানে রামরী) দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।"[৫]

অষ্টম ও নবম শতকে আরবীয় মুসলমান বণিকরাই এ পথে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতেন। কাজেই এ বিদেশী মুসলমানরা আরব বণিকদল ছাড়া যে আর কেউ হতে পারে না, তাতে সন্দেহ নেই। পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য আমাদর এই সিদ্ধান্তকে আরো শক্তিশালী করে। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনর রশীদের আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রাটিতে ১৭২ হিজরী সনের (৭৮৮ খৃস্টাব্দ) তারিখ খোদিত রয়েছে। এ সময় বাংলায় বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসন চলছিল। ধর্মপাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আরাকানের রাজা মহত ইঙ্গত চন্দয়ত ও ধর্মপাল সমসাময়িক ছিলেন। অন্যদিকে সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলেও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের (৮১০–৮৪৫) পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেববংশীয় বৌদ্ধরাজারা রাজত্ব করেন।

আরাকানের রামরী দ্বীপে আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলো সেগুলোতে উল্লিখিত সময়েই (৭৮৮ খৃ.) বাংলায় নীত হয়েছিল। রামরী দ্বীপে জাহাজ ভাঙার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮ থেকে ৮১০

খৃস্টাব্দের মধ্যে। সম্ভবত আরব বণিকদল বাংলার বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে এ মুদ্রাটি আমদানি হয়। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য করাই মুসলিম বণিকদের লক্ষ্য ছিল না, এ সঙ্গে তাঁরা নিজেদের ওপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন। যে সত্যের আলোকে তাঁদের হৃদয়দেশ উদ্ভাসিত হয়েছে—অন্ধকারে নিমজ্জিত দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে সেই আলোকের সন্ধান দেওয়া তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। কাজেই এ বণিকদের মধ্য থেকে অতি উৎসাহী কেউ কেউ ধর্মালোচনা ও ধর্ম প্রচারার্থে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কেন্দ্র পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকবেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই এ মুদ্রাগুলো সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারসমূহে আমদানি হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ডঃ এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন ঃ

"আমাদের বিশ্বাস কোনো ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলীফার এ মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবত তিনি এই মুদ্রা সঙ্গে লইয়া তথায় প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল।"

বাংলার উপকূল থেকে নিয়ে অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত আরব বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ডঃ এ. রহীম তাঁর গ্রন্থে ইবনে খুরদাদবা, মাস্‌উদী, আল ইদ্রিসী প্রমুখ আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকের মতামত উদ্ধৃত করে গঙ্গার এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন। আলোচনার শেষাংশে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

"উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেঘনার মোহনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে আরবীয় বণিকদের আগমন হয়েছিল।"

বস্তুত বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়। আরব বণিকগণ স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বিদেশ সফরে বের হতেন না। কাজেই দীর্ঘ সফরের মধ্যে কোনো স্থানে তাঁরা প্রয়োজন মতো বিরতি করতেন এবং স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের বিধর্মী মহিলাদেরকে বিবাহ করতেন। অবশ্যই ইসলামী শরীয়তের নির্দেশানুসারে ইসলামে দীক্ষিত না করে তাঁরা যে এ সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতেন না, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এভাবে বহু স্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। চতুর্দশ শতকে পৌঁছে

মুসলমানদের বাণিজ্য ও ভূ-পর্যটনে ভাটা পড়তে থাকে। তবুও এ ভাটার যুগে মরক্কো দেশীয় মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (জন্ম ৭০৩ হিজরী ও মৃত্যু ৭৭৮ হিজরী) তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গ্রানাডায় ভারতীয়দের সাথে এবং ভারতে গ্রানাডাবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মরক্কোর অন্তর্গত সাব্‌তার অধিবাসী জনৈক ব্যক্তির সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন চীনের কুনচুন ফু শহরে এবং ঐ ব্যক্তির এক ভাইয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় সুদানের সিজিলমাসা শহরে। এ দু'টি শহরকে একটি সরলরেখায় যুক্ত করলে মধ্যখানে ৯ হাজার মাইলের ব্যবধান হয়। আরাকানে তিনি দেখেন বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কলোনি। মালদ্বীপে তিনি এক বাঙালি মুসলিম রাজবংশের রাজত্ব দেখেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় বলেছেন ঃ "পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ হচ্ছেন খাদীজা নাম্নী জনৈকা মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাহুদ্দীন সালেহ বাঙালির কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন, অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ হন।"[৬] খান বাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব, 'আজায়েবুল আসফারে'র ভূমিকায় নবম শতকের পর্যটক সায়রাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ চীনের ফু-চু শহরে এক বিদ্রোহ চলাকালে দেড় লক্ষ মুসলমান নিহত হয়। এ মুসলমানরা সবাই ছিল বিদেশাগত।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবদের বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি একদিকে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে এবং অন্যদিকে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়। তাই প্রথম যুগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরবীয় মুসলিম বণিকদের আগমন ও ইসলাম প্রচার মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা এ কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন।[৭] কিন্তু ডঃ আবদুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ ধারণা সংশয়মুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৮] তবে আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীন কাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। চট্টগ্রামের কোনো কোনো এলাকা

যেমন আল করণ, সুলক বহর, বাকালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এ সবই চট্টগ্রাম তথা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রণই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

স্থল পথে ইসলামের আগমন

স্থলপথে প্রধানত সিন্ধুর পথে ইসলাম সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তিরানব্বই হিজরীতে (৭১২ খৃ.) মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর আমলে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফতুহুল বুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে উসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী, হারেস ইবনে মুররা আবদী প্রমুখ সেনাপতি বার বার সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে এর বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। এমন কি ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবূ সূফরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মুহাল্লাবের পর আবদুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর জাদীদী, সিনান ইবনে সালামাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনযির ইবনে জারুদ আবদী বারবার হিন্দুস্তান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সব অভিযানে মুসলমানরা কখনও সাফল্য আবার কখনও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। তবে হিন্দুস্তান জয়ের স্বপ্ন তাঁরা কখনও বিস্মৃত হতে পারেনি। এর কারণ হিন্দুস্তান বিজয় সম্পর্কে শেষ নবী (সা)-এর নিশ্চয়তা দান। ভারত বিজয় সম্পর্কে সাহাবী হযরত সওবান শেষ নবী (সা)-এর এক বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ "আসাবাতানে মিন উম্মাতী আহরাযা হুমাল্লাহু তা'আলা মিনান্নার। আসাবাতুন তাগযুল হিন্দ, ওয়া আসাবাতুন তাকুনু মা'আ ঈসাব্‌নি মার্‌য়াম আলায়হিস্ সালাম।"[৯] অর্থাৎ—আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিন্দ (ভারত) আক্রমণকারী সেনাদল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলায়হিস সালামের সহযোগী সেনাদল।

অন্য এক বর্ণনায় সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ আমাদের হিন্দ (ভারত) অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই সে সময় আমি জীবিত থাকলে তাতে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হবো না।

এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবো আর যদি আমি সহি সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো দোযখ মুক্ত (আবূ হুরায়রা)।"[১০]

শেষ নবী (সা) কর্তৃক এভাবে ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ হবার কারণে মুসলমানরা সাময়িক সাফল্য ও একাধিকবার ব্যর্থতার পরও ভারত অভিযান চালিয়ে এসেছে। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খৃ.) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাকী ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হবার পর তিনি মাত্র সতের বছরের যুবক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সাকাফীকে সেনাপতি করে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সমগ্র সিন্ধু জয় করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অবশেষে এ শহরটিও জয় করে নেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের এ অভিযানে চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যও তাঁর সহযোগী হয়। পথিমধ্যে পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে যখন তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সাওয়ান্দার বাসীরাও তাঁর সাথে মিলিত হয়। সাওয়ান্দার বাসীরা সবাই তখন মুসলমান ছিল।

এভাবে দেখা যায় হিজরী প্রথম শতকেই ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম যে নগর জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। তিনি দেবল (করাচী) জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন, মুসলমানদেরকে জায়গীর দান করেন এবং চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই স্থলপথে ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমন দ্রুততর হয় এবং অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি গড়ে ওঠে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত পশ্চিম ভারতের বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে।

অষ্টম শতকের বাংলার বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃ.) সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে জানা যায়। সমগ্র উত্তর ভারত জয় করার পর তিনি তৎকালীন ভারতের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত কান্যকুব্জে বিরাট রাজ্যাভিষেক দরবার করেন। মালদহের নিকটবর্তী খালিসপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর এ রাজ্যাভিষেক দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি দেশের রাজা উপস্থিত ছিলেন।[১১] এ রাজ্যগুলোর মধ্যে যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোনো মুসলমান অধিকৃত রাজ্য বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন।[১২]

এ থেকে প্রমাণ হয়, অষ্টম শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের সাথে বঙ্গরাজ তথা বাংলার যোগাযোগ ছিল। নিশ্চয়ই মুসলিম ও বঙ্গরাজের মধ্যে দূত বিনিময় হতো। বাগদাদে তখন ছিল হারুনর রশিদের রাজত্বকাল। হারুনর রশিদের রাজত্ব মাকরান হয়ে সিন্ধুদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। কাজেই সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের যে নৃপতি ধর্মপালের দরবারে এসেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই হারুনর রশিদ নিযুক্ত কোনো গভর্নর ছিলেন। এ হিসেবে হারুনর রশিদের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়। কাজেই এ সময় বাগদাদ ও বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা যায়। এমন কি বাগদাদ ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যার ফলে উভয় দেশের মনীষী ও পণ্ডিতবর্গ বন্ধুদেশে গমন করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত হারুনর রশিদের আমলের যে মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছি তাও উভয় দেশের এ সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে। বিশপ জন এ. সোবহান তাঁর 'সূফীইজম ইটস সেন্টস এন্ড শ্রীন্‌স' গ্রন্থে উভয় দেশের মনীষীবৃন্দের বন্ধুদেশে গমনাগমনের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অষ্টম-নবম শতক থেকেই স্থলপথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। কিন্তু এ সময়কার এমন কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ আমাদের হাতে নেই যা থেকে এ কথা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, এ দেশে কোন্ পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয়েছিল, কারা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কি পরিমাণ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তবে একাদশ শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারের কিছু কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ আলোচনা থেকে এ কথাও জানা যাবে যে, একাদশ শতকের অনেক পূর্ব থেকেই এ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল।

সপ্তম থেকে দশম শতক পর্যন্ত চার'শ বছরের ইসলাম প্রচারের কোনো বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে নেই। এ পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে যা কিছু আলোচনা করেছি তা এ সম্পর্কিত ছিটেফোঁটা আভাস-ইঙ্গিত ও আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এর উপর সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। তবে বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সাত'শ বছর একটি চিহ্নিত সময়কাল। এ সময় ইসলাম বাংলার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অচিরেই এ উর্বর এলাকার শ্রেষ্ঠ ধর্মের রূপ লাভ করে।

সূফী আলিম ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম প্রচারের ঢেউ চলতে থাকে। তবে এর গতি সব সময় সমান থাকেনি। এ প্রেক্ষিতে এ সাত'শ বছরকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদকে যদি ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশোর বলা যায়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ ও চতুর্দশ শতককে বলতে হয় ইসলাম প্রচারের যৌবনকাল এবং পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এ প্রচারের ধারা মন্দীভূত হতে থাকে। নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি এ সময় ইসলাম প্রচারের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও আলিমগণের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরব, ইয়ামন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সূফী ও আলিমগণ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাঁরা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেকে একাকী এ দূরদেশে পাড়ি দিয়েছেন। আবার অনেকে নিজের অনুচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত-অপরিচিত দেশে আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন। চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্য কম দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু বাংলার আবহাওয়া তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ "দেশটি ভিজা ও অন্ধকার এবং খোরাসানবাসীদের মতে ঐশ্বর্যসম্ভার পরিপূর্ণ দোযখ।"

প্রথম যুগের অনেক সূফী-আলিম সমুদ্রপথে এ দেশে আগমন করেন। বাংলার সমুদ্রপথ আরবদের কাছে সুপরিচিত থাকা এবং বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাই ছিল এর মূল কারণ। সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশের মধ্যে বঙ্গ-বদ্বীপে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও অভূতপূর্ব সাফল্যের এ-ও একটি প্রধান কারণ। এ সূফী ও আলিমগণের সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের সংখ্যা শতের সীমা পেরিয়ে যে হাজারে পৌঁছেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। অনেকের কেবলমাত্র নামটুকুই জানা যায়। আবার অনেকের নামটুকু জানাও সম্ভবপর হয়নি।

শুধু আবহাওয়াই প্রতিকূল ছিল তাই নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল ইসলাম প্রচারকদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু রাজারা ইসলাম

প্রচারকদেরকে সুনজরে দেখতে পারেননি। তারা এ সব প্রচারকের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকেন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কার্যধারা ব্যাহত করার প্রয়াস পান। ফলে ইসলাম প্রচারক সূফী ও আলিমদের অনেককে এ দেশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। এ যুদ্ধে কেউ কেউ শহীদও হয়ে যান। কিন্তু তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র ও চিন্তা চতুষ্পার্শ্বস্থ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের ধারাও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ফলে ধীর ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকা ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সূফী ও দরবেশগণের অনেকেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তির (কারামত) সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করেন বলে জানা যায়। কিন্তু জনগণের ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের মূলে এ অলৌকিক শক্তির তাড়না যতটুকু ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব। ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ অনাবিল এক-ঈশ্বরবাদ (তৌহিদবাদ) এবং নরপূজা, প্রতীকপূজা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অভিশাপমুক্ত একমাত্র সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বর্ণ, সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্যতার কলুষমুক্ত এক ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করার আদর্শই বাংলার ধর্ম বিভ্রান্ত ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিগৃহীত জনগোষ্ঠীকে পতঙ্গের ন্যায় ইসলামের আলোক-রশ্মির দিকে ধাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে এ সূফী ও আলিমগণ কোনো রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নি। বরং তাঁদের ইসলাম প্রচার পরবর্তীকালে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সহযোগী শক্তির কাজ করেছিল। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পর ইসলাম প্রচারের ধারা বন্যার বেগে এগিয়ে চলে। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এ গতিতে ভাটা পড়েনি। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং কোনো কোনো মুসলিম সুলতানের এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার কারণে ইসলাম প্রচার আন্দোলনের গতির তীব্রতা কমে আসে। তবুও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থান, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও দেওকোট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এ আমলে যে সকল সূফী ও মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে

বাংলায় আগমন করেন তন্মধ্যে প্রধান কয়েকজন হচ্ছেন ঃ (১) শাহ্ সুলতান বল্খী, (২) শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, (৩) বাবা আদম শহীদ, (৪) মখদুম শাহদৌলা শহীদ, (৫) শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী, (৬) শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকন, (৭) শাহ মাখদুম রূপোশ ও (৮) শায়খ ফরিদুদ্দীন শুক্করগঞ্জ

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায় ঃ শাহ্ সুলতান বল্খী

হযরত শাহ সুলতান বল্খী মাহীসওয়ার প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থান বা মস্তান গড়ে ইসলাম প্রচার করেন। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী এ মহাস্থানে অবস্থিত ছিল। তখন এ নগরের নাম ছিল পৌণ্ড্রনগর। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র এ মহাস্থানে হযরত শাহ সুলতান বল্খী মাহীসওয়ারের মাযার অবস্থিত। প্রথম যুগে যে সকল একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিংবদন্তির অন্তরালে তাঁর ইতিহাসের প্রায় সবটুকুই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তা থেকে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি।

কথিত আছে, তিনি বলখের আসগর নামে কোনো রাজার পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজপ্রাসাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় গা-ভাসিয়ে দেন। ফলে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন থেকে গাফেল হয়ে পড়েন এবং দেশে অত্যাচার ও জুলুমের রাজত্ব শুরু হয়। এ সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যা তাঁর সমগ্র জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। রাজকীয় সোফায় শায়িত থাকার জন্য রাজপ্রাসাদের জনৈকা ক্রীতদাসীকে তিনি বেত্রাঘাতের শাস্তি দান করেন। ক্রীতদাসীটিকে যখন বেত্রাঘাত করা হয় তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে চিৎকার করে ওঠে ঃ হায় ! এক মুহূর্তের আরামের জন্য যদি আমার এ চরম শাস্তি হয়ে থাকে তাহলে না জানি প্রতিদিনকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা ও দুনিয়ার সর্বাধিক আরাম-আয়েশ উপভোগ করার কারণে রাজার জন্য আল্লাহ্র দরবারে কি পরিমাণ শাস্তি অপেক্ষা করছে। ক্রীতদাসীর এ যন্ত্রণা নিঃসৃত অভিযোগ বাণী রাজার হৃদয়ের গভীর তন্ত্রীতে আঘাত করে। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি রাজকার্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং মানসিক শান্তির সন্ধানে সিংহাসন ত্যাগ করে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে দামেশ্কে চলে আসেন। এখানে তিনি বিখ্যাত সূফী শায়খ তওফীকের মুরীদ হন। প্রায় ৩৬ বছর পীরের খিদমত করার এবং আধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত থাকার পর পীর কর্তৃক বাংলায় ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হন। বাংলার অধিবাসীরা তখন ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পৌত্তলিক।

হযরত শাহ সুলতান বল্‌খী সমুদ্রপথে বাংলায় আগমন করেন। তিনি মৎস্যাকৃতি নৌকায় চড়ে এদেশে আগমন করেন বলে তাঁকে মাহীসওয়ার বা মৎস্যারোহী বলা হয়। বাংলার উপকূলে এসে তিনি সন্দ্বীপে অবতরণ করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর জনবহুল হরিরাম নগর রাজ্যে (ঢাকার হরিরামপুর ?) আগমন করেন। তৎকালে বলরাম নামে এক হিন্দু রাজা হরিরাম নগরে রাজত্ব করতেন। তিনি কালীদেবীর উপাসনা করতেন। নগরে পৌঁছে হযরত শাহ সুলতান সোজা রাজার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছোট, বড়, মাঝারি বহু মূর্তির মাঝখানে কালী-করালীর একট বিরাট মূর্তি স্থাপিত ছিল। মন্দিরে পৌঁছেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে আযান-ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। আযানের আশ্চর্য মহিমায় মন্দিরের মূর্তিগুলো একের পর এক ভেঙে পড়তে লাগলো এবং টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এ অলৌকিক ঘটনার কথা অনতিবিলম্বে রাজার কানে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি ভীত হয়ে দরবেশকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। রাজা দরবেশকে নগর থেকে বহিষ্কার করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু সেনাবাহিনী তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারলো না। অবশেষে রাজা বলরাম নিজেই দরবেশের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু রাজা নিহত হওয়া ছাড়া দরবেশের কোনো ক্ষতি করতে পারলেন না। রাজার মন্ত্রী দরবেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন, দরবেশ মন্ত্রীকে রাজ্যের সিংহাসন দান করলেন।

হরিরাম নগরে অবস্থানকালে হযরত শাহ সুলতান বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় শাসক পরশুরামের কথা জানতে পারলেন। তিনি শুনলেন, পরশুরামের অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিশেষত মুসলমানদের ওপর তিনি নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পরশুরামের রত্নমণি নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল এবং শীলাদেবী নামে এক জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী যোগসিদ্ধা ভগিনী ছিল। রাজা তাঁর আরাধ্য দেবী কালী-করালীর মন্দিরে প্রতিবছর একটি করে নরবলি দিতেন। জাদুবিদ্যা ও তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য শীলাদেবী প্রতিদিন মন্দিরে এ কালীদেবীর পূজা করতেন। হরিরাম নগরে বসে হযরত শাহ সুলতান এ সব কথা শুনে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে মনস্থ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মহাস্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহাস্থানে পৌঁছে তিনি রাজার কাছে নিজের ক্ষুদ্র জায়নামাযটি বিছাবার উপযোগী এক চিলতে জায়গা চাইলেন। রাজা ইতিপূর্বে রাজ্যের বাইরে দরবেশের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন, দরবেশের মনস্কামনা পূর্ণ করলে হয়তো তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং রাজা ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে উদ্যোগী হবেন না। তাই

তিনি কোনো প্রকার দ্বিধা না করেই দরবেশের দাবি পূরণ করলেন। কিন্তু মহা বিস্ময়ের সাথে সবাই প্রত্যক্ষ করলো যে, দরবেশের জায়নামাযখানা প্রসারিত করার সাথে সাথেই তা রাজ-প্রাসাদের চতুর্দিকের সমস্ত জায়গা ঘিরে ফেললো। এ আশ্চর্যজনক ঘটনায় রাজা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ভগিনী শীলাদেবীর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। শীলাদেবী তার জাদুর সাহায্যে দরবেশকে পরাস্ত করবেন বলে ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর দরবেশের বিরুদ্ধে তিনি জাদু ও তান্ত্রিক সাধনার অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু দরবেশের কেরামতির সামনে সব বিফলে গেল। শীলাদেবী পরাজিত ও ভীত হয়ে কালীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন।

দরবেশকে শান্তিপূর্ণভাবে বহিষ্কারে অক্ষম হয়ে রাজা এবার সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দরবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। রাজার পরে তাঁর মন্ত্রীও রাজার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিহত হলেন। এভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করে দরবেশ শীলাদেবীর সন্ধানে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি রাজকন্যা রত্নমণিকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং শীলাদেবী কালী মন্দিরে আত্মগোপন করেছেন বলে জানতে পারলেন। দরবেশ কালী মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। শীলাদেবী তার ভ্রাতৃকন্যা রত্নমণির ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে করতোয়া নদী পার হয়ে পলায়ন করার সংকল্প করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মন্দির থেকে বের হয়ে নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বে দরবেশকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখে ভীতবিহ্বল চিত্তে নদী বক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। করতোয়ার যে স্থানে শীলাদেবী আত্মহত্যা করেছিলেন তা আজও শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। অতঃপর দরবেশ পরশুরামের সেনাপতি ও অন্য বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। তিনি পরশুরামের সেনাপতি সুরখালের সাথে রত্নমণির বিবাহ দিলেন।

এভাবে মহাস্থানে ইসলাম বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাস্থান বিজয়ের পর দরবেশ সেখানে একটি মসজিদ ও আস্তানা নির্মাণ করে প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এ স্থান থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই সমাহিত হন। মহাস্থান অর্থ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ জায়গা। হাজার হাজার বছর থেকে এ স্থানটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বলে এর নাম মহাস্থান হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন স্থানটির আসল নাম 'মহা স্নান' অর্থাৎ বিখ্যাত স্নানের জায়গা। এ স্থানের শীলাদেবীর ঘাটটি বর্তমানে হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র। 'পৌষনারায়ণী যোগের' সময় এখানে করতোয়ার তীরে প্রতি বছর একটি মেলা বসে এবং হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী শীলাদেবীর ঘাটে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে।

স্থানীয় মুসলমানরাও মেলায় যোগদান করে রাজা পরশুরামের বিরুদ্ধে হযরত শাহ সুলতান বলখীর বিজয়-উৎসব পালন করে। তারা এ জন্য এ স্থানে নামায পড়ে ও ইসলাম অনুমোদিত অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করে।[১৩] স্থানীয় মুসলমানদের মতে এ স্থানটির নাম 'মস্তান গড়'। মস্তান গড় নামটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১০৯৬ হিজরীর (১৬৮৫ খৃ.) একটি সনদেও দেখা যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মস্তান গড় নামটি বাংলাদেশের ফকীর আন্দোলনের সরদার মজনু শাহ মস্তানার নামের সাথে জড়িত। এ ফকীর সরদার ১৭৬৩ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মহাস্থানকে তাঁর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করেন। প্রায় ২৫ বছর যাবত মজনু শাহ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃটিশ বিরোধী ফকীর আন্দোলন পরিচালনা করেন।

স্থানীয় জনশ্রুতিতে আমরা এ দরবেশকে শাহ সুলতান বলখী হিসেবে পাই। কিন্তু এতে দরবেশের আসল নামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ সূফী সম্প্রদায়ের সবাইকেই 'শাহ' নামে অভিহিত করা হয়। আর সুলতান বলখী অর্থাৎ বলখের সুলতান। কাজেই এ দরবেশের আসল নামটি কি। এ আসল নামের পরিচয় পাই ১০৯৬ হিজরীতে (১৬৮৫ খৃ.) সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত সনদে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের এ সনদটি শাহ সুলতান বলখীর দরগাহের খাদেম সাইয়েদ মোহাম্মদ তাহের, সাইয়েদ আবদুর রহমান ও সাইয়েদ মোহাম্মদ রেজাকে প্রদত্ত এক শাহী ফরমানে পাওয়া যায়। এ ফরমানে পীরোত্তর সম্পত্তির স্বীকৃতি দিয়ে দরবেশকে 'মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ মাহিসওয়ার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফরমান থেকে জানা যায়, তিনি বলখের সুলতান ছিলেন না। বলখের সুলতান সূফী শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহীম আদহামের ঘটনাটি সম্ভবত তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ মাহিসওয়ার ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭ খৃ.) মহাস্থানে আগমন করেন বলে কথিত হয়। কিন্তু এ তারিখ কতদূর সঠিক তা নির্ণয় করার কোনো মানদণ্ড আমাদের হাতে নেই। তবে তিনি যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই এ দেশে এসে ইসলামের আলো জ্বালিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। স্থানীয় জনশ্রুতিতে তাঁর আগমনের পূর্বে রাজা পরশুরামের মুসলমানদের উপর অত্যাচারের যে কাহিনী শোনা যায় তা থেকে ইসলামের প্রথম যুগে সমুদ্র ও স্থল পথে এ দেশে আরবদের ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত আমাদের বক্তব্য আরো শক্তিশালী হয়।

তবে কিংবদন্তির কাহিনীতে হরিরাম নগর ও মহাস্থানে রাজা বলরাম ও রাজা পরশুরামের সাথে দরবেশের যুদ্ধের যে কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে তা দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতার বেড়াজালে পরিবেষ্টিত হয়ে নিছক একটি অলৌকিক ঘটনা রূপে চিত্রিত

হয়েছে। অথচ ইসলামের ইতিহাসে এর একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, কোনো সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সেনাপতি একাই নিছক অলৌকিক ক্ষমতা বলে কোনো যুদ্ধ জয় করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করেছেন, সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করেছেন এবং সেনাদল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই আমাদের মতে হযরত শাহ্ সুলতান বলখী অবশ্যই বলরাম ও পরশুরামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশের বিক্ষুব্ধ ও হিন্দু শাসনে উৎপীড়িত এবং নিপীড়িত বৌদ্ধ, অনার্য ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু জনগোষ্ঠী তাঁর সাথে সহযোগিতা করেছিল। তাদের সশস্ত্র সহযোগিতায় তিনি এ হিন্দু রাজাদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছিলেন এবং এ সঙ্গে ইসলামের আলোকে তাদের হৃদয়দেশ আলোকিত করেছিলেন। রাজা পরশুরামের অত্যাচার প্রসঙ্গে ডঃ এম. এ. রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ

"জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, রাজা পরশুরাম অত্যাচারী ছিলেন এবং তিনি বিশেষভাবে মুসলিম প্রজাদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নির্মম। ফলে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। এ থেকে এইচ. বিভারিজ অনুমান করেছেন যে, রাজার এহেন অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই শাহ্ সুলতান মাহিসওয়ার জনগণের একটা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও এ গণবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।"

শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমী

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে হযরত শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমীর মাযার অবস্থিত। এ মাযারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিষ্কর সম্পত্তি রয়েছে তার স্বীকৃতি দিয়ে ১০৮২ হিজরীতে (১৬৭১ খৃ.) বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র বাঙ্গালার সুবাদার শাহ্ সুজা এক সনদ প্রদান করেছিলেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত এ শাহী সনদে উল্লিখিত হয়েছে যে, শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমী ৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খৃ.) তাঁর মুরশিদ সাইয়েদ শাহ্ সুর্খখুল আনতিয়াহ্ সহ মদনপুরে আগমন করেন। এ ফার্সী দলিল থেকে এ কথাও জানা যায় যে, স্থানীয় কোচ রাজা দরবেশকে বিষপান করতে দেন। তিনি নির্দ্বিধায় তা গলাধঃকরণ করেন। তাঁর এ অলৌকিক শক্তি দেখে কোচ রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দরবেশ ও তাঁর ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের খেদমতের জন্য সমগ্র গ্রাম উৎসর্গ করেন।

এ ব্যাপারে হযরত শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমী সম্পর্কে স্থানীয় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে যে কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ময়মনসিংহে প্রবেশ করে হযরত শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী মদনপুরে আস্তানা গাড়েন। তৎকালে এ এলাকায় জনৈক শক্তিশালী কোচ রাজা রাজত্ব করতেন। দরবেশ ও তাঁর কতিপয় সঙ্গ-সাথী ছাড়া এ এলাকায় তৎকালে আর কোনো মুসলমান ছিল না। দরবেশের মাযারের পাশেই তাঁর এ শিষ্য-সাথীদের কবরও বিদ্যমান রয়েছে। মদনপুরে বসতি স্থাপন করার পর তিনি নিজের বহু অলৌকিক কার্য-কলাপের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। কথিত আছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করেছে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর সক্রিয় ও প্রাণ-উৎসর্গকারী শিষ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অল্পকাল মধ্যে কোচ রাজার কানেও এ কথা গেল। তিনি দরবেশের সাফল্যে প্রমাদ গনলেন। দরবেশকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে দরবেশ রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। ইসলামের মাহাত্ম্য প্রমাণ করার জন্য রাজা দরবেশকে একপাত্র বিষ পান করতে দিলেন। দরবেশ 'বিসমিল্লাহ্' বলে বিনা দ্বিধায় বেশির ভাগ বিষ পান করে নিলেন এবং অবশিষ্টাংশ তাঁর শিষ্য সাথীদেরকে অল্প অল্প করে পান করতে দিলেন। বিষে দরবেশ ও তাঁর শিষ্যদের কোনো ক্ষতি হলো না দেখে রাজা, তাঁর পারিষদবর্গ ও দরবারে উপস্থিত সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। দরবেশের অলৌকিক কর্ম-ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে উক্ত কোচ রাজাই সমগ্র মদনপুর গ্রামটি দরবেশকে পীরোত্তর সম্পত্তিরূপে দান করেন।

হযরত শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমী মদনপুরে আগমনের যে তারিখ বর্ণিত হয়েছে তাকে কোনোক্রমেই অগ্রহণযোগ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। ১৮২৯ সালে সরকার যখন মদনপুর স্টেট পুনর্দখল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন হযরত শাহ্ মোহাম্মদ সুলতান রুমীর মাযারের মুতাওয়াল্লী আমাদের পূর্ব বর্ণিত সনদটি পেশ করেন। হযরত রুমীই যে ময়মনসিংহ এলাকার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

বাবা আদম শহীদ

বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তির নায়ক বাবা আদম শহীদ বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের মুজাহিদ সূফিগণের অন্যতম। অন্যান্য সূফি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা একাকী বা কতিপয় শিষ্য-শাগরিদসহ এ দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ইসলামের অন্তর্নিহিত অনাবিল সত্যের জোরে পৌত্তলিকতার এ কেন্দ্রভূমিতে তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বাবা আদম শহীদ সম্পর্কে

জানা যায় যে, যথারীতি একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার মাটিতে আস্তানা গেড়েছিলেন। ইতিহাসের বিচারে এটা কতদূর সত্য এবং বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে একটি মুসলিম সেনাবাহিনীর সমুদ্রপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যাওয়া কতদূর বাস্তবধর্মী তা বিচার্য হলেও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বাবা আদম সম্পর্কিত কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি আশ্চর্যজনক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন মুখে ও বিভিন্নভাবে এ কিংবদন্তিগুলো শ্রুত হলেও এগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। এ কিংবদন্তিগুলোর মধ্য থেকে ঐতিহাসিক সত্য বাছাই করার জন্য আমরা নিচে এর সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি।

রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালের (১১৫৮—১১৭৯ খৃ.) গো কোরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম শহীদ একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা জেলার (তৎকালীন) বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামে তাঁবু স্থাপন করে আহার্যের আয়োজন করার জন্য তাঁর সৈন্যরা একটি গরু জবেহ করে। অকস্মাৎ একটি চিল মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরা গরুর গোশত ছোঁ মেরে নিয়ে রাজার সেনা শিবিরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। এ সময় অন্য একটি চিল এসে প্রথম চিলটির থাবা থেকে গোশতের টুকরাটি ছিনিয়ে নিতে চায়। গোশতের টুকরাটি নিয়ে শূন্যে উভয় চিলের লড়াই বেঁধে যায়। ফলে এক সময় গোশতের টুকরাটি মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু সেনারা বুঝতে পারে যে, এটা কোনো জবেহ করা গরুর গোশত এবং তারা অবিলম্বে রাজা বল্লাল সেনকে এ সংবাদটি অবগত করায়। রাজা বল্লাল সেন তৎকালে বিক্রমপুরে রাজত্ব করতেন। রাজা এ ব্যাপারে তদন্ত করে জানতে পারলেন যে, যবনরা (মুসলমান) তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদলসহ আগমন করেছে। কাজেই তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে যবনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। যবন ও হিন্দুদের মধ্যে পনেরো দিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চললো। চতুর্দশ দিবসে হিন্দুরা তাদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি অনুভব করলো এবং যবনদেরকে অজেয় মনে করলো। সেনাবাহিনীর হতাশা লক্ষ্য করে পঞ্চদশ দিবসে রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনী পরিচালনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়লাভ সম্পর্কে রাজা নিজে নিশ্চিত ছিলেন না। পরাজয় ঘটলে যাতে ম্লেচ্ছ (মুসলমান) বাহিনীর হাতে রাজপরিবারের মহিলাদের কোনোরূপ অমর্যাদা না হতে পারে এ জন্য তিনি যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে রাজ অন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুণ্ড (চিতা) প্রজ্বলিত করে গেলেন এবং পরিবারস্থিত মহিলাদেরকে পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্তাবহন

করার জন্য তিনি একজোড়া সংকেতবাহী কবুতরকে পোশাকের নিচে সংগোপনে রেখে দিলেন।

রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। মুসলিম সেনারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলো। মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক শাহাদত বরণ করলো। অবশেষে বাবা আদম তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও বিক্রমের পরিচয় দিয়ে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করে যেতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর শাহাদত নিকটবর্তী। কাজেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর শেষ নামাযে রত হলেন। সুযোগ বুঝে রাজা ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজা বারবার তাঁর ঘাড়ে তরবারির আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, তাঁর শত আঘাত দরবেশের ঘাড়ে একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি। রাজার বারংবার আঘাতের মধ্যেও দরবেশ তাঁর নামায পড়ে যেতে থাকেন। নিশ্চিন্তে নামায শেষ করার পর দরবেশ রাজাকে বললেন ঃ নিজের তরবারি ত্যাগ করে আমার তরবারি নিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করুন। দরবেশের নির্দেশমতো রাজা দরবেশের শিরশ্ছেদ করলেন। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সবাই শাহাদত বরণ করলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর সারা শরীর ও পোশাক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি রক্তাক্ত শরীর ও পোশাক ধুয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। নিকটেই একটি পুকুর ছিল। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পুকুরের কিনারে পৌঁছে তিনি একের পর এক সমস্ত পোশাক খুলে ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু অভাবিত বিজয়ের আনন্দে পোশাক অভ্যন্তরের সংগোপনে রক্ষিত কবুতর দু'টির কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। রাজার অমনোযোগিতার কারণে কবুতর দু'টি মুক্তি পেয়ে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে উড়ে গেলো। প্রাসাদবাসী রমণীরা সংকেতবাহী কবুতর দেখে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্নান শেষে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ত্বরিত গতিতে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হলেন। কিন্তু সেখানে ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। সে এক হৃদয় বিদারক কাণ্ড। রাজা দেখলেন, তাঁর পরিবার-পরিজন সবাই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ দিয়েছে। কেউ বেঁচে নেই। দুঃখে ও অনুশোচনায় তিনি নিজেও জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এভাবে যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজা বল্লাল সেন সপরিবারে আগুনে পুড়ে মরে 'পোড়া রাজা' উপাধি লাভ করলেন। এ উপাধি নিয়েই তিনি আজও জনগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে আসছেন। আর অন্যদিকে রাজার হস্তে নিহত হয়ে বাবা আদম লাভ

করলেন শহীদ উপাধি। দরবেশ শাহাদত বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হলো। সমগ্র এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করলো।

আবদুল্লাহপুরে দরবেশের মাযার অবস্থিত। মাযারের অদূরে 'আদম শহীদের মসজিদ' নামে একটি জীর্ণপ্রায় মসজিদও দেখা যায়। মসজিদটিতে একটি আরবী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮২–১৪৮৭ খৃ.) উৎকীর্ণ উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ৮৮৮ হিজরী সনে (১৪৮৩ খৃ.) কাফূর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়।[১৪] এ শিলালিপি থেকে অন্তত এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৪৮২ খৃস্টাব্দের পূর্বে বাবা আদম শহীদ হন। কারণ দরবেশদের মৃত্যুর পরই তাদের দরগাহ এবং দরগাহ সংলগ্ন মসজিদ নির্মিত হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকশ বছর পর এ সব মসজিদ নির্মিত হতে দেখা গেছে। কাজেই বাবা আদম শহীদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

এখানে আমরা পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এ কাহিনীর ঐতিহাসিক দিকটি পর্যালোচনা করতে চাই। এ কাহিনীতে আমরা একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিচয় পাই। তিনি হচ্ছেন রাজা বল্লাল সেন। বাংলার ইতিহাসে একজন মাত্র বল্লাল সেনের নাম পাওয়া যায়। সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন। যে লক্ষণ সেনকে নদীয়া থেকে বিতাড়িত করে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। 'বল্লাল চরিত' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থেও বাবা আদমের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ডঃ এনামুল হক তাঁর 'এ হিস্ট্রী অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে বিক্রমপুরের ইতিহাস থেকে গোপাল ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিতে উল্লিখিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তার কিয়দংশ আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি ঃ

অথা বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈব চক্রাৎ সুদারুণাৎ।
বিক্রমপুর মধ্যে চ রামপাল গ্রামে তথা ॥
বায়াদুম নাম ম্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ।
যযৌস যুদ্ধে চ বল্লাল বিপক্ষ সম্মুখং তথা ॥
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্তালিঙ্গণ চুম্বনং।
স্ত্রিয়োহব্রুবংস্ত রাজানাং বাস্পাকুলিত লোচনৈঃ ॥
যদিস্যাদ শিবং যুদ্ধে কিং নো জাথ গতিস্তদা।
ততো গদ্‌গদ্‌সৌ রাজা সংচুম্বগলিঙ্গৎ তাঃ পুনঃ।
ধ্বাত্র যবনাৎ ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতং চ বৈ ॥
কপোত যুগলং দূতং সমামঙ্গল সূচকং।
পূর্ব প্রস্তুত চিতায়াং দৃষ্টেবমরণং ধ্রুবং ॥

এতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল গ্রামে বায়াদুম নামক জনৈক ম্লেচ্ছের সাথে রাজা বল্লালের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বায়াদুম যে বাবা আদমের বিকৃত উচ্চারণ তাতে সন্দেহ নেই। তবে বল্লাল চরিতের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেছে। বল্লাল চরিত নামে দুটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। প্রথম গ্রন্থটির দুই খণ্ড বল্লাল সেনের (১১৫৯–১১৭৮ খৃ.) অনুরোধে তাঁর শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্তৃক এবং তৃতীয় খণ্ডটি এর দেড়'শ বছর পর নবদ্বীপাধিপতির আদেশে গোপাল ভট্টের বংশধর আনন্দ ভট্ট কর্তৃক রচিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খানের আদেশে আনন্দ ভট্ট কর্তৃক চতুর্দশ শতকে রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম গ্রন্থখানিকে জাল ও দ্বিতীয় গ্রন্থখানিকে আসল বল্লাল চরিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয় গ্রন্থের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং অন্য প্রমাণাভাবে এর কোনো বক্তব্য মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ১৩৭৮ খৃস্টাব্দে বিক্রমপুরে রাজত্বকারী আর একজন বল্লাল সেনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে তাঁর এ উক্তি মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলার ইতিহাসে বিজয় সেনের পুত্র ও লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বল্লাল সেনের নাম আমরা পাই না (অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি)। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পরও যে কয়জন হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যেও কোনো বল্লাল সেনের সন্ধান পাওয়া যায় না। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১–১৩২২ খৃ.) সর্বপ্রথম সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরে পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকে নিয়ে বিক্রমপুর আর কোনদিন হিন্দু রাজাদের অধীনে আসেনি। পরবর্তীকালে ১৩৩৮ খৃস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর বর্ম রক্ষক ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এ সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এরপর থেকে সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর এলাকা মুসলিম ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। আর যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত যে সময় (১৩৭৮ খৃ.) বিক্রমপুরে দ্বিতীয় রাজা বল্লাল সেনের অস্তিত্বের দাবি করেছেন তখন তা ছিল ইলিয়াসশাহী বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী সুলতান ইলিয়াস শাহের (১৩৫৮–১৩৯১ খৃ.) কর্তৃত্বাধীন।

এছাড়াও লাখনৌতির শাসনকর্তা মুগীসুদ্দীন তুগরল (১২৭১–১২৮২ খৃ.) যখন সোনারগাঁওয়ে নিজের সাময়িক শাসন প্রতিষ্ঠা করে 'কিলা-ই-তুগরল' নামক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন ঠিক সেই আমলেই ১২৭৫ থেকে ১২৭৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে

তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস ও ইসলামী জ্ঞান বিশারদ হযরত শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্ সোনারগাঁওয়ে আগমন করে এ স্থানে ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন। অথচ বাবা আদম শহীদের আগমনের পূর্বে এ এলাকায় ও এর আশেপাশে ইসলামী জ্ঞানের কোনো চর্চাই ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ সময় থেকে বহু পূর্বেই বাবা আদম শহীদের আগমন হয়েছিল। তবে কি লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেনের সাথে বাবা আদমের যুদ্ধ হয়েছিল ? লক্ষণ সেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বিক্রমপুরে এসে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। অতঃপর তাঁর বংশধরগণ অন্তত ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ অবধি বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছিলেন বলে মিনহাজ-উস-সিরাজের তাবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বল্লাল সেন কোনদিন বিক্রমপুরে এসে রাজত্ব করেন নি বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। নানা কারণে এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। বল্লাল সেনের তিনটি রাজধানী ছিল বলে বল্লাল চরিতে উল্লিখিত হয়েছে। এ তিনটি রাজধানী হচ্ছে ঃ বিক্রমপুর, গৌড় ও স্বর্ণগ্রাম। সেন রাজত্বকালে বিক্রমপুর যে সেন রাজাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তা বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের আমলে বিক্রমপুর থেকে ভূমিদানের ঘটনায় অনুমান করা যায়। এমনকি লক্ষণ সেনের আমলের প্রথম ছয় বছর যে পরিমাণ ভূমি দান করা হয় তার বেশির ভাগই ইস্যু করা হয় বিক্রমপুর থেকে।[১৫] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "বিজয় সেন (বল্লাল সেনের পিতা) বঙ্গদেশ জয় করার পর যে ঢাকার নিকটবর্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের এবং লক্ষণ সেনের রাজত্বের প্রথমভাগের যে সমুদয় তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সবই 'শ্রী বিক্রমপুর সমাষাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার' হইতে প্রদত্ত। 'স্কন্ধাবার' শব্দে শিবির ও রাজধানী উভয়ই বুঝায়। কিন্তু যখন তিনজন রাজার তাম্রশাসনেই এই এক স্কন্ধাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ইহাকে রাজধানী অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত। ইহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে। বিজয় সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার মহাদেবী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী বিলাস দেবী বিক্রমপুর উপকারীকা মধ্যে তুলাপুরুষ মহাদান নামক বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সুতরাং বিক্রমপুর যে অস্থায়ী শিবির মাত্র নহে বরং স্থায়ী রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে বিক্রমপুরে বল্লাল বাড়ি প্রভৃতি সেন রাজাগণের অতীত কীর্তির ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন আছে।"[১৬] উপরন্তু বখতিয়ার খলজীর হাতে পরাজিত হয়ে লক্ষণ সেনের বিক্রমপুর চলে আসাও সেন আমলে বিক্রমপুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আর একটি প্রমাণ।

বল্লাল সেন রচিত 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' দু'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থটি তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। তাঁর নির্দেশক্রমে পুত্র লক্ষণ সেন এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থ থেকে বল্লাল সেনের শেষ জীবনের কথা যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র লক্ষণ সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁকে সাম্রাজ্য রক্ষারূপ মহাদীক্ষায় দীক্ষিত করে সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এ গ্রন্থের একটি শ্লোকের এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, বৃদ্ধ রাজা ও রাণী স্বেচ্ছায় গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করেছিলেন।[১৭] এ থেকে জানা যায় যে, শেষ বয়সে রাজা বল্লাল সেন রাজধানীতে ছিলেন না এবং রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল না। বরং তিনি গঙ্গাতীরে দায়িত্ব মুক্ত জীবন যাপন করছিলেন। স্বভাবতই অনুমান করা যায়, তিনি যে স্থানে দায়িত্বমুক্ত জীবন যাপন করছিলেন সেই স্থানে নিশ্চয়ই কোনো বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী ছিল না। এ ঘটনাই তৎকালীন গঙ্গাতীরবর্তী রামপালে (বিক্রমপুর) রাজা বল্লাল সেনের উপস্থিতি ও তাঁর সাথে বাবা আদম শহীদের সংঘর্ষ সম্পর্কিত আমাদের অনুমানকে আরো শক্তিশালী করে। এ সম্পর্কিত অন্য কোনো শক্তিশালী তথ্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ মত পোষণ করতে পারি।

রাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদ আজও রামপালে বল্লাল বাড়ি নামে পরিচিত। একটি টিলার আকারে এর ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। চতুর্দিকে দূর্গপরিখা বেষ্টিত একটি আয়াতকার ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল।[১৮]

রাজা বল্লাল সেনের মৃত্যু হয় ১১৭৯ খৃস্টাব্দে। কাজেই বাবা আদম শহীদ ১১৭৯ খৃস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন বলে অনুমান করা যায়। বাবা আদম শহীদের আগমনের সাথে আবদুল্লাহপুর নামটিও জড়িত। এ গ্রামে তাঁর মাযারও অবস্থিত। কিংবদন্তিতে বাবা আদম শহীদের আগমনের পূর্বে মুসলমান ও আবদুল্লাহপুর নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ কথা সত্য বলে ধরে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, বাবা আদম শহীদ এ এলাকায় প্রথম ইসলাম প্রচারক নন। তাঁর পূর্বে এ এলাকায় আরো এক বা একাধিক ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন। কিংবদন্তিতে তারই আভাস পাওয়া যায়। বস্তুত এ এলাকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েকশ বছর আগে থেকেই যে আরব বণিকদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় বহু পূর্বেই বাংলায় ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত হয়েছে এ ঘটনা থেকে আমাদের এ অনুমানই শক্তিশালী হয়।

মখদুম শাহদৌলা শহীদ

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে হযরত মখদুম শাহদৌলা শহীদের মাযার রয়েছে। তিনি ইয়ামনের শাসনকর্তা, রাসূলে করীম (সা)-এর অন্যতম সাহাবী হযরত মু'আয

ইবনে জাবাল (রা)-এর বংশধর বলে কথিত। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে যে, আরবের অন্তর্গত ইয়ামন থেকে নিজের এক ভগিনী, তিন ভাগিনেয় ও বহু অনুচরসহ তিনি বাংলায় আগমন করেন। দলবলসহ শাহজাদপুরে এসে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতিদিন তাঁর হাতে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁদের ইসলাম প্রচারের খবর শুনে নানাভাবে তাঁদেরকে উৎপীড়ন করতে থাকে। অবশেষে একদিন রাজার লোকজন দরবেশের আস্তানা আক্রমণ করে এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করলেও দরবেশ ও তাঁর ২১ জন অনুচর শহীদ হন। দরবেশের মাযারের কাছেই এ ২১ জন অনুচরের মাযার রয়েছে। দরবেশের অবশিষ্ট মুরীদগণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ফলে অল্পকাল মধ্যেই পাবনা ও বগুড়া জেলায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। প্রতি বছর চৈত্র মাসে হযরত শাহদৌলা শহীদের পুণ্য স্মৃতি উপলক্ষে শাহজাদপুরে একমাস স্থায়ী মেলা বসে। এতে মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে বহু লোক যোগদান করে। শাহজাদপুরের বর্তমান মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই মখদুম শাহদৌলার অন্যতম ভাগিনেয় খাজা নূরের বংশধর বলে কথিত।

মখদুম শাহদৌলা শহীদ বাংলায় আসার পূর্বে বুখারায় গিয়ে জালালুদ্দীন বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে জানা যায়। তিনি পারস্যের বিখ্যাত মরমী কবি মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর ওস্তাদ শামসুদ্দীন তাবরিজীর শিষ্য ছিলেন। জালালুদ্দীন বুখারী ১১৯৬ থেকে ১২৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে 'আইন-ই-আকবরী' ও 'তাজকিরায়' উল্লিখিত হয়েছে। আর শামসুদ্দীন তাবরিজী ১২৪৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। তাহলে বলা যেতে পারে যে, মখদুম শাহদৌলা শহীদ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে বাংলায় আগমন করেন। কারণ জালালুদ্দীন বুখারী কমপক্ষে ৪০ বছর বয়ঃক্রমের পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারেন না। যদি ১২৩৬ খৃস্টাব্দে তাঁর ৪০ বছর বয়সের সময় মখদুম শাহদৌলা শহীদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে থাকেন তাহলে শামস তাবরিজী এরপরও সাত বছর বেঁচে ছিলেন। এ ক্ষেত্রে ১২৪০-এর পরেও তাঁর পক্ষে শামস তাবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা সম্ভব। কাজেই সম্ভবত ১২৪০ খৃস্টাব্দের পরেই তিনি বাংলায় আগমন করেছিলেন।

মখদুম শাহদৌলা শহীদের মাযার সংলগ্ন মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুসলিম সুলতানগণ ৭২২ বিঘা জমি ওয়াক্‌ফ করেন। বর্তমানে এ ওয়াকফ সম্পত্তিটি বিদ্যমান রয়েছে। উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে মখদুম শাহদৌলা শহীদের মাযারটি অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

জালালুদ্দীন তাবরিজী

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই ও সমসময়ে যে সকল সূফী-দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন তাঁদের পুরোধা। বখতিয়ার খলজীর নোদিয়া (নদীয়া) অভিযানের পর সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ খলজীর শাসনামলের কোনো এক সময়ে তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার লাখনৌতি (লক্ষণাবতী) নগরে উপনীত হন এবং লাখনৌতি থেকে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত পাণ্ডুয়ায় আস্তানা বা কেন্দ্র স্থাপন করেন। লক্ষণাবতী আসলে গৌড়ের অপর নাম। রাজা লক্ষণ সেনের আমলে এর লক্ষণাবতী নামকরণ হয় বলে মনে করা হয়। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব থেকেই গৌড় বঙ্গের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরও কয়েকশ বছর পর্যন্ত গৌড় ছিল মুসলিম বঙ্গের রাজধানী। মাঝখানে প্রায় ৫০ বছর কাল গৌড় থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাই মুসলিম ইতিহাসে গৌড়ের সাথে সাথে পাণ্ডুয়াও সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী তৎকালীন বাংলার রাজধানীর উপকণ্ঠে আস্তানা স্থাপনের কারণে তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে বাংলার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত হলায়ূধ মিশ্র কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থটিই এর অন্যতম প্রমাণ। এ গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানদের বঙ্গ-বিজয়ের কয়েকশ বছর পূর্ব থেকে এ দেশে বহু মুসলিম সূফী-সাধক ও ইসলাম প্রচারকের আগমন হলেও শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর ন্যায় আর কেউই বাংলার মানুষকে এত বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি।

তিনি পারস্যের তাবরিজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'তাজকিরা-ই-আউলিয়া-ই-হিন্দ' ও 'আইন-ই-আকবরী' এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব। তবে লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত হলায়ূধ মিশ্র রচিত 'শেক শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে দাবি করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ভারতের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের 'ইটাওয়া' জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম জীবন সম্পর্কে এ গ্রন্থে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, প্রথম জীবনে এক বণিকের গৃহে একাদিক্রমে বারো বছরেরও অধিককাল জায়গীর থেকে তিনি লেখাপড়া করেন। বণিকের যুবতী কন্যা আয়েশা তার অজ্ঞাতসারে তার প্রতি আসক্ত

হয়ে পড়ে। একদিন সে জালালুদ্দীনের পাঠগৃহে প্রবেশ করে তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু জালালুদ্দীন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। বণিক কন্যা ক্রোধান্ধ হয়ে তার পিতা-মাতার কাছে জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ আনে। ফলে বণিক-গৃহ ও এই সঙ্গে বিদ্যানিকেতন থেকেও জালাল বহিষ্কৃত হন। বণিক জালালুদ্দীনের জন্য বারো বছর ধরে যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন জালালুদ্দীনের পিতার কাছে তা ফেরত দেবার দাবি জানান। ভীত হয়ে জালালুদ্দীনের পিতা-মাতা দেশ ত্যাগ করেন। এভাবে দুনিয়ার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে জালালুদ্দীন রত্নদ্বীপের নিকটবর্তী রত্নশেখর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন।

'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর জীবন কাহিনী বর্ণনায় যেভাবে রোমাঞ্চের অবতারণা করা হয়েছে তাতে তার উপর কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ ও মিসর-সম্রাজ্ঞীর (জোলেখা) কাহিনীর ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ থেকে এ অনুমান মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর বিস্ময়কর প্রভাব তৎকালীন বাংলার প্রতিপত্তিশালী ও শিক্ষিত সমাজের উপর পরিব্যাপ্ত ছিল। তিন-চার'শ বছর আগে থেকেই যেখানে মুসলমানদের সাথে বাংলার শাসক সমাজের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং অন্তত দু'শ বছর থেকে মুসলিম সূফী ও দরবেশদের এ দেশে আগমন চলছিল, সেখানে ত্রয়োদশ শতকে অথবা তার পরে রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে ইসলামী চিন্তার ছাপ পড়া এবং একজন প্রভাবশালী মুসলিম সাধকের প্রথম জীবন সম্পর্কে পরিকল্পিত কাহিনী বর্ণনা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে 'শেক শুভোদয়া' কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের দিকটি সেখানে অবহেলিত এবং আখ্যান ও রোমাঞ্চের দিকটি প্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই জালালুদ্দীন তাবরিজীর জন্মস্থান ও তাঁর প্রথম জীবনের ঘটনাবলী অন্য প্রমাণাভাবে শেক শুভোদয়ার বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

অন্য বর্ণনার অভাবে শেক শুভোদয়ার বর্ণনার ভিত্তিতে ডঃ এনামুল হক শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীকে উত্তর ভারতের সূফী-সাধকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর তাবরিজী উপাধিকে নিছক ঐতিহ্যগত ও বংশানুক্রমিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৯] অথচ সৈয়দ, হাশেমী, ফাতেমী, আব্বাসী, উলুব্বী প্রভৃতি গোত্র ও বংশগত উপাধি গ্রহণের প্রবণতা প্রথম যুগ থেকে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও এবং শিরাজে জন্মগ্রহণ না করেও বংশানুক্রমিক শিরাজী ও গজনীতে জন্মগ্রহণ না করেও বংশানুক্রমিক গজনবী উপাধি গ্রহণের প্রবণতা বর্তমানে (উনবিংশ ও বিংশ শতকে) দু-চারটে দেখা গেলেও দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এর একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কাজেই কেবলমাত্র শেক শুভোদয়ার ভিত্তিতে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীকে উত্তর ভারতীয় সূফী-সাধক হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

মওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী শায়খ আবূ সাঈদ তাবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শায়খ আবূ সাঈদ তাবরিজীর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানে শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি পীরের খিদমত করতে থাকেন এবং এমন খিদমত করেন যা কোনো গোলাম তার মনিবের এবং কোনো মুরীদ তার পীরের করতে পারে না। কথিত আছে, হজ্জ সম্পাদনের জন্য শায়খ সোহরাওয়ার্দী প্রতি বছর পদব্রজে বাগদাদ থেকে মক্কা আসতেন। শায়খ জালালুদ্দীনও পীরের সাথে পদব্রজে হজ্জ পালন করতেন। বার্ধক্যের দরুন হযরত শিহাবুদ্দীন কোন প্রকার ঠাণ্ডা খাদ্য খেতে পারতেন না। পীরকে গরম খাদ্য সরবরাহ করার জন্য শায়খ জালালুদ্দীন সারা পথ গরম চুল্লী মাথায় করে নিয়ে চলতেন। ক্ষুধার সময় সঙ্গে সঙ্গে চুল্লী নামিয়ে পীরের জন্য গরম খাবার উপস্থিত করতেন। তাঁর ধৈর্য, একাত্মতা ও দীর্ঘ সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে হযরত শিহাবুদ্দীন তাঁকে 'খিরকা-ই-খিলাফত' দান করেন।

হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পুরোধা শ্রেষ্ঠ সূফী ও দরবেশ এবং আধ্যাত্মিক জগতের নেতা হিসেবে পরিগণিত হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর সাথে তাঁর বাগদাদে পরিচয় হয়। হযরত মঈনুদ্দীন তৎকালে শায়খ শিহাবুদ্দীনের সাহচর্য লাভের জন্য বাগদাদে আগমন করেছিলেন। বাগদাদ থেকে শায়খ জালালুদ্দীন মক্কা, মদীনাসহ আরব, ইরাক ও ইরানের বহু শহর পরিভ্রমণ করার পর হিন্দুস্তানে পাড়ি জমান। এখানে মুলতানে অবস্থান কালে তাঁর একান্ত সুহৃদ ও সতীর্থ শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা তখন ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা। কুবাচার মুলতানের শাসনকর্তা থাকাকালেই জালালুদ্দীন তাবরিজী মুলতান ত্যাগ করে দিল্লীতে আসেন। শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (১২১০–১২৩৬ খৃস্টাব্দ) তখন দিল্লীর বাদশাহ। তিনি উলামা ও মাশায়েখদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁদেরকে যথাযোগ্য সমাদর করতেন। হযরত শায়খ জালালুদ্দীনকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেন। বাদশাহ্র এ সমাদর দেখে দিল্লীর তৎকালীন শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন। তিনি শায়খ জালালুদ্দীনের বিরোধিতা করতে থাকেন। জনৈকা দুশ্চরিত্রা মহিলাকে প্রলুব্ধ করে তিনি শায়খ জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেন। কতিপয় আলিম ও দরবেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির উপর বাদশাহ এ সম্পর্কিত তদন্তের ভার দেন। শায়খ বখতিয়ার কাকী ও শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়াও ঐ কমিটিতে ছিলেন। কমিটি যথাযথ তদন্তের পর শায়খ জালালুদ্দীনের

বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে। বাদশাহ মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য শায়খুল ইসলামকে পদচ্যুত করেন। 'আখবার-উল-আখইয়ার', 'সিয়ার-উল-আউলিয়া' প্রভৃতি ফার্সী গ্রন্থে এ সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

এ ঘটনায় শায়খ জালালুদ্দীন অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে বাদায়ূনে যাত্রাবিরতি করেন। বাদায়ূন থেকে তিনি বাংলার তৎকালীন রাজধানী লক্ষণাবতীতে এসে পৌঁছেন। এখানে একদিন তাঁর মুরীদদেরকে বলেন ঃ "এসো আমরা শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগরার জানাযা পড়ি। তিনি আমাদের দিল্লী থেকে বহিষ্কার করেছেন, আল্লাহ্ তাঁকে এ দুনিয়া থেকে বহিষ্কার করেছেন।"

'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ১১২৪ শকাব্দে (১১২৪+৭৮=১২০২ খৃ.) লক্ষণাবতীতে আগমন করেন। এ গ্রন্থ অনুসারে শায়খ জালালুদ্দীন রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালেই বাংলাদেশে আসেন এবং আসন্ন তুর্কী আক্রমণ সম্পর্কে রাজাকে সতর্ক করে দেন। রাজা তাঁর অলৌকিক কাজে বিস্মিত হয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সম্মানার্থে একটি দরগাহ নির্মাণ করেন ও কিছু ভূ-সম্পত্তিও দান করেন। এ সূত্র অবলম্বনে দেখা যায়, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের পূর্বেই বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। কিন্তু ফার্সী ভাষায় লিখিত সূফীদের জীবনী গ্রন্থগুলোতে এ সূত্রের অনুকূলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফার্সী গ্রন্থগুলো থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। সেই তথ্যগুলো থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি সত্য উপলব্ধি করা যায়। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী ১১৯২ খৃস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক দিল্লী ও আজমীর অধিকার করার পর উপমহাদেশে পদার্পণ করেন। কাজেই ১১৯২ খৃস্টাব্দের আগে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাগদাদে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর সাথে পরিচিত হন। 'সিয়ারুল আউলিয়া' ও 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী বাগদাদে অবস্থান কালে যখন শুনলেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী আজমীরে আবাস স্থাপন করেছেন তখন তিনি বাগদাদ থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কাজেই ১২০৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর লাহোরে অবস্থান করার এবং তারপর শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ারও তাঁর সাথে মিলিত হওয়া সেই যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক মনে হয়। কারণ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী হিন্দুস্তানে প্রবেশ করে কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন। হযরত আলী আল হিজবিরীর (দাতা গঞ্জ

বখশ) মাযারে তিনি চিল্লাও দেন। এ ছাড়াও কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ভারতে পৌঁছে নিশ্চয়ই আজমীরে কিছুকাল তাঁর শায়খের কাছে অবস্থান করেছিলেন। এ সব বিবেচনা করলে ১১৯২ থেকে ১২০৬ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ ১৪ বছর সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যবধান বলে মনে হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা ১২০৬ থেকে ১২১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময় মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। কাজেই ১২০৬ থেকে ১২১৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী মুলতান থেকে দিল্লীতে চলে আসেন। যদি ইলতুতমিসের রাজত্বের (১২১০–১২৩৬ খৃ.) প্রথম দিকেও তিনি দিল্লীতে আসেন তাহলেও অন্তত ১২১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাকে দিল্লীতে আসতে হয়। দিল্লীতে তিনি বেশিদিন অবস্থান করেননি। তাহলে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ খলজীর রাজত্বের (১২১৬–১২২০ খৃ.) প্রথমদিকে অর্থাৎ ১২১৬ খৃস্টাব্দে তিনি লখনৌতি পৌঁছেন বলা যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর 'তাবকাতে নাসিরী'তে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করার কারণে এ ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যথায় এর যথার্থ সুরাহা সম্ভব হতো।

কাজেই ফার্সী গ্রন্থগুলোর এ সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে সংস্কৃত গ্রন্থ 'শেক শুভোদয়া'র সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া ভাষাবিদরা 'শেক শুভোদয়ার' প্রামাণ্যতা সম্পর্কেও সংশয় পোষণ করেছেন। ভাষাবিদরা মনে করেন, শেক শুভোদয়া হলায়ুধ মিশ্রের নামে আরোপিত হলেও ঐ হলায়ুধ লক্ষণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ হতে পারেন না। তাই গ্রন্থটিতে যে ত্রুটিপূর্ণ ও বাংলা মিশেল সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে তাঁরা মনে করেন যে, বইটি জাল এবং ত্রয়োদশ শতকের পরিবর্তে ষোড়শ শতকে পাণ্ডুয়ার বাইশ হাজারী তরফের জমিজমার মালিকানা স্থির করার জন্য বইখানা লিখিত হয়েছিল।[২০] তবুও প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে বইটি গুরুত্ববহ এবং সেই হিসেবে এর অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য আমরা গ্রহণ করতে পারি, যা অন্য কোনো প্রামাণ্য তথ্যের বিপরীত হবে না। অন্যদিকে ফার্সী গ্রন্থগুলোর মধ্যে মোটামুটি 'তারিখ'-এর ব্যাপারে একটা ঐক্য দেখা যাচ্ছে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হলেও কোনো বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের সবার ঐকমত্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই এ আলোচনা থেকে মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বা বড় জোর ১২১৬ খৃস্টাব্দের পর বাংলাদেশে আসেন।

শুভোদয়া গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর সম্পর্কিত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা থেকে এ কথা সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, তৎকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর তিনি বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'শেক শুভোদয়া'র বর্ণনা মতে, তাঁর

অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা লক্ষণ সেন তাঁকে পাণ্ডুয়ার একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ মসজিদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ (আবাসিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র) পরিচালনার জন্য তাঁকে কয়েকটি গ্রাম দান করেন। 'শেক শুভোদয়ার' এ বর্ণনার পেছনে ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকলেও এ থেকে পাণ্ডুয়ায় শায়খ জালালুদ্দীনের কার্যধারা সম্পর্কে জানা যায়। মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে, শায়খ জালালুদ্দীনের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহণ। 'তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ' গ্রন্থেও প্রায় একই ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তাজকিরায় বলা হয়েছে, জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলায় পৌঁছার পর অল্প দিনের মধ্যে সর্ব-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর জন্য একটি খানকাহ নির্মীত হয়। তিনি বহু জমি ক্রয় করে সেগুলোকে বাগানে রূপান্তর করেন। অতঃপর মুসাফির ও সেখানে অবস্থানরত লোকদের ভরণ-পোষণের জন্য সেগুলো 'ওয়াকফ' করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কতিপয় প্রাচীন মন্দির ছিল। মন্দিরের উপাসনাকারীদেরকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[২১] 'মেমরিস অব গৌড় এন্ড পাণ্ডুয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দরবেশ পাণ্ডুয়ায় এবং বাংলার আরো বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সম্পত্তি লাভ করেন। যেমন দেওতলা ও বাইশ হাজারী নামে পরিচিত স্টেটটি এখনও 'ফকির' ও দরিদ্রদের প্রতিপালনের জন্য একজন মুতাওয়াল্লীর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। শায়খ জালালুদ্দীন বাংলায় আগমন করে মূর্তি ভাঙ্গা শুরু করেন এবং সম্ভবত তাঁর নির্মীত বিভিন্ন চিল্লাখানা প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলোর যথার্থ স্থান নির্দেশ করে।[২২]

এ সমস্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলার রাজধানীতে বসে একদিকে বাংলার শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং অন্যদিকে সাধারণ সমাজের বৌদ্ধ, হিন্দু নির্বিশেষে সকল মানুষকে ইসলামের সত্যবাণীর প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকেন। বাংলার সাধারণ মানুষ ও দরিদ্র শ্রেণীর জন্য তিনি সেবামূলক কার্যসূচিও গ্রহণ করেন। ব্লকম্যান তাঁর 'কনট্রিবিউশান টু দি জিওগ্রাফি এন্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ভিক্ষুক ও মুসাফিরদের জন্য একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এভাবে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে তিনি প্রায় ২৩ বছরকাল একাধারে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাংলার হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁর ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ফলে লখনৌতি তথা বাংলার সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মুসলিম সমাজের আকৃতি স্ফীত হতে থাকে এবং সমসাময়িক কালে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তা সহায়ক শক্তির কাজ করে। পাণ্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত

তাঁর 'খানকাহ' নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী করে। তার এ খানকাহ ছিল তৎকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মৃত্যু-সন ও মাযার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ৭৩৮ হিজরী অর্থাৎ ১৩৩৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। ব্লকম্যান কোনো প্রকার সূত্র উল্লেখ না করেই ১২৪৪ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যু-সন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খান সাহেব আবেদ আলী রচিত 'মেমরিস অব গৌড় এন্ড পাণ্ডুয়া' গ্রন্থের টীকাকার এইচ. ই. স্টেপেলটন ১৩৪৬ বা ১৩৪৭ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যু-সন বলে অনুমান করেন। শায়খ আবদুল হক দেহবলী, আবুল ফজল, ফেরেশতা তার মৃত্যু-সন সম্পর্কে নীরব। তাজকিরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন ৬২২ হিজরীতে (১২২৫ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ৬২০ হিজরীতে (১২২৩ খৃ.) বাংলা ত্যাগ করেন। এ সব তারিখের মধ্য থেকে কোন্‌টিকে সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে?

'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা' গ্রন্থে ৭৩৮ হিজরী হিসেবে যে তারিখটি উল্লিখিত হয়েছে তা শায়খ জালালুদ্দীনের সমাধিতে প্রাপ্ত ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ একখানা শিলালিপির অক্ষর-সমষ্টির আবজেদ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সাংখ্যিক মান থেকেই গৃহীত হয়েছে। এ শিলালিপিতে সময় নির্দেশক যে ফার্সী বাক্যটি উৎকীর্ণ ছিল তা হচ্ছে : "জালালুদ্দীন জালালুল্লাহ্ জালালে আরেফাঁ বুদ।" কিন্তু 'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা'র লেখক নিজে এ শিলালিপিটি দেখেননি। এ শিলালিপিটি তৎকালে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই তিনি লোকমুখে শিলালিপিটির কথা শুনেছিলেন এবং জনসাধারণের স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা করে তাতে উৎকীর্ণ বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন। এদিক থেকে এ তারিখটির দুর্বলতা সুস্পষ্ট। এ দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করেই আমরা বলতে চাই যে, শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (১১৬৯–১২৬৬ খৃ.) ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (১১৪২–১২৩৬ খৃ.) সমসাময়িক এক ব্যক্তির ১৩৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কাজেই ১৩৩৭ খৃস্টাব্দকে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মৃত্যু-সন হিসেবে গ্রহণ করাকে আমরা মোটেই সঙ্গত মনে করি না। 'পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো'র লেখক চৌধুরী শামসুর রহমান ৭৩৮ হিজরী সনকে (সম্ভবত) ভুলক্রমে ১২৩৭ খৃস্টাব্দ গণ্য করে ১০০ বছর পিছিয়ে এসেছেন এবং ১২৩৭ খৃস্টাব্দকে স্বাভাবিক মনে করে এটিকেই শায়খ জালালুদ্দীনের মৃত্যু-সন গণ্য করেছেন।[২৩] তাজকিরায় (১২২৫ খৃ.) তারিখটি 'শেক শুভোদয়া'য় উল্লিখিত শায়খ

জালালুদ্দীনের বাংলা ত্যাগের কাছাকাছি বলে এ তারিখটিকেই আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারি। কাজেই আমাদের মতে ১২২৫ খৃস্টাব্দে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ইন্তিকাল করেন।

মওলানা আবদুল হক দেহলবী 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর সমাধি বাংলায় অবস্থিত। কিন্তু তিনি কোনো স্থান নির্দেশ করেননি। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাঙ্গালার বন্দর দেওমহলে শায়খ জালালুদ্দীনের কবর অবস্থিত। সিয়ারুল মুতাআখখিরীনে বলা হয়েছে ঃ দেওমহল বন্দরে তাঁর সমাধি অবস্থিত।[২৪] শায়খ জালালুদ্দীনের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ (১৩৪১-৪২ খৃ.) তাঁর মাযার নির্মাণ করেন। রিয়াজে এ সম্পর্কিত যে ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দীন আলী মুবারক শাহ স্বপ্নযোগে পাণ্ডুয়ার একটি নির্দিষ্ট স্থানে (দেওতলা) শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মাযার নির্মাণে আদিষ্ট হন।[২৫] সীয়ার ও আইনে আসলে এ দেওতলাকেই দেওমহল বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিম্নানী কর্তৃক জৌনপুরের শর্কী সুলতান ইবরাহীম শর্কীর কাছে লিখিত একখানি পত্রে তিনি জালালীয়া তরীকার সূফীরা দেওতলায় সমাহিত আছেন বলে উল্লেখ করেন। জালালী সূফী দ্বারা তিনি জালালুদ্দীন তাবরিজী ও তাঁর শাগরিদদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী এ পাণ্ডুয়া থেকে পনের মাইল উত্তরে দেওতলাতেই তাঁর খানকাহ স্থাপন করেছিলেন। ৮৬৮ হিজরীতে (১৪৬৪ খৃ.) উৎকীর্ণ একটি মসজিদের শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে 'কসবা তাবরিজাবাদ' নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। বাংলা ও উড়িষ্যার স্বাধীন সুলতান সুলায়মান কররানীর (১৫৬৫-১৫৭২ খৃ.) আমলে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে সুস্পষ্টভাবে তাবরিজাবাদ ওরফে দেওতলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী এ স্থানকেই নিজের কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলার ইতিহাসে এতবড় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বাংলার সমগ্র এলাকায় তাঁর নাম ও কার্য-প্রভাব এত বেশি বিস্তৃত হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যুর ১২০ বছর পরে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলা সফরে এসে সিলেটের হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জালালুদ্দীন তাবরিজী রূপে উল্লেখ করে গেছেন। ইবনে বতুতার এ বর্ণনার কারণে কেউ কেউ পাণ্ডুয়ার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও সিলেটের শায়খ শাহ জালাল মোজাররাদকে অভিন্ন মনে করেছেন। অথচ উভয়ের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কয়েক'শ মাইলের ব্যবধান

রয়েছে। ইবনে বতুতা ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। তখন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮–১৩৫০ খৃ.) ছিলেন বাংলার সুলতান। ইবনে বতুতা কামারু পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সেখানে নদী পথে সোনারগাঁও আসেন। সোনারগাঁও দিয়ে আরাকানের পথে জাভা-সুমাত্রা হয়ে তিনি চীনে গমন করেন এবং সেখানে শেখ বুরহানুদ্দীনের কাছ থেকে শাহজালালের মৃত্যু সংবাদ পান।

ইবনে বতুতা কামারু বলতে আসলে কামরূপকে বুঝিয়েছেন। তৎকালে পূর্বদিকে বঙ্গের সীমানার পর থেকে কামরূপের সীমানা শুরু হতো। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত সিলেট জেলা ছিল তার অন্তর্গত। অর্থাৎ ইবনে বতুতা সিলেটের শাহজালাল মুজাররাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে বতুতার বাংলা সফরের ১২০ বছর পূর্বে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মৃত্যু হয়েছিল। একমাত্র ইবনে বতুতাই সিলেটের শাহজালাল মুজাররাদকে জালালুদ্দীন তাবরিজী বলে অভিহিত করেছেন। সিলেটের শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানী ছিলেন, না তুর্কীস্তানজাত বাঙালী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু ইবনে বতুতা ছাড়া আর কেউ তাঁকে তাবরিজী বলেননি। উপরন্তু ইবনে বতুতা কোথাও তাঁকে বলেছেন তাবরিজী আবার কোথাও বলেছেন শিরাজী। এ থেকে কমপক্ষে নামের ব্যাপারে ইবনে বতুতার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়।

আসলে ইবনে বতুতা ২৫ বছর ধরে বিশ্ব ভ্রমণ করেন। এ ২৫ বছরে তিনি মরক্কো থেকে নিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশ সফর করেন। পথে একাধিকবার তিনি দস্যুর কবলে পড়েন। ফলে অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে তাঁর সফর সম্পর্কিত ডায়েরীগুলোও লুণ্ঠিত হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ৭৫৬ হিজরীতে নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী বছর মরক্কোর সুলতানের সেক্রেটারী ইবনে জওযী তার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেন। বর্তমান জগতে ইবনে বতুতার সফরনামার যতগুলো সংস্করণ দেখা যায় তা এ ইবনে জওযীর সংক্ষিপ্ত সারের বিভিন্ন অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই নামের ক্ষেত্রে স্মৃতি বিভ্রম বশত ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে শাহজালাল মুজাররাদের জালালুদ্দীন তাবরিজীতে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে শাহজালাল মুজাররাদকে জালালুদ্দীন তাবরিজী মনে করে তাঁর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এ দেশের অধিকাংশ লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে।[২৬] পূর্ববঙ্গ ও আসাম এলাকায় শাহজালাল মুজাররাদ সম্পর্কে এ কথা যতটুকু সত্য, উত্তর বঙ্গে জালালুদ্দীন তাবরিজী সম্পর্কেও

সেই কথা সমানভাবে সত্য। এমন কি উত্তর বঙ্গের সীমা অতিক্রম করে সারা বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য ও অতুলনীয় বলে স্বীকার করতে হবে। বস্তুত তিনি যে বাংলার প্রথম যুগের ইসলামী চিন্তা, বিশ্বাস ও সমাজ কাঠামোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাতা এবং বাংলার ইসলাম প্রচারকদের আদর্শ ও পথিকৃৎ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহ্ বুতশিকন

যতদূর জানা যায়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহ ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি কোথা থেকে আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো বিবরণ জানা যায় না। তবে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে অনুমিত হয় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই তিনি ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেছিলেন।

কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তিনি ঢাকা নগরী সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হলে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে থাকে। একদিন তিনি ইবাদতে মশগুল ছিলেন এমন সময় হিন্দুরা দেবমূর্তি নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশের আস্তানার কাছে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে দরবেশের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপরই মূর্তিগুলো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্যে হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তাঁর আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে বলে শোনা যায়।

বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগে শাহ নি'য়ামতুল্লাহ্র মাযার অবস্থিত। মাযারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান।

শাহ্ নি'য়ামাতুল্লাহ্ নামের সঙ্গে 'বুতশিকন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মনে হয় তাঁর অঙ্গুলি হেলনে হিন্দু দেবমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী

পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের আঠারজন দরবেশের কাহিনী অতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ছিলেন তাদের অন্যতম।

তাঁর সাথে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারার্থে আগত আরো সতেরো জন দরবেশের মধ্যে নিম্নোক্ত সাতজনের নাম পাওয়া যায় ঃ (১) সাইয়েদ শাহ তাজুদ্দীন, (২) খাজা দীন চিশ্‌তী, (৩) শাহ হাজী আলী, (৪) শাহ সিরাজুদ্দীন, (৫) শাহ ফিরোজ, (৬) পীর পাঞ্জাতন ও (৭) পীর ঘোড়া শহীদ। মঙ্গলকোটের বিভিন্ন স্থানে এ আঠারো জন দরবেশের সমাধি বিদ্যমান।

মঙ্গলকোট বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। এ এলাকার প্রায় শতকরা নব্বইজন অধিবাসীই মুসলমান। অথচ সমগ্র বর্ধমান জেলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। মঙ্গলকোটের এ মুসলিম সংখ্যাধিক্য উল্লিখিত আঠারোজন দরবেশের ইসলাম প্রচারের ফল বলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস।

আঠারো দরবেশের অন্যতম শাহ মাহমুদ গজনবী ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তুর্কী বিজয়ের প্রারম্ভে এ এলাকায় আগমন করেন বলে মনে করা হয়। এ সম্পর্কিত কোনো ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণের অভাবে কেবলমাত্র প্রচলিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির ওপর নির্ভর করে আমরা নিম্নোক্ত বর্ণনা পেশ করছি।

বহুকাল পূর্বে মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী নামে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল উজানী নগর। তিনি শিব পূজা করতেন।[২৭] তিনি সন্ন্যাসীদেরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাদেরকে অকৃপণ হস্তে দান করতেন। কিন্তু 'যবন'দেরকে (মুসলমান) অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এমন কি যবন শব্দটি কানে পড়লে তিনি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনদিন উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন করতেন এবং যবনের মুখ দর্শনরূপ পাপে নিমজ্জিত হলে সাতদিন উপবাস থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেন। এ সময় একদিন মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে রাহী পীর দিল্লী থেকে উজানী নগরে আগমন করেন। তখন আসরের সময় ছিল। তিনি নামাযের জন্য আযান দিলেন। নগরের চতুর্দিকে তাঁর আযান ধ্বনি গুঞ্জরিত হলো। এ আযানের আওয়াজ রাজা বিক্রমকেশরীর কানেও পৌঁছল। তিনি বুঝতে পারলেন কোনো 'যবন' তার 'পবিত্র' নগরে প্রবেশ করে তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। রাজা নগরবাসীদেরকে তিন রাত উপবাস থাকার নির্দেশ দিলেন এবং দরবেশকে গ্রেফতার করে আনার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু রাজার লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলো। তখন বাধ্য হয়ে তিনি সেনাবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু তারাও সফলকাম হলো না। রাজা চিন্তিত হলেন। পারিষদগণের পরামর্শক্রমে তিনি দরবেশের কাছে শহর ত্যাগ করে কানুর নদীর অপর তীরে আবাস স্থাপন করার প্রস্তাব পাঠালেন। দরবেশ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নদীর অপর তীরে আবাস গড়ে তুললেন। যবনের মুখ দর্শন-জনিত পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রাজা নদীর এপারে দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করলেন।

এভাবে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলো। এ সময় একদিন দিল্লীর মুসলিম সুলতানের দরবার থেকে রাজা বিক্রমকেশরীর কাছে একটি পত্র এলো। পত্রটি ছিল ফার্সী ভাষায় লিখিত। রাজা ও তাঁর সভাসদগণ এর মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম না হয়ে অবশেষে দরবেশের শরণাপন্ন হলেন। দরবেশ পত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু পত্রের জবাব লেখা নিয়ে আবার সমস্যা দেখা দিল। কাজেই দরবেশই পত্রের জবাব লিখতে অনুরুদ্ধ হলেন। এবার দরবেশ বুদ্ধি করে পত্রের মাধ্যমে উজানীর সমস্ত ঘটনা দিল্লীর সুলতানের গোচরীভূত করলেন। রাজা বিক্রমকেশরীর মোহরাঙ্কিত এ পত্র দিল্লীতে পৌঁছার অব্যবহিত পরেই বিখ্যাত দরবেশযোদ্ধা পীর ঘোড়া শহীদের নেতৃত্বে এক বিরাট মুজাহিদ বাহিনী মঙ্গলকোটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। ঘোড়া শহীদ ছাড়া আরো ষোলজন দরবেশ-যোদ্ধাও এ সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সেনাবাহিনী মঙ্গলকোটে পৌঁছার পর মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে রাহী পীরও তাদের সাথে যোগ দিলেন।

রাজা বিক্রমকেশরীর সেনাবাহিনীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চললো দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে রাজা বিক্রমকেশরী পরাজিত হলেন। মুসলিম সেনাপতির ঘোড়া এ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তিনি 'ঘোড়া শহীদ' আখ্যা পেলেন। রাজা বিক্রমকেশরী পূর্বদিকে পলায়ন করলেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে শোনা যায়। কথিত আছে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তাঁর রাজধানী ছিল এবং তাঁর নামেই পরবর্তীকালে এ বিক্রমপুর নামকরণ হয়।

মুসলিম সেনাবাহিনী বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করার পর অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। দরবেশগণের প্রচেষ্টায় মঙ্গলকোট এলাকায় ইসলাম প্রচারের ব্যাপক অভিযান চলতে থাকে। দরবেশগণ তাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর শহরের বিভিন্ন স্থানে সমাধিস্থ হন। স্থানীয় জনসাধারণ আজও তাঁদের কবরগুলোর স্মৃতি রক্ষা করে আসছে।

মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক মঙ্গলকোট বিজয়ের এ ঘটনা নিছক কিংবদন্তি পর্যায়ের হলেও মঙ্গলকোট এলাকায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত অন্য কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপস্থিতিতে জনগণ কর্তৃক সংরক্ষিত এ কিংবদন্তি অবশ্যই গুরুত্বের দাবিদার। এ ঘটনার সঠিক সময় নির্দেশক কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবীর পীর হিসেবে স্থানীয় (মঙ্গলকোট) জনসাধারণ হযরত যাকারিয়া শাহের নামোল্লেখ করে থাকে। এ যাকারিয়া শাহ সম্ভবত সম্রাট ইলতুতমিসের আমলের বিখ্যাত সূফী-দরবেশ শাহ যাকারিয়া মুলতানী (১১৬৯–১২৬৬ খৃ.) হবেন। আমাদের এ অনুমান সত্য হলে বলা

যেতে পারে যে, বাংলায় বখতিয়ার খলজীর অভিযানের পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধেই মঙ্গলকোট বিজয়ের এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

শাহ মখদুম রূপোশ

রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মখদুম রূপোশের দান অতুলনীয়। এ অঞ্চলে আগমনকারী ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়। রাজশাহীর দরগাহ পাড়া নামক স্থানে সরকারী কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁর মাযার অবস্থিত। মাযারগাত্রে খোদিত নামফলকে তাঁকে 'সাইয়েদে সনদ শাহ দরবেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮] আসলে এগুলোর কোনটিই তাঁর নাম নয়, উপাধি বিশেষ। মোগল বাদশাহ হুমায়ূনের আমলে (১৫৩০–১৫৫৬ খৃ.) মাজার সন্নিহিত এলাকাকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসেবে দান করা হয়। তারও অনেক পরে ইরানের শাহ আব্বাস সফবীর (১৫৮৭–১৬২৯ খৃ.) শাগরিদ আলী কুলী বেগ ১০৪৫ হিজরীতে (১৬৩৪ খৃ.) এ মাযারটি নির্মাণ করেন। ১৯০৪ সালে মাযারের তদানীন্তন খাদেম জনাব গোলাম আকবর রাজশাহী জেলা কোর্টে দরগাহ সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কিত যে বিবৃতি দেন তা থেকে হযরত শাহ মখদুমের বাংলায় আগমন কাল চিহ্নিত করা যেতে পারে। ডঃ এনামুল হক তাঁর 'সূফীইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় এ বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেছেন। বিবৃতিটি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

"মখদুম সাহেবের নাম হযরত শাহ রূপোশ। তাঁর অন্য নাম কি ছিল তা আমি জানি না। .... তাঁর ইন্তিকালের তারিখও আমার স্মরণ নেই। মাযার সন্নিহিত সম্পত্তিটি ১০৪৪ হিজরীর পূর্বে প্রদত্ত হয়নি। আর আমি যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছি তাতে আমি এ উল্লেখ করেছি যে, হযরত রূপোশ ঐ সময়ের ৪৫০ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন।"

অবশ্যই রূপোশও কোন নাম বা নামের অংশ হতে পারে না। এটিও উপাধি বিশেষ। রূপোশ ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ। অর্থাৎ যিনি কোনো নেকাব বা কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখেন। কাজেই এ সাক্ষ্য থেকেও হযরত শাহ মখদুম রূপোশের আসল নাম জানা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিতর্ক এসে যাচ্ছে। তাই সেটার সুরাহা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ খাদেম সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃ.) পূর্বে সম্পত্তিটি প্রদত্ত হয়নি। অথচ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, বাদশাহ হুমায়ূনের আমলে (১৫৩০–১৫৫৬ খৃ.) সম্পত্তিটি প্রদত্ত হয়।[২৯] তাহলে ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে বাদশাহ হুমায়ূনের উপস্থিতি কেমন করে সম্ভব ? এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, হুমায়ূনের আমলে সম্পত্তিটি দান

করা হয় ঠিকই, তবে যথাযথভাবে তা কাগজে-কলমে কার্যকর রূপ নেয় ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে। এখানে খাদেম সাহেবের কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃ.) ৪৫০ বছর পূর্বে শাহ্ মখদুম রূপোশ জীবিত ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় যে, হযরত শাহ মখদুম রূপোশ ১১৮৪ খৃস্টাব্দে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যে সব ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এ দেশে ইসলামের ভিত গড়ে তুলেছিলেন শাহ্ মখদুম রূপোশকে তাঁদের অন্যতম বলা যেতে পারে। সম্ভবত এ জন্যই তাঁকে রাজশাহী অঞ্চলের সূফী ও ইসলাম প্রচারকদের প্রধান বা ওস্তাদ বলা হয়।

আধুনিক রাজশাহী শহরটি মূলত রামপুর ও বোয়ালিয়া দু'টি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পদ্মার উত্তর পাড়ে অবস্থিত এ রামপুর গ্রামে ছিল কিছু সংখ্যক জেলের বাস। একদিন কয়েকজন জেলে নদীতে মাছ ধরছিল, এমন সময় তারা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারা দেখলো, লম্বা আলখেল্লা পরা এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন। তাঁর মাথায় পাগড়ি, পায়ে খড়ম ও হাতে একটি লাঠি। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আসছেন। এ দৃশ্য দেখে জেলেরা তাদের সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছে গেলো। ততক্ষণে তিনি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। জেলেরা তাঁর কাছে আশীর্বাদ-প্রার্থী হলো। তিনি জেলেদের কাছে কিছু আহার চাইলেন। তারা তাড়াতাড়ি নিজেদের সাধ্যমতো মাটির পাত্রে করে কিছু খাদ্য আনলো। তিনি খাদ্যের পাত্রগুলো নিজের পাগড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর হাত তুলে দোয়া করলেন এবং কিছুক্ষণ পর পাগড়িটি সরিয়ে নিলেন। দেখা গেলো খাদ্যগুলো মাছে ও পাত্রগুলো সোনায় পরিণত হয়ে গেছে।

দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে জেলেরা মুগ্ধ হলো এবং ধীরে ধীরে তারা তাঁর ভক্ত-শ্রেণীতে পরিণত হলো। অতঃপর এখান থেকে আরো উত্তরে এগিয়ে গিয়ে তিনি নিজের আস্তানা গাড়লেন। এ স্থানটিই বর্তমানে দরগাহ্ পাড়া নামে পরিচিত। এখানে জেলেদের মধ্যে বসে তিনি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন।

হযরত শাহ মখদুম রূপোশ সম্পর্কিত এ কিংবদন্তিটি রাজশাহী অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। এ কিংবদন্তি থেকে আমরা যে আসল বিষয়টি জানতে পারি তা হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্বে এ অঞ্চলে আর কোনো ইসলাম প্রচারক আসেননি। তিনি নিজের চরিত্র মাধুর্য, ব্যবহার ও আত্মিক শক্তি বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সাফল্য লাভ করেন। শোনা যায়, তাঁর আত্মিক ক্ষমতার কথা শুনে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে এসেছে এবং যে ব্যক্তি কিছুদিন তাঁর সাহচর্যে থেকেছে সে-ই ইসলামের

আলোকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে ধন্য হয়েছে। নতুন মুসলমানরা তাঁকে এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজেদের পুরাতন আবাসে ফিরে যাবার চেয়ে তাঁর আস্তানার আশেপাশে নিজেদের আবাস গড়ে তুলতে থাকে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণের পর অমুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে অমুসলিম সমাজের বিরোধিতা এড়াবার জন্য তারা একস্থানে নিজেদের শক্তি জোট গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। এভাবে রামপুর গ্রামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী বোয়ালিয়া গ্রামেও নতুন মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে এ এলাকাটিই রাজশাহী নাম ধারণ করে। হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ এখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। প্রতি বছর ২৭ রজব তাঁর মাযারে উরস অনুষ্ঠিত হয়।

বায়েজিদ বিস্তামী ও ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ

বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলেই যে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন হয় বর্তমানে এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের প্রথম যুগেই আরব বণিকদের সাহায্যে এ এলাকার অধিবাসীরা প্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসে। এমন কি খৃস্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে চট্টগ্রাম বন্দরে মুসলিম আরবদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। আরব ব্যবসায়ী, ইসলাম প্রচারক ও ওলী-দরবেশদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও চরিত্র মাধুর্যে এ অঞ্চলের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বহু সংখ্যক সূফী ও ওলী-দরবেশের আগমনের কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামকে 'বার আউলিয়ার দেশ' বলা হয়।

প্রাচীন সূফী-দরবেশদের মধ্যে খৃস্টীয় নবম শতকে পারস্যের হযরত বায়েজিদ বিস্তামীর (মৃত্যু ঃ ৮৭৪ খৃ.) চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমনের কথা শোনা যায়। চট্টগ্রাম শহরের পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় তাঁর স্মারক সমাধিও দেখা যায়। জনশ্রুতিতে জানা যায়, তৎকালে এ অঞ্চল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এ জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার ও জিনদের বসবাস ছিল। হযরত বায়েজিদ বিস্তামী এ অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে।

অবশ্য এ জনশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করার মতো এখনও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, হযরত বায়েজিদ বিস্তামী এখানে ইন্তিকাল করেননি। পারস্যের বিস্তাম নগরে ৮৭৪ খৃস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকাল হয়। ডঃ এনামুল হক তাঁর 'সূফীইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে[৩০] চট্টগ্রামের এ বায়েজিদ বিস্তামীকে বগুড়ার শাহ্ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার বলে অনুমান

করেছেন। এ জন্য প্রমাণ স্বরূপ তিনি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার'র দু'টি চরণ উদ্ধৃত করেছেন। চরণ দু'টি হচ্ছে ঃ

"নাসিরাবাদেতে মানি সাহারে সুলতান।
দেশে বৈদেশ হইতে আইসে মোমিন মুসলমান ॥"

'শাহ সুলতান'-কে ডঃ এনামুল হক শাহ সুলতান বলখী বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এ অনুমানও যথার্থ মনে হয় না। কারণ 'শাহ' উপাধিটি সূফী ও দরবেশদের নামের সাথে প্রায় সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর সুলতান শব্দটি সম্পর্কেও বলা যায়, হযরত বায়োজিদ বিস্তামীর উপাধি সহকারে পূর্ণনাম ছিল– সুলতানুল আরিফীন বুরহানুল মুহাক্কিকীন খলীফা-ই-ইলাহী আল্লামা হযরত বায়োজিদ বিস্তামী। কাজেই বায়োজিদ বিস্তামীর নামের স্থলে লোকগীতিকায় নামের উপাধির অংশ বিশেষ হিসেবে শাহ সুলতান ব্যবহৃত হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়।

অন্যদিকে শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জের চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারেও কিংবদন্তির আশ্রয় নিতে হয়। চট্টগ্রাম শহর থেকে এক মাইল উত্তরে সুলুক বাহারের পার্বত্য টিলায় 'শায়খ ফরীদের চশমা' নামে একটি ঝরনা দেখা যায়। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী শায়খ ফরিদুদ্দীনের সাথে এ ঝরনাটি সম্পর্কিত। সাধারণ মানুষেরা এ শায়খ ফরিদুদ্দীন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তবে শিক্ষিত সমাজ তাঁকে পারস্যের শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (মৃত্যু ঃ ১২৩০ খৃ.) বলে দাবি করেন। কিন্তু এ দাবির পেছনে কোনো যৌক্তিকতা ও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ নেই। বরং স্থানীয়ভাবে যে লোকগীতির প্রচলন আছে তা থেকে তাঁকে পাঞ্জাবের শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ বলে মনে করা যেতে পারে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পূর্ববঙ্গ গীতিকার নূরুন্নাহার ও কবীরের কথায় যে লোকগাঁথা উদ্ধৃত করেছেন তার এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

"তারপর মানি আমি ফকির সেক ফরীদ।
নেজাম ঔলিয়া মানম তান সাহারিদ ॥"

এখানে শায়খ ফরিদুদ্দীনকে দেখা যাচ্ছে দিল্লীর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬–১৩২৫ খৃ.) ওস্তাদ বা মুরশিদ রূপে। এ সেক ফরীদ ছিলেন ইতিহাস খ্যাত হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (১১৪২–১২৩৬ খৃ.) শাগরিদ এবং হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মুরশিদ শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ। তিনি ১১৭৭ থেকে ১২৬৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পাঞ্জাবের পাকপতন শহরে তাঁর সমাধি দেখা যায়।

কাজেই এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ চট্টগ্রাম এসেছিলেন এবং এখানে কিছুদিন অবস্থান করে

ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার কিছু এলাকার জনশ্রুতি থেকেও জানা যায় যে, শায়খ ফরীদের নামানুসারেই ফরিদপুর জেলা ও শহরের নামকরণ হয়েছে। তিনি এক সময় এ জেলা পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন।

এ সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ এক সময় পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন এবং ফরিদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস–প্রাচীন যুগ, ৫২ পৃষ্ঠা।
২. ইবনে বতুতা–আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় সংস্করণ, ১৯১৩ খৃ., দিল্লী থেকে প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা।
৩. ডঃ আবদুল করীম–চট্টগ্রামে ইসলাম, ৪–১৫ পৃষ্ঠা।
৪. ডঃ এ. রহীম–Social and Cultural History of Bengal.
৫. চট্টগ্রামে ইসলাম–ডঃ আবদুল করীম, ১৫–১৬ পৃষ্ঠা।
৬. ইবনে বতুতা–আজায়েবুল আসফার, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯১৩ সালে দিল্লীতে মুদ্রিত, খান বাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন এম. এ কর্তৃক মূল আরবী থেকে উর্দুতে অনূদিত, পৃষ্ঠা–৩২১।
৭. ডঃ এনামুল হক ও ডঃ আবদুল করীম–আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য, ৪ পৃষ্ঠা।
৮. ডঃ আবদুল করীম–চট্টগ্রামে ইসলাম, ১৬–২৭ পৃষ্ঠা।
৯. নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ ও মুসনাদে আহমদ, সাওবান বর্ণিত হাদীস অধ্যায়।
১০. নাসায়ী।
১১. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়–গৌড়লেখমালা, ২১–২২ পৃষ্ঠা।
১২. রমেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা ৪৩–৪৪।
১৩. ডঃ এনামুল হক–A History of Sufism in Bengal, ২০৮ পৃষ্ঠা।
১৪. ডঃ এনামুল হক–A History of Sufism in Bengal, ২১১ পৃষ্ঠা।
১৫. East Pakistan District Gazetteers. ৪৬ পৃষ্ঠা।
১৬. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ, ১১২–১১৩ পৃষ্ঠা।
১৭. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ, ৯৮ পৃষ্ঠা।
১৮. East Pakistan District Gazetteers, ৪৮ পৃষ্ঠা।
১৯. ডঃ এনামুল হক–A History of Sufism in Bengal, ১৬০–১৬১ পৃষ্ঠা।
২০. Dr. Ramesh Chandra Majumder, History of Bengal, Vol-1, P– 225.
২১. তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ–১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।
২২. Memoires of Gaur & Pandua, ৯৯ পৃষ্ঠা।
২৩. চৌধুরী শামসুর রহমান–পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, ৪৩–৪৪ পৃষ্ঠা।
২৪. মুন্সী গোলাম হোসাইন খান–সিয়ারুল মুতাআখখিরীন, ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা।
২৫. গোলাম হোসাইন সলীম–রিয়াযুস সালাতীন, বাংলা অনুবাদ, ৭৫–৭৬ পৃষ্ঠা।

২৬. ইবনে বতুতা—আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ১৯১৩ খৃস্টাব্দে দিল্লী থেকে প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।
২৭. "উজানী নগর অতি মনোহর বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা উজানীর রাজা কৃপাময়ী দশভূজা ॥"
[কবি কঙ্কন চণ্ডী (১৫৮৪ খৃস্টাব্দে লিখিত), ১১৪—১১৫ পৃষ্ঠা।]
২৮. ইনসক্রিপশানস্ অব বেঙ্গল, চতুর্থ খণ্ড, শামসুদ্দীন আহমদ এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত, ২৭১—২৭৬ পৃষ্ঠা।
২৯. মাযার সম্পত্তির প্রশাসক রাজশাহীর জেলা জজের অফিসে রক্ষিত এ মামলার আপীল সংক্রান্ত কাগজপত্রের ৫৫০ নম্বর মূল ডিক্রীতে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।
৩০. ডঃ এনামুল হক—এ হিস্ট্রি অফ সূফীইজম ইন বেঙ্গল, ২৩৮—২৩৯ পৃষ্ঠা।

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে শুরু হয় এবং চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সূফী ও দরবেশগণকে যেমন বহুতর বাধার মোকাবিলা করতে হয়, অত্যাচার, জুলুম ও নিপীড়নের মুখে পাহাড় প্রমাণ অবিচলতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, স্থানীয় রাজশক্তির কোপানলে পড়ে কোথাও প্রকাশ্য জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদত বরণ করতে হয়, ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়েও ঠিক তেমনি এ ধারাগুলোর সবই অপরিবর্তিত থাকে। তবে সকল প্রকার বিরোধিতার তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। এ সঙ্গে আর একটি আনুকূল্যও এ প্রচারকগণ লাভ করেন। তা হচ্ছে মুসলিম রাজশক্তির সহায়তা। সর্বক্ষেত্রে এ সহায়তা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য না হলেও একটা অঘোষিত সহায়তা অবশ্যই তাঁরা লাভ করেছেন। ইসলাম প্রচারে মুসলিম রাজশক্তির ভূমিকা বর্ণনা অধ্যায়ে আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

শাহ তুর্কান শহীদ

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম শাহ তুর্কান শহীদের কথা উল্লেখ করা যায়। উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় তিনি নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে তিনি এ দেশে আগমন করেন। উইলিয়াম হান্টারও এ সময়ে বগুড়া জেলার জনৈক তুর্কান শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তখন উত্তরবঙ্গের সর্বত্র মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বগুড়া অঞ্চলে তখনও প্রতাপশালী হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। ইসলাম প্রচারের জন্য অমুসলিম রাজার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাঁকে শাহাদত বরণ করতে হয়। কিংবদন্তি থেকে অবশ্য সেই অমুসলিম রাজার কোনো সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে করতোয়া নদীর অদূরে শেরপুরে তাঁর দু'টি সমাধি দেখা যায়। কথিত আছে, হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়। তাঁর শির একস্থানে গিয়ে পড়ে এবং দেহ অন্য স্থানে পড়ে। শির যেস্থানে দাফন করা হয় তাকে বলা হয় 'শির মোকাম' এবং দেহ বা ধড় যেস্থানে দাফন করা হয় তাকে বলা 'ধড় মোকাম'। এভাবে নিজের জীবন দান করে তিনি ইসলাম প্রচারের পথ প্রশস্ত করে গেছেন।

মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী

মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী কোন্ সময় বাংলাদেশে আসেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে শাহ শো'য়ায়েব লিখিত 'মানাকিবুল আসাফিয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ সূফী আলেম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী মওলানা তকীউদ্দীন আরাবীর কাছে মাহিসুনে বিদ্যাশিক্ষা করেন। মাহিসুন বলতে বর্তমান রাজশাহী জেলার মাহিসন্তোষই বোঝায়।[১] আরো জানা যায় যে, শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী ৬৯০ হিজরী অর্থাৎ ১২৯১ খৃস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।[২] এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে মুসমান সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী বাংলাদেশে আসেন। নাম থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একজন আরবীয়। কাজেই সম্ভবত আরব দেশ থেকেই ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ দেশে এসে থাকবেন। তাঁর এ মাদ্রাসাটিকে বাংলার প্রথম ইসলামী শিক্ষায়তন বলা যায়। তিনি নিশ্চয়ই একজন প্রথিতযশা ও উচ্চ স্তরের ইসলামী শাস্ত্র পারদর্শী ছিলেন। যার ফলে শীঘ্রই তাঁর সুনাম বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা মাহিসুনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর শিক্ষায়তনে পড়ার জন্য সমবেত হতে থাকে।

তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন, কোথায় ইন্তিকাল করেছিলেন, বাংলা দেশেই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছিলেন কিনা, এ সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য জানা যায় না।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্

উত্তর বাংলার জালালুদ্দীন তাবরিজী ও পূর্ব বাংলার শাহজালালের ন্যায় মধ্য বাংলায় শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ নিজের সাধনা ও চরিত্র মাধুর্যে ইসলামের বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন। শুধু বাংলায় নয় বাংলার বাইরেও তাঁর প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তবে জালালুদ্দীন তাবরিজী ও শাহজালাল থেকে তাঁর কার্যধারা ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি হানাফী আইনবিদ ছিলেন। তাসাউফ সাধনার সাথে সাথে হাদীসেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। রসায়ন শাস্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ

তাঁর জন্ম হয় তৎকালীন জ্ঞানানুশীলনের অন্যতম কেন্দ্র বোখারা নগরে। তিনি খোরাসানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শীঘ্রই তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু স্বদেশ ভূমিতে অবস্থান না করে আনুমানিক ১২৬০ খৃস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন। ধীরে ধীরে দিল্লীবাসীরা তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে।

তাঁর বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা দেখে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২৬৫–১২৮৭ খৃ.) আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সুলতান তাঁকে সোনারগাঁওয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সুলতানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সুলতানের সাথে বিরোধ করে দিল্লীতে অবস্থান করা তিনি সঙ্গত মনে করলেন না। তাই তিনি একদিন দিল্লী ত্যাগ করে সোনারগাঁওয়ের পথে যাত্রা করেন।

বাংলাদেশে আগমনের পথে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ বিহারের মানের নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি শায়খ ইয়াহইয়া মানেরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইয়াহইয়া মানেরীর অল্প-বয়স্ক পুত্র শরফুদ্দীনের মেধা ও ব্যুৎপত্তিতে অভিভূত হয়ে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ তাকে নিজের শাগরিদদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বালক শরফুদ্দীনও ওস্তাদ শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্‌র পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে সোনারগাঁওয়ে চলে আসেন।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্‌র সোনারগাঁওয়ে আগমনের তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে। ডঃ মুহাম্মদ ইসহাকের মতে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের আমলে (১২১০–১২৩৬ খৃ.) সোনারগাঁওয়ে আগমন করেন। 'নুজহাতুল খাওয়াতীর' গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি উল্লিখিত মত গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে 'মানাকিবুল আসাফিয়া' গ্রন্থ অবলম্বনে ডঃ সগীর হাসান আল মাসুমী এ মত প্রকাশ করেছেন যে, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৬৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছয়-সাত বছর বয়সে তাঁর ওস্তাদ শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্‌র সাথে সোনারগাঁও আগমন করেন। কাজেই তাঁরা সুলতান গিয়াসুদ্দীনের আমলে ১২৭০ খৃস্টাব্দে সোনারগাঁও আগমন করেন।

তাঁদের উভয়ের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক যে 'নুজহাতুল খাওয়াতীর' গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন সেটি সাম্প্রতিক কালে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং তা সমসাময়িক গ্রন্থ 'মানাকিবুল আসাফিয়ার' বর্ণনার পরিপন্থী। অন্যদিকে ডঃ সগীর হাসানের মতও 'মানাকিবুল আসাফিয়ায়' পরিবেশিত তথ্য সমর্থিত নয়। 'মানাকিবুল আসাফিয়ায়' বর্ণিত হয়েছে যে, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে বেশ কিছুটা জ্ঞান লাভ করলে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্‌র সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর সাথে সোনারগাঁও আসেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ছয়-সাত বছর বয়সের কোনো বালকের পক্ষে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।[৩] এ জন্য অন্তত ১৫ বছর বয়ঃক্রমের প্রয়োজন।

কাজেই ১২৬৩ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হলে ১২৭৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিনি সোনারগাঁও আগমন করেছিলেন। অন্যদিকে মানাকিবুল আসাফিয়ার বর্ণনামতে জানা যায় যে, শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্র সোনারগাঁও আগমনকালে সোনারগাঁও দিল্লীর সুলতানের অধীনে ছিল। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি যে, সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বের প্রথমদিক পর্যন্ত সোনারগাঁও মুসলমানের অধিকারে আসেনি। ১২৭১ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন মুগীসুদ্দীন তুগরলকে বাংলার গভর্নর করে পাঠান। ১২৭৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে মুগীসুদ্দীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকার জয় করে সোনারগাঁও পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় 'তারীখ-ই-মুবারক শাহী'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, তুগরল সোনারগাঁও-এর কাছে একটি বিরাট দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এ দুর্গটি 'কিলা-ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। দুর্গটি সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিলা (লোরকিল) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। কাজেই এ সময় সোনারগাঁও বা তার অংশবিশেষ দিল্লীর অধীন ছিল বলা যায়। আবার জিয়াউদ্দীন বরনী লিখিত 'তারিখে ফিরোজ শাহীর' বর্ণনা মতে দেখা যায়, ১২৮২ খৃস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন তাঁর বিদ্রোহী গভর্নর মুগীসুদ্দীন তুগরলকে শাস্তি দেবার জন্য যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন জাজনগরের পথে পলায়নপর তুগরলকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তাঁকে সোনারগাঁওয়ের রাজা রায়দনুজের সাথে চুক্তি করতে হয়েছিল।[৪] 'রিয়াযুস সালাতীন' গ্রন্থে এ রায়দনুজকে বলা হয়েছে সোনারগাঁওয়ের জমিদার ভুজ রায়।[৫] সম্ভবত সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন ও মুগীসুদ্দীন তুগরলের মধ্যে বিবাদের সুযোগে সোনারগাঁওয়ের জমিদার রায়দনুজ বা ভুজ রায় নিজেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। এ অবস্থা ১২৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। সুলতান বলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন কাইকাউস সর্ব প্রথম ১২৯১ খৃস্টাব্দে পূর্ব বাংলার রাজস্ব দ্বারা স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১–১৩২২ খৃ.) সোনারগাঁওয়ের টাকশালে নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ১২৭২ খৃস্টাব্দের পর কোন্ সময় থেকে ১২৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁও মুসলমানদের তথা দিল্লীর অধীনে ছিল এবং পুনর্বার ১২৯১ খৃস্টাব্দের পর থেকে এ অধিকার শুরু হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। কাজেই শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর বালক বা কিশোর বয়সে সোনারগাঁওয়ে আগমন করতে হলে ১২৭৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে আসা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্ ১২৭৮ খৃস্টাব্দে সোনারগাঁও আগমন করেন।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্ সোনারগাঁও আগমন করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও সাধারণভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের কজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য তিনি সোনারগাঁওয়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে এতবড় মাদ্রাসা বাংলার কোথাও স্থাপিত হয়নি। বাংলা ও বাংলার বাহির থেকে বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও সাধক সোনারগাঁওয়ে আসতে থাকে। অচিরেই সোনারগাঁও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এ সময় বহু স্থান থেকে বহু খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদও সোনারগাঁওয়ে সমবেত হয়েছিলেন। এ হিসেবে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্কে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর পূর্বে মাহিসুনে মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তা এতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। সোনারগাঁওয়ের তৎকালীন এ শিক্ষাকেন্দ্র বাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তা-আকীদা-বিশ্বাস সংশোধনে ও কুরআন-হাদীস অনুসারী যথার্থ ইসলামী সমাজ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এভাবে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সাধনা ও জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্র তৈরী করে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্ ৭০০ হিজরীতে (১৩০০ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। সোনারগাঁওয়েই এ মনীষীর সমাধি রচিত হয়।

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী

নাম শরফুদ্দীন। পিতার নাম ইয়াহইয়া। বিহারের মানের শহরের অধিবাসী। পিতা শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী বিহারের একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ১২৬৩ সালে শায়খ শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই উচ্চ ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। একদিন ঘটনাক্রমে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম ও পণ্ডিত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্ দিল্লী থেকে বাংলায় আগমন পথে তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শাগরিদ তাঁর ওস্তাদ নির্বাচন করে নিলেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ্র সাথে শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীও বিদ্যার্জন ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য সুদূর বাংলার সোনারগাঁওয়ে চলে আসলেন। সোনারগাঁওয়ে অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণায় তিনি এত তন্ময় থাকতেন যে, বাড়ির চিঠিপত্র পর্যন্ত পড়বার অবসর পেতেন না। শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি এতদিনকার সযত্নে রক্ষিত চিঠিগুলো খুলে পড়তে শুরু করলে একটির মধ্যে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত ওস্তাদ আবূ তাওয়ামাহ্র কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের পর তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করলেন। ওস্তাদ-ছাত্রের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ওস্তাদ ছাত্রের

মধ্যে নিজের ভবিষ্যত স্বপ্নের রূপায়ণ দেখছিলেন। তাই তিনি নিজের কন্যার সাথে তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন।

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ছিলেন তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের উজ্জ্বলতম রত্ন। অচিরেই তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওস্তাদ ও ছাত্র উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সাধানায় সোনারগাঁওয়ের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রটি বাংলার মুসলমানদের ইসলামী জীবন ধারায় শ্রেষ্ঠতম অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু জন্মভূমির আহ্বানে ১২৯৩ সালে তাঁকে সোনারগাঁও ত্যাগ করতে হয় এবং ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে তিনি মানেরে প্রত্যাবর্তন করেন। বিহারে ফিরে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষাদানে ব্রতী হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ইসলামী চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

শায়খ আবদুল্লাহ্ কিরমানী

রাজা বিক্রমকেশরীর সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহ মাহমুদ গজনবী যে সময় বর্ধমানের মঙ্গলকোটে ইসলাম প্রচার করেন ঠিক একই সময় বীরভূমে শায়খ আবদুল্লাহ্ কিরমানী ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইরানের কিরমান নগরে তাঁর জন্ম। বাংলাদেশে তুর্কী রাজত্বের তখন সবেমাত্র গোড়াপত্তন হচ্ছিল—এমন সময় তিনি এ দেশে আগমন করেন। অবশ্য শাহ গজনবীর ন্যায় ইসলাম প্রচারে মুসলিম রাজশক্তির কোনো সহায়তা তিনি পাননি। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করে যান। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারিত হয় বলে জানা যায়। বীরভূমের খুস্তিগিরী নামক স্থানে তাঁর মাযার আজও তাঁর ইসলাম প্রচারের গৌরবগাঁথা গেয়ে যাচ্ছে।

আমীর খান লোহানী

আমীর খান লোহানী মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে রাঢ় বঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলে আগমন করেন বলে মনে করা হয়। মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরের সন্নিকটে ইন্দাস গ্রামে তাঁর প্রস্তর নির্মিত মাযার আজও বিদ্যমান। মাযারটি একটি ভগ্ন মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। মনে হয়, মন্দিরের প্রস্তর দিয়েই মাযারটি নির্মিত হয়েছে। আমীর খান লোহানী ও মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তার

সারমর্ম হচ্ছে, এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে প্রতিদিন একটি করে নরবলি দেওয়া হতো। আমীর খানের প্রচেষ্টায় এ প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং তাঁর হাতে এতদঞ্চলের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে।

আমীর খান লোহানী কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে নাম দেখে অনুমিত হয় তিনি সম্ভবত আফগানিস্তানের কোন এলাকার অধিবাসী হবেন।

শাহ্ সূফী শহীদ

তৎকালে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও ছিল পশ্চিম বাংলার প্রবেশ দ্বার। তম্রলিপ্তি বা তমলুকের দিন তখন শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান হুগলীর অদূরে অবস্থিত সপ্তগ্রামে গড়ে উঠেছে পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। নানা দেশ থেকে পাল তোলা জাহাজ এসে এখানে নোঙ্গর করতো। তারমধ্যে থাকতো আরব ও ইরানের জাহাজও। ইসলামের সত্যবাণী তাই এখানে এসে পৌছেছে অনেক আগেই। তবে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের আগের কোন ইসলাম প্রচারকের নাম আমাদের জানা নেই। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে ১২৯০ খৃস্টাব্দে শাহ্ সূফী নামক এক দরবেশ এখানে এসে পৌছেন। দরবেশের প্রচেষ্টায় এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু হয়।

সপ্তগ্রাম বলতে সেই সময় সমগ্র রাঢ় বাংলাকেই বোঝাতো। মুসলিম শাসন তখনও বাংলার পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়নি। প্রধানত জাজনগর (উড়িষ্যা) রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও সপ্তগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তখন বিভিন্ন রাজার রাজত্ব ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে এ এলাকার ত্রিবেনী অঞ্চলে ভূদেব নামক এক অত্যাচারী রাজা রাজত্ব করতেন। এ সময়ের একটি ঘটনা এ এলাকার ইতিহাসের ধারাই পাল্টে দেয়। প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, জনৈক নওমুসলিম তার নবজাত পুত্র-সন্তানের আকীকা কার্য সম্পাদনের জন্য একটি গরু কোরবানী করে। এ সংবাদ অত্যাচারী রাজা ভূদেবের কাছে পৌছলে তিনি গো-হত্যার অপরাধে পিতার সামনেই শিশুপুত্রকে হত্যা করেন।

রাজা ভূদেবের এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের (১২৯১–১৩০১ খৃ.) দরবারে ফরিয়াদ করেন দরবেশ শাহ সূফী। সুলতানের নির্দেশে জাফর খান গাজীর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী এসে ত্রিবেনী আক্রমণ করে। যুদ্ধে রাজা ভূদেব পরাজিত হন এবং সপ্তগ্রাম অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও শাহ সূফী যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করেন। হুগলীর পাণ্ডুয়ায় (ছোট পাণ্ডুয়া) তাঁর সমাধি আজও ভক্তজনের হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী

লাখনৌতি ও সাতগাঁও রাজ্যে অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সাথে যে মুজাহিদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন উলুগ-ই-আযম হুমায়ূন জাফর খাঁ বাহরাম ইৎসীন। সম্ভবত তিনি লাখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে তিনি বহুস্থানে অভিযান চালিয়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। বরেন্দ্র ভূমিতে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম প্রামাণ্য নিদর্শন হচ্ছে একটি পুরাতন মসজিদ। দিনাজপুর জেলার দেবীকোট নামক স্থানের এ মসজিদটি বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর শিলালিপিটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শিলালিপি থেকে জানা যায়, উলুগ-ই-আযম হুমায়ূন জাফর খাঁ বাহরাম ইৎসীনের আদেশে মুলতানবাসী মালিক জীওন্দ কর্তৃক ৬৯৭ হিজরীর মুহররম মাসের প্রথম তারিখে (১২৯৭ খৃস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর) মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, মালিক জীওন্দ মুলতানবাসী একজন কারিগর মাত্র। কিন্তু মসজিদ নির্মাণের আদেশ দানকারী উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ নিশ্চয়ই কোনো কারিগর ছিলেন না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এ অধ্যাপক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় এ জাফর খাঁকে প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে (লখনৌতির) সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের (১২৯১–১৩০১ খৃ.) অধীনস্থ একজন রাজপুরুষ বলে ধারণা পোষণ করেছেন। তবে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, শিলালিপির সাক্ষ্যের সাথে কিংবদন্তির সাক্ষ্য মিলালে দেখা যায় পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সাতগাঁও সর্বপ্রথম মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়। আমাদের মতে সম্ভবত সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের আমলে এ অভিযান শুরু হয় এবং এ বিজয় সম্পন্ন হয় শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে। ইতিপূর্বে শাহ সূফী শহীদের ঘটনা আলোচনায় আমরা সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের নির্দেশে জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেনী বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করেছি। ত্রিবেনীতে জাফর খাঁ গাজীর মাযারে যে শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, ত্রিবেনী বিজয়ের পূর্বে তিনি মান-নৃপতি নামক জনৈক হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সম্ভবত এই 'মান-নৃপতি' দিনাজপুরের দেবীকোট অঞ্চলের কোন সামন্ত রাজা হবেন, যাঁকে পরাজিত করে বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তিনি ঐ অঞ্চলে পূর্বোল্লিখিত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মনে হয় বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলামের বিজয় অভিযান পরিচালনা কালেই তিনি দক্ষিণে ত্রিবেনীতে রাজা ভূদেবের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শোনেন। অতঃপর তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য ত্রিবেনী অভিযান করেন।

হুগলীর পাণ্ডুয়ায় জাফর খাঁ প্রতিষ্ঠিত একটি সুউচ্চ মিনার আজও সগৌরবে এতদঞ্চলে ইসলামের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে যাচ্ছে। ত্রিবেনী বিজয়ের পর এ মিনারটি তিনি নির্মাণ করেন। ১২৯৮ খৃস্টাব্দে তিনি ত্রিবেনীতে (হুগলীর পাণ্ডুয়া) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের শিলালিপিতে জাফর খাঁ গাজীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"তিনি প্রতি অভিযানে ভারতের বিভিন্ন নগর জয় করেন এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ তরবারি ও বর্শার আঘাতে পাষাণ হৃদয় বিধর্মীদের ধ্বংস করেন।" মসজিদ ছাড়াও ত্রিবেনীতে (ছোট পাণ্ডুয়া) তাঁর দারুল খয়রাত নামে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের প্রমাণও পাওয়া যায়। মাদ্রাসা গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁকে "নাসেরুল ইসলাম-ওয়া-শিহাবুল হক্কে ওয়াদ্দীন" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ইসলামের সাহায্যকারী এবং সত্য, ন্যায় ও দীনের উল্কা স্বরূপ।

বস্তুত এ সব থেকে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের বিজয়, ইসলাম প্রচার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটি প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তিনি বলিষ্ঠ হস্তে তরবারি ধারণ করেছিলেন। তিনি মূলত ছিলেন ইসলামেরই একজন মুজাহিদ। উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে এ অসম সাহসী মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের পথে বাধাসমূহ অপসারিত করে ইসলামের অগ্রগতির পথ সুগম করেন।

উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী ১৩১৩ খৃস্টাব্দে ত্রিবেনীতে ইন্তিকাল করেন। সেখানকার একটি প্রস্তর নির্মীত দেবালয়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়। বড় খান গাজী ও উগ্ওয়ান খান নামক তাঁর দু'পুত্রও ছিল। শোনা যায়, তাঁর এক পুত্র রাজা ভূদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর কবরের পাশে তাঁর এ দু'পুত্রের কবরও দেখা যায়।

পীর বদরুদ্দীন

জাফর খাঁ গাজীর সমসাময়িক কালে দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ নামক স্থানে পীর বদরুদ্দীন নামক সূফী-দরবেশ তাঁর কতিপয় সঙ্গী-শাগরিদসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁর কর্ম-তৎপরতায় স্থানীয় বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। প্রচলিত স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, পীর বদরুদ্দীনের ব্যাপক সাফল্যে রুষ্ট হয়ে স্থানীয় হিন্দু সামন্ত রাজা মহেশ তাঁর ও তাঁর দলবলের উপর অত্যাচার চালাতে থাকেন। ফলে দরবেশ গৌড়ের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন, গৌড়ের সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুদ্ধে রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন।

পরে মৃত্যুর পর এ রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রস্তররাজির সাহায্যে তাঁর সমাধি নির্মীত হয়েছে দেখা যায়। মখদুম গরীবুল ইসলাম তাঁর প্রধানতম শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবরের পাশে তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যগণও কবরস্থ হন। পরে পীর বদরুদ্দীনের মাযারে একটি সুন্দর মসজিদও নির্মীত হয়।

সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আরা

বাংলার দক্ষিণাংশে বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে যে দু'জন মহান সাধক মুজাহিদের নাম বিশেষভাবে জড়িত তাঁরা হচ্ছেন সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী ও তাঁর ভগ্নী রওশন আরা। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মুসলমানদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল বলা যেতে পারে। বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া নামক গ্রামে সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কীর মাযার অবস্থিত। সাধারণ্যে তিনি পীর গোরাচাঁদ নামে পরিচিত। ৬৬৪ হিজরী সনে (১২৬৫ খৃ.) মক্কা নগরে তাঁর জন্ম হয় বলে জানা যায়। দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে ১৩২১ খৃস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে পদার্পণ করেন। বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমনার্থে বাদশাহ যখন দিল্লী থেকে অভিযান শুরু করেন তখন তিনি বাদশাহ্র সঙ্গে ১৩২৪ খৃস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। বিদ্রোহ দমন করে বাদশাহ লাখনৌতিতে দরবার করেন এবং পর বছর ১৩২৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সাইয়েদ মক্কী বাদশাহ্র সাথে দিল্লীতে ফিরে না গিয়ে বাংলায় অবস্থান করেন। লাখনৌতি থেকে সাতগাঁও রাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী যখন চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন, তখন স্থানীয় শক্তিশালী হিন্দু সামন্ত রাজা চন্দ্রকেতুর সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে তিনি তৎকালীন মুসলিম শাসনকর্তার (সম্ভবত সাতগাঁও-এর তৎকালীন গভর্নর মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহইয়া) সহায়তায় রাজা চন্দ্রকেতুকে পরাজিত ও নিহত করতে সমর্থ হন। অতঃপর অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ নামক আরো দু'জন স্থানীয় হিন্দু সামন্তের সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। বকানন্দ তাঁর হাতে নিহত হলেও তিনি নিজে যুদ্ধে আহত হন। আহত অবস্থায় হাড়োয়ায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়।

সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কীর ভগ্নী রওশন আরা একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। মক্কা নগরে ১২৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ভ্রাতা আব্বাস আলীর সাথে প্রথমে

দিল্লী ও পরে বাংলায় আগমন করেন। চব্বিশ পরগণার তারাগুনিয়া গ্রামে অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন বলে জানা যায়। ১২৪২ খৃস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পারিবারিক জীবন ও সন্তানাদি সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না।

শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা

নদী প্রধান এ বাংলাদেশে শাহ বদর বা বদর পীরের প্রভাব যে কত বেশি তা বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার নদীপথে ভ্রমণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে আজও বাংলার মাঝি-মাল্লারা নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদর পীরের নাম উচ্চারণ করে থাকে। এ বদর পীর আমাদের মতে সম্ভবত চট্টগ্রামের শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা। চট্টগ্রাম শহরের মধ্যস্থলে বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর মাযার অবস্থিত। শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর একটি পত্রের কারণে শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ তাঁকে বিহারের অধিবাসী এবং তিনি বিহারে ইন্তিকাল করেছেন বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর পত্রে যে শাহ বদরুদ্দীনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে শাহ্ মখদুম বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী। তিনি পঞ্চদশ শতকের লোক। তিনি কিছুদিন মাত্র চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর বিহারে প্রত্যাবর্তন করে ১৪৪০ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অথচ আমাদের আলোচ্য শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা ১৩৪০ খৃস্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, পীর বদর যখন চট্টগ্রামে আস্তানা গাড়েন তখন চট্টগ্রামে জিন-পরীদের বাসস্থান ছিল। তাদের অত্যাচারে মানুষের জীবন যাপন দুরূহ হয়ে উঠেছিল। এমনি সময়ে একদিন পীর বদর সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম অবতরণ করেন। তিনি চট্টগ্রামবাসীদেরকে জিন-পরীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি দেন। এ কিংবদন্তির পেছনে যেটুকু সত্য নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, চট্টগ্রাম তৎকালে মগ-দস্যুদের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে (১৩৩৮–১৩৫০ খৃ.) তার সেনাপতি কদল খান গাজীর সহায়তায় শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা ওরফে বদর পীর ও তাঁর সহচরগণ মগদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখিত ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে ১৩৪০ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম

মুসলমানদের দ্বারা সর্বপ্রথম বিজিত হয়।[৬] ইবনে বতুতা ১৩৪৬-৪৭ সালে যখন বাংলা সফর করেন তখন তিনি চট্টগ্রাম শহর ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের শাসনাধীন দেখেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রামকে নিজের অন্যতম রাজধানীতে পরিণত করেন। তাঁর নৌবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল। সম্ভবত এ শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে মগদস্যুদের পরাজিত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

ডঃ এনামুল হক তাঁর 'বাংলাদেশে সুফীবাদের ইতিহাস' গ্রন্থে ১৬৪৬ সালে রচিত একটি বাংলা পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

কাএ মনে প্রণাম করি বারে বার।
কদল খান গাজী জান ভুবনের সার ॥
যার রসে পড়িল অসংখ্য রিপুগণ।
ভএ কেহ মজিলেক সমুদ্র গহন ॥
এক পরে হইল সহস্র প্রাণহীণ।
রিপুজিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন ॥

....

বৃক্ষতলে বসিলেক কাফিরের গণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিল নিধন ॥
তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরী।
মুসলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুরী ॥

অর্থাৎ—"বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কদল খান গাজীকে আমি সমগ্র হৃদয় দিয়ে মর্যাদায় অভিষিক্ত করছি। তাঁর সাথে যুদ্ধে অসংখ্য শত্রু ধরাশায়ী হলো। তাদের কেউ কেউ সমুদ্রে ডুবে মরলো। একজনের নির্দেশে হাজার হাজার লোক নিহত হলো। শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করে তিনি চট্টগ্রাম নিজের অধীন করলেন। .... যুদ্ধে পরাজয়ের পরে বহুসংখ্যক শত্রু একটি বৃক্ষতলে বসেছিল। তিনি সেই বৃক্ষ ছেদন করে শত্রুদের নিধন করলেন। তাঁর জনৈক সাথী চাটেশ্বরী দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। অতঃপর শহরের সমস্ত অধিবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন।"

পাণ্ডুলিপিতে আরো উল্লিখিত হয়েছে যে, যুদ্ধজয় শেষে কদল খান গাজী যখন শিবিরে ফিরছিলেন তখন তিনি নিজের কয়েকজন বন্ধু দরবেশকে দেখলেন। তাদের মধ্যে হাজী খলিল ও বদরে আলম ছিলেন সুবিখ্যাত। কদল খান গাজী তাদেরকে শিবিরে নিয়ে গেলেন। হাজী খলিলকে দেখে বদরে আলম খুশি হলেন। আর সবাই পরস্পরকে দেখে খুশি হলো।[৭] অর্থাৎ যুদ্ধশেষে যারা জীবিত ছিল তারা পরস্পরকে মোবারকবাদ দিল। বোঝা গেলো, বেশ বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে অমুসলিম

পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছিল, মুসলিম পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতিও কম ছিল না এবং এ যুদ্ধে দরবেশ বাহিনী যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম বিজিত হয় কদল খান গাজীর হাতে। আর ইতিপূর্বে আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে জেনেছি যে, বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে চট্টগ্রাম প্রথম বিজিত হয় এবং সেখানে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কদল খান গাজী ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের কোন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামার দরবেশ বাহিনীর সহায়তায় ১৩৪০ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। কাজেই শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা ১৩৪০ খৃস্টাব্দে জীবিত ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলি গ্রামে সমাধিস্থ তাঁর অন্যতম সঙ্গী মুহসিন আউলিয়ার কবরগাত্রের শিলালিপি থেকে দেখা যায় যে, ১৩৯৭ খৃস্টাব্দে তাঁর (মুহসিন আউলিয়া) মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই এর ৫৭ বছর পূর্বে তাঁর অন্যতম সঙ্গী শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামার মৃত্যু মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ষষ্ঠদশ শতকের কবি দৌলত উজীর বাহরাম বলেন, শাহ্ বদর চট্টগ্রামে সমাধিস্থ হয়েছেন।

কাত্তাল পীর

চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে এ দরবেশের মাযার অবস্থিত। স্থানীয় জনগণের মধ্যে তিনি কাতাল পীর নামে পরিচিত। এ নামের কারণে ঐ স্থানের নামকরণ হয়েছে কাতালগঞ্জ। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি শাহ্ বদরের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর আসল নাম জানা যায় না। সম্ভবত মগদের সাথে যুদ্ধে অসীম বীরত্বের কারণে তিনি 'কাত্তাল' উপাধি লাভ করেন। কারণ আরবীতে 'কাত্তাল' বলতে সাধারণত দুর্দান্ত ও অসম সাহসী যোদ্ধাই বোঝায়, যিনি অসংখ্য শত্রু নিপাত করেন। আর 'কাতাল' শব্দটিই মূলত যুদ্ধ, জিহাদ ও হত্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কাত্তাল শব্দটি যে পরবর্তী কালে 'কাতালে' পরিণত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

শাহ্ বদরের সমসাময়িক আরো কয়েকজন দরবেশের কবর চট্টগ্রামের চন্দনপুরা মহল্লার একটি টিলার উপর অবস্থিত। তাঁদের নাম হচ্ছে, শাহ্ মোল্লা মিসকিন, শাহ্ পীর, শাহ্ আশরাফ, কাবুলী শাহ্, বান্দারিয়া শাহ্ ও শাহ্ মুবারক আলী। শাহ্ বদরের আগমনের কয়েক বছর পর শাহ্ মোল্লা মিসকিনের নেতৃত্বে এ দরবেশগণ চট্টগ্রামে আগমন করেন বলে জানা যায়। তাঁদের মাযারের সন্নিকটে প্রাক-মোগল আমলের একটি মসজিদ দেখা যায়। সম্ভবত বাংলার মুসলিম সুলতানদের মধ্য থেকে কেউ তা নির্মাণ করে থাকবেন।

শাহ্ জালাল মুজাররাদ

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে শাহ্ জালাল মুজাররাদের দান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, তাঁর হাতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৮] বস্তুত সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এতে সন্দেহ নেই। এ জেলাসমূহের অধিবাসীদের উপর আজও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব এ কথাই প্রমাণ করে।

সিলেট শহরে তাঁর মাযার অবস্থিত। হিজরী ৭০৩ সনে অর্থাৎ ১৩০৩ খৃস্টাব্দে তিনি সিলেট আগমন করেন। এর কয়েক বছর আগে তিনি গৌড়ে আগমন করেন।

তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩–১৫১৯ খৃ.) উৎকীর্ণ দু'খানা শিলালিপি থেকে আমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। সেখানে 'শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদ' নামে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে শায়খ শাহ্ জালালের পিতার নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর জন্মস্থানের নাম পাওয়া যায় না। ৯১১ হিজরী (১৫০৫ খৃ.) সনে উৎকীর্ণ হোসেন শাহের আমলের তৃতীয় একটি শিলালিপিতে তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজ শিলালিপিটি আবিষ্কার করেন এবং হেনরী ব্লকম্যান কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। তাতে শাহ্ জালাল সম্পর্কে বলা হয়েছে : অর্থাৎ—"উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম আবেদ .... শাহ্ জালাল মুজাররাদ কুনয়ায়ী।"

এ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কুনিয়া তুরস্কের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল। গওস মান্দুবী তাঁর 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে শাহ জালাল সম্পর্কে যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাও এ বিবরণের সমর্থন করে। গওস মান্দুবী শায়খ আলী শেরের 'শারহ্-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' নামক গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে শাহ জালাল সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। শায়খ আলী শের নিজেকে হযরত শাহ্ জালালের সাথী ও শিষ্য শায়খ নুরুল হুদা আবুল কেরামতের বংশধর বলে দাবি করেন। তিনি ১৫৬২ খৃস্টাব্দে বা তার কিছুকাল পরে ইন্তিকাল করেন। 'শারহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' ১৫৬২ খৃস্টাব্দে রচিত বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থটির কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। গওস মান্দুবী ১৬১৩ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত শাহ জালালের ইন্তিকালের পৌনে তিনশ বছর পর তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর বর্ণনা মতে, শাহ জালাল তুর্কীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সাইয়েদ আহমদ ইয়েসবীর খলীফা ছিলেন। এখানে আমরা শাহ্ জালালের

জন্মস্থানের যে পরিচয় পাই তা তৃতীয় শিলালিপির বর্ণনার সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। কারণ শিলালিপিতে উল্লিখিত কুনিয়া এশিয়া মাইনরে অবস্থিত। এশিয়া মাইনর তুর্কীদের অধীনস্থ থাকায় সম্ভবত গওস মান্দুবী একে তুর্কীস্তান মনে করেছেন। এ কথা মেনে নিলে হযরত শাহ্ জালালের জন্মস্থান সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধী মত গড়ে ওঠে।

'সুহাইল-ই-ইয়ামন' নামক হযরত শাহ্ জালাল সম্পর্কিত ফার্সী ভাষায় লিখিত অপর একটি জীবনী গ্রন্থে তাঁকে ইয়ামনের অধিবাসী বলা হয়েছে। এ গ্রন্থটি লেখেন ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে সিলেটের তদানীন্তন মুন্সেফ নাসীরুদ্দীন হায়দর। তিনি প্রচলিত আখ্যান এবং 'রিসালা' ও 'রওযাতুস সালাতীন' নামক দু'টি পুস্তিকার সাহায্যে গ্রন্থটি রচনা করেন। রিসালা শাহ্ জালালের দরগাহের খাদিম মুহীউদ্দীন কর্তৃক রচিত। কিন্তু 'রওযাতুস সালাতীনে'র রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। 'রিসালা' ও 'রওযাতুস সালাতীন' পুস্তিকা দু'খানি যথাক্রমে ১৭১১ ও ১৭২১ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত শাহ জালালের অন্তত পৌনে চার'শ বছর পরের রচনা। ডক্টর এম. এ. রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে সুহাইল-ই-ইয়ামন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"এ বইটি প্রধানত স্থানীয় জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর লেখক পূর্ববর্তী দু'খানা পুস্তিকার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, সেখান থেকেই তিনি এ বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ঘটনা-বিবরণীর দিক দিয়ে কল্পনাভিত্তিক হলেও অন্যান্য সম-সাময়িক দলিল থেকে সুহাইলে ইয়ামনের কোন কোন ঘটনা-বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। কাজেই একেবারে গালগল্প বলে বইটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সুহাইল-ই-ইয়ামনের বর্ণনা মতে শাহ্ জালাল ইয়ামনের মুহাম্মদ নামক জনৈক সূফীর পুত্র। বাল্যাবস্থায় তিনি পিতা-মাতাকে হারান। ফলে তাঁর মাতুল বিখ্যাত সূফী সাইয়েদ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি মামার সঙ্গে কাটান।

সুহাইল-ই-ইয়ামন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বা শিলালিপিতে হযরত শাহ্ জালালকে ইয়ামনের অধিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়নি। বরং শিলালিপিতে এবং 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে তাঁকে কুনয়ায়ী বা কুনিয়া শহরের (তুর্কীস্তানের) অধিবাসী বলা হয়েছে। অন্যদিকে শিলালিপিতে ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামনে' তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ বলা হয়েছে। এ সব বর্ণনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, শাহ্ জালাল প্রকৃতপক্ষে শায়খ জালাল নামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে শায়খ 'শাহ্' শব্দে রূপান্তরিত হয়। আর তাঁর পিতার নাম ছিল মুহাম্মদ এবং তিনি

ছিলেন কুনিয়া শহরের অধিবাসী। অবশ্য এ ব্যাপারে আরো বিস্তৃত গবেষণার পরই হয়তো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামনে'র বর্ণনামতে শাহ্ জালাল সারা তুর্কীস্তান ভ্রমণ করেন এবং ইয়ামন, বাগদাদ ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ শেষে দিল্লীতে এসে পৌঁছেন। সেখানে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬–১৩২৫ খৃ.) কাছে কিছুদিন অবস্থান করার পর বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন।

তিনি যখন বাংলায় প্রবেশ করেন তখন এখানে ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৩০১–১৩২২ খৃ.) আমল। সম্ভবত তিনি তখন গৌড়ে অবস্থান করে গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সিলেট বিজয় সম্পর্কে 'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' গ্রন্থদ্বয় সম্পূর্ণ একমত। এ উভয় গ্রন্থে এবং হিন্দু আখ্যানে সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের সাথে তাঁর যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে। শাহ্ জালালের সিলেট আগমন সম্পর্কে সুহাইল-ই-ইয়ামনের নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়। শায়খ বোরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। পুত্র-সন্তানের জন্ম উপলক্ষে তিনি একটি গরু কোরবানী করেন। এ কথা জানতে পেরে রাজা গৌর গোবিন্দ গো-হত্যার শাস্তিস্বরূপ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করার ও নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকরী হবার পর শাস্তিপ্রাপ্ত মজলুম বোরহানুদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের দরবারে উপনীত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশ দেন। সিকান্দার খান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করলে রাজা গৌর গোবিন্দের হাতে পরাজয় বরণ করেন। সুলতান তাঁর ভাগিনেয়ের পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও-এর গভর্নর নাসিরুদ্দীনকে সিকান্দার খানের সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেন। হযরত শাহ্ জালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ তৎকালে সাতগাঁও অঞ্চলে মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শুনে তিনি তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেনী নামক স্থানে সিকান্দার খানের সাথে যোগ দেন।

এবারের যুদ্ধে রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। মুসলমানরা সিলেট জয় করে তাকে গৌড়ের অঙ্গীভূত করে। ৯১৮ হিজরী সনে (১৫১২ খৃ.) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয়বার্তা সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"শায়খুল মাশায়েখ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ্ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃ.)।"[৯]

এ শিলালিপি থেকে জানা যায়, সর্বপ্রথম ৭৩০ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃ.) সিকান্দার খান গাজীর হাতে হযরত শাহ্ জালালের সহযোগিতায় সিলেট বিজিত হয় এবং তখন ছিল ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামল। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে দেখা যায়, রাজা গৌর গোবিন্দের কাছ থেকে সুলতান শামসুদ্দীন সিলেট জয় করেন। আবার সুহাইল-ই-ইয়ামনে বলা হয়েছে, সুলতান সিকান্দার তাঁর মাতুল গৌড়ের সুলতানের নির্দেশে সিলেট জয় করেন।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিলালিপিতে উল্লিখিত ফিরোজ শাহ দেহলবী গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের (১২৬৫-৮৭ খৃ.) প্রপৌত্র। সম্ভবত দিল্লীর রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে তাঁকে 'দেহলবী' বলা হয়েছে। অন্যদিকে শিলালিপিতে উল্লিখিত সিকান্দার খান গাজী ও সুহাইল-ই-ইয়ামনের সুলতান সিকান্দার অভিন্ন। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নির্দেশে তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার খান হযরত শাহ জালাল ও তাঁর ৩৬০ জন সহচর দরবেশ দলের সহযোগিতায় ১৩০৩ খৃস্টাব্দে সিলেট জয় করেন।

সিলেট বিজিত হবার পর শাহ্ জালাল সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর শিষ্যদলের একাংশ গৌড়ীয় সেনাদলের সাথে গৌড়ে ফিরে আসেন। তাঁরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অবশিষ্টাংশ তাঁর সঙ্গে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি সিলেট, তার চতুস্পার্শ্বস্থ জেলাসমূহ ও আসামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপক অভিযান চালান। ফলে বাংলা ও আসামের অগণিত মানুষ তাঁর ও তাঁর সহচরদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ অব্দে বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় তখন ছিল ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০ খৃ.) আমল। ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম (সাদকাওঁয়া) বন্দরে অবতরণ করে শাহ জালালের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নৌকাযোগে এক মাসের পথ অতিক্রম করে কামরূপে (কামারু) গমন করেন। তিনি শাহ্ জালালের আস্তানায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি বলেন, "শাহ্ জালাল লম্বা ও পাতলা গড়নের ছিলেন। তাঁর দু'দিকের গাল ছিল বসা, এক'শ পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলতেন, তিনি বাগদাদে খলীফা

মু'তাসাম বিল্লাহকে দেখেছেন এবং খলীফাকে হত্যা করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোযা রাখেন। এ সময় দশদিন অন্তর তিনি ইফতারি করতেন।"[১০]

ইবনে বতুতা লিখেছেন, "তিনি একটি গুহার মধ্যে অবস্থান করতেন। গুহার বাইরে ছিল তাঁর খানকাহ, লোকালয় থেকে দূরে। দেশের হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর দর্শনার্থে আসতো। তারা তাঁর জন্য তোহফা ও নজরানা আনতো। কিন্তু তিনি নিজে তা ভক্ষণ না করে তা থেকে ফকীর ও মিসকিনদের আহার্য যোগাতেন। তাঁর নিজের গাভী ছিল। সেই গাভীর দুধ পান করেই তিনি ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতেন।"[১১]

ইবনে বতুতা তিন দিন পর্যন্ত হযরত শাহ জালালের মেহমানখানায় অবস্থান করেন। তিনি শাহ জালাল সম্পর্কিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "তাঁর আস্তানা থেকে আমি যখন দু'মঞ্জিলের পথ দূরে ছিলাম তখন পথে শায়খের চারজন অনুচরের সাথে আমার দেখা হলো। তারা আমাকে জানালো ঃ শায়খ অধিকাংশ ফকীরকে জানিয়েছিলেন যে, আরব দেশ থেকে একজন পর্যটক আমার নিকট আসছেন, তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে হবে। কাজেই শায়খের নির্দেশ মতো আমরা এসেছি। অথচ আমার আগমন সম্পর্কে শায়খ কিছুই অবগত ছিলেন না। .... তাদের সাথে আমি শায়খের নিকট হাজির হলাম। আমাকে দেখেই শায়খ উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার সাথে গলাগলি করে আমার দেশের ও পথের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব অবস্থা বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তো আরবের মুসাফির। তাঁর জনৈক সহচর বললেন ঃ হুযুর, ইনি আরব ও আজম উভয় এলাকার মুসাফির। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আরব ও আজমের মুসাফির। কাজেই এঁর যথাযোগ্য সমাদর কর। ...."

"প্রথম দিন আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর পরনে মার্জেতে প্রস্তুত একটি পশমী জোব্বা। আমি মনে মনে বললাম, শায়খ যদি জোব্বাটি আমাকে দিয়ে দিতেন তাহলে কতইনা ভালো হতো। শেষ দিন আমি যখন বিদায় নিতে গেলাম তখন শায়খ গুহার এক কোণে গিয়ে জোব্বাটি খুলে ফেললেন এবং তা এনে আমাকে পরিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের মাথা থেকে টুপিটি খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। পরে তাঁর অনুচররা আমাকে জানালো যে, শায়খ জোব্বা পরতে অভ্যস্ত নন, কেবলমাত্র আমার আসার খবর শুনে তিনি এ জোব্বাটি পরেন। তিনি বলেছিলেন, মগরিবের (মরক্কো) অধিবাসী আমার নিকট থেকে এ জোব্বাটি চাইবে। অতঃপর জনৈক কাফির বাদশাহ তার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে আমার ভাই বোরহানুদ্দীনকে দান করবে।"

"অনুচরদের মুখে এ কথা শুনে আমি মনে দৃঢ় সংকল্প করে ফেললাম যে, শায়খ প্রদত্ত এ জোব্বাটি আমার জন্য একটি অতি মূল্যবান সম্পদ, কাজেই আমি এটি

পরিধান করে কোন মুসলমান বা কাফির বাদশাহ্র সামনে যাবো না। শায়েখের নিকট থেকে বিদায় নেয়ার দীর্ঘদিন পর আমি চীনের খানসা (হংচৌফু) শহরে গেলাম। শহরে নেমে আমি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ভিড়ের চাপে এক স্থানে এসে আমি সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। এ সময় জোব্বাটি আমার পরিধানে ছিল। পথে জনৈক মন্ত্রীর সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনি আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং আমার হাত ধরে অবস্থা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে আমরা বাদশাহ্র মহলের দরজায় পৌছে গেলাম। আমি বিদায় নিতে চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন না। আমাকে নিয়ে বাদশাহের নিকট হাজির হলেন। বাদশাহ্ আমার নিকট মুসলমান বাদশাহদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি জবাব দিলাম। আমার জোব্বার উপর বাদশাহর নজর পড়লো। তিনি জোব্বাটির অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। মন্ত্রী আমাকে জোব্বাটি খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন। সে সময় এ নির্দেশটি আমাকে পালন করতেই হলো। বাদশাহ জোব্বাটি নিয়ে নিলেন। এর বিনিময়ে তিনি আমাকে দশ জোড়া পোশাক ও সাজ সরঞ্জামসহ একটি ঘোড়া দিলেন এবং নগদ কিছু অর্থও দিলেন। আমার ভীষণ দুঃখ হলো। শায়খের কথা মনে পড়লো। আমি যারপরনাই অবাকও হলাম। পরের বছর আমি গেলাম চীনের রাজধানী খান বালিক (পিকিং) শহরে। সেখানে শায়খ বোরহানুদ্দীন সাগেরজীর খানকায় যাবার সুযোগ হলো। দেখলাম শায়খ একটি কিতাব পড়ছেন। তাঁর পরিধানে সেই একই জোব্বাটি দেখলাম। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। জোব্বাটি হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। শায়খ আমাকে বললেন ঃ তুমি এটি নাড়াচাড়া করছো কেন ? তুমি কি এটা চেন ? আমি বলমাম ঃ হ্যাঁ চিনি, খানসার বাদশাহ্ এটি আমার নিকট থেকে নিয়েছিলেন। শায়খ বললেন ঃ এ জোব্বাটি শায়খ জালালুদ্দীন আমার জন্য তৈরী করেছিলেন এবং আমাকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে, উমুক ব্যক্তির মারফত জোব্বাটি আমার নিকট পৌছবে। শায়খ আমাকে পত্রটি দেখালেন। আমি পত্রটি পড়লাম এবং শায়খের নিশ্চিত সত্য ভাষণের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। পরে আমি শায়খ বোরহানুদ্দীনের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করলাম। সব শুনে তিনি বললেন ঃ শায়খ শাহ্ জালালের মর্যাদা এর চাইতেও অনেক বেশি। .... তিনি বর্তমানে ইন্তিকাল করেছেন। ....”[১২]

শায়খ বোরহানুদ্দীন শাহ জালালের আরো অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় সেগুলোও উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও শায়খ সম্পর্কিত আরো বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। কিন্তু এ সব অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা শুধু এ কথাই বলতে চাই যে, শায়খ

অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর এ সমুদয় শক্তি তিনি এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। খানকাহ থেকে তিনি একদিকে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন এবং অন্যদিকে এ কেন্দ্রটিকে গরীব-দুঃখীদের জন্য সাহায্য সংস্থা রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সহচরগণ বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত উত্তর বঙ্গে হযরত জালালুদ্দীন তাবরিজী ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের ভূমিকাও ছিল একই পর্যায়ভুক্ত। বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সহচরদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি ব্যাপক ও প্রভাবশালী।

ইবনে বতুতা চীনে গিয়ে শায়খ বোরহানুদ্দীনের কাছে হযরত শাহ জালালের মৃত্যু সংবাদ পান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ১৫০ বছর পূর্ণ হয়েছিল। 'ইবনে বতুতা' ১৩৪৬ সালে বাংলা ত্যাগ করে ৪০ দিন পর আরাকান হয়ে জাভা ও সুমাত্রায় পৌছেন। সুমাত্রায় ১৫ দিন অবস্থানের পর ২১ দিনের পথ অতিক্রম করে শ্যাম ও কম্বোডিয়ায় পৌছেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান শেষে চীনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ৪০ দিনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তাঁদের জাহাজ চীনে প্রবেশ করে। ৭০ দিনে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণের পর তিনি চীনের কুন-চুন-ফু শহরে প্রবেশ করেন। এখানে ১৫ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর ১৭ দিনের সফর শেষে খানসা শহরে উপস্থিত হন। এখানে তাঁর জোব্বা ছিনিয়ে নেবার ঘটনা ঘটে। অতঃপর এখান থেকে বিভিন্নস্থান ভ্রমণ করতে করতে বেশ কিছুদিন পরে তিনি পিকিং শহরে পৌছেন এবং সেখানে বোরহানুদ্দীন সাগেরজীর কাছে শাহ জালালের মৃত্যু সংবাদ পান। এভাবে দেখা যায়, শাহ জালালের মৃত্যু সংবাদ পেতে তাঁর এক বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কাজেই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে বাংলা ত্যাগ করেন এবং ১৩৪৭ সালে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের ইন্তিকাল হয়।

শাহ কামাল

ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে শাহ কামালের মাযার অবস্থিত। তিনি হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের সাথে বাংলাদেশে আসেন এবং তাঁর নির্দেশক্রমে ইসলাম প্রচার কার্যে ব্রতী হন বলে জানা যায়। একই নামের আর এক ব্যক্তির মাযার কুমিল্লার নিকটবর্তী উত্‌খড়া গ্রামেও দেখা যায়। অবশ্য একই ব্যক্তির

দু'মাযার হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই মনে হয় হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের একই নামের দু'শিষ্য ছিল এবং তাঁদের দুজনের মাযার দু'স্থানে অবস্থিত। অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন 'সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "ইয়মন দেশীয় শাহ কামালুদ্দীন ১৩৮৫ খৃস্টাব্দে নিজের স্ত্রী ও নয়জন শিষ্যসহ তাঁর পিতা শাহ বোরহানুদ্দীনের অন্বেষণে সিলেটে আসেন। শাহ বোরহানুদ্দীন ছিলেন হযরত শাহ জালালের একজন প্রধান শিষ্য। শাহ কামাল সিলেটে এসে হযরত শাহ জালালের মুরীদ হন। পীরের আদেশে শাহ কামাল কয়েক জন শিষ্যসহ সুনামগঞ্জের শাহারপাড়া নামক স্থানে গিয়ে আস্তানা স্থাপন করেন এবং উহার চতুস্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।"

সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ

কুমিল্লা জেলার আখাউড়া রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী খড়মপুর গ্রামে হযরত সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদের মাযার অবস্থিত। নোয়াখালী জেলার শসদিয়া রেল-স্টেশনের কাছে এ দরবেশের একটি আস্তানা রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, নোয়াখালী ও কুমিল্লা উভয় জেলায়ই ছিল এ দরবেশের কর্মক্ষেত্র। তিনি এক যুদ্ধে শাহাদত বরণ করার পর কেবলমাত্র তাঁর মস্তকটি সমাধিস্থ করা হয় বলেই তাঁকে কল্লা শহীদ বলা হয়।

তিনি ছিলেন সিলেটের হযরত শাহ জালালের অন্যতম শিষ্য। শাহ জালাল সিলেট জয়ের পর তাঁর শিষ্যদেরকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে তরফপুর পরগণায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় সাইয়েদ নাসিরুদ্দীনের নেতৃত্বে এগারোজন শিষ্যের উপর। এ দলে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ। তাঁর মাথার চুল লম্বা ছিল বলে তাঁকে 'গেছু-দারাজ' বলা হতো।

সাইয়েদ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে অমুসলিমদের কাছ থেকে বহু বাধার সম্মুখীন হন, এমন কি এক পর্যায়ে তাঁকে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। সম্ভবত তরফের হিন্দু সামন্ত রাজা আচক নারায়ণের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও সাইয়েদ আহমদ শহীদ হন। সম্ভবত তাঁর কোন ভক্ত তাঁর কর্তিত মস্তকের সন্ধান পান এবং তিনি এ স্থান থেকে পনের-ষোল মাইল দূরবর্তী খড়মপুরে এনে তা সমাধিস্থ করেন। খড়মপুর গ্রামের অধিবাসীদেরকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন বলে জনশ্রুতিতে জানা যায়।

শরীফ শাহ

কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ক্যানিং শহরের সন্নিকটে ঘুটিয়ার শরীফে শরীফ শাহ দরবেশের মাযার অবস্থিত। এ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবন এলাকায় ইসলাম প্রচারে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর আগমনের সময়কাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা না গেলেও সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কীর সমসময়ের বা তাঁর পরপরই তিনি এখানে আগমন করেছিলেন বলে মনে হয়। এ অঞ্চলে ইসলাম যে ভাবে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে তাতে মনে হয় বিভিন্ন সময় এ সব এলাকায় বিভিন্ন ইসলাম প্রচারক ও মুজাহিদের আগমন হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু এ নয়, প্রচলিত বিকৃত ধর্ম-বিশ্বাস এসব ইসলাম প্রচারক ও মুজাহিদের চেহারাও বিকৃত করে দিয়েছে বলে মনে হয়। যার ফলে দীনের এ শ্রেষ্ঠ মুজাহিদগণের আস্তানা ও মাযার বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার ঘুটিয়ার শরীফ এ তালিকার শীর্ষে স্থান লাভ করেছে। প্রতি বছর এখানে যে উরস অনুষ্ঠিত হয় তাতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকার লোক দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করে। এ থেকে অন্ততপক্ষে শরীফ শাহের ব্যাপক ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

বড়খান গাজী

বড়খান গাজী সম্ভবত ত্রিবেনী বিজেতা উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজীর পুত্র। ত্রিবেনীতে জাফর খাঁ গাজীর মাযারের পাশে তাঁর মাযার অবস্থিত। যশোর, চব্বিশপরগণা ও খুলনা অঞ্চলে এ মুসলিম মুজাহিদ সম্পর্কে বহু কিংবদন্তিমূলক কাহিনী ছড়িয়ে আছে। এমন কি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এ মুজাহিদের সাথে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্য ও 'গাজী কালু-চম্পাবতী' কাব্যে বলা হয়েছে যে, যশোর রাজ-মুকুট রায় ও দক্ষিণ দেশের রাজা দক্ষিণা রায়ের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে গাজী জয়লাভ করেন। এ মুকুট রায় গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৮–১৩৯১ খৃ.) আমলের সামন্ত রাজা মুকুট রায় হতে পারেন বলে মনে হয়।

উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেনী বিজয়ের পর দক্ষিণ দেশের প্রতিরোধ দুর্গ ভেঙ্গে পড়ে। কাজেই তাঁর সুযোগ্য পুত্র এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যে দক্ষিণ দিকে বিজয় অভিযান পরিচালনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই মনে হয়, জাফর খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বড়খান গাজী দক্ষিণ দিকের জেলাসমূহে ইসলাম

প্রচারের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর এ অভিযান অভাবিতপূর্ব সাফল্য লাভ করে।

সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ্ নেকমর্দান

বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সব ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই দিনাজপুর জেলায় নিজেদের কর্মশক্তি নিয়োগ করেন। তাই দিনাজপুর জেলায় বহু আলেম ও দরবেশের আস্তানা ও মাযার দেখা যায়। এ আলেম ও দরবেশদের সাথে জড়িত বহু কিংবদন্তি এ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এ সব কিংবদন্তি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

এ ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সাইয়েদ নেকমর্দ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নাম। তাঁর আসল নাম সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ্ নেকমর্দান, তবে জনগণের মধ্যে তিনি নেকমর্দ নামে পরিচিত। সম্ভবত অত্যধিক সৎ-স্বভাব ও চরিত্র মাধুর্যের জন্য তিনি এ নামে পরিচিত হয়েছেন। তাঁকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন ইসলাম প্রচারক মনে করা হয়। দিনাজপুর জেলার নেকমর্দান গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সাইয়েদ নেকমর্দান সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, দিনাজপুর জেলার এ অঞ্চলে তৎকালে নাথ–পন্থীদের প্রাধান্য ছিল এবং এখানে নাথ–পন্থীদের গুরু গোরক্ষনাথের একটি মন্দির ছিল। ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ নামক দুই জমিদার ভ্রাতা ছিলেন এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সাইয়েদ নেকমর্দ তাঁর সঙ্গী-সহচরদের নিয়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলে এ জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের উপর নানাবিধ উৎপীড়ন শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইয়েদ নেকমর্দ ও তাঁর সহচরদের সাথে সংঘর্ষে জমিদারদ্বয়ের পতন ঘটে। ফলে এ এলাকায় ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়।

সাইয়েদ নেকমর্দানের মাযারটি বহুদিন অনাদৃত ছিল। পরে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব তিন'শ বিঘা পরিমাণ জমি মাযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে দিনাজপুরে সাইয়েদ নেকমর্দানের যে বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে তাতে মনে হয় তাঁর এ অঞ্চলে আগমন ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী

সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী উত্তর বঙ্গের একজন যথার্থ প্রভাবশালী ইসলাম প্রচারক ও সূফী ছিলেন। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২–১৩৫৮ খৃ.)

তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ (১৩৫১–১৩৮৮ খৃ.) ১৩৫৩ খৃস্টাব্দে গৌড় আক্রমণ করলে সুলতান ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে চতুর্দিকে ফিরোজ শাহী সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় নগর অভ্যন্তরে সাইয়েদ রিযা বিয়াবানীর মৃত্যু হয়। ইলিয়াস শাহ ভয়াবহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফকীরের ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বের হন এবং সাইয়েদ বিয়াবানীর জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করে আবার দুর্গে ফিরে যান। এ থেকে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের উপর সাইয়েদ রিযা বিয়াবানীর প্রভাব অনুমান করা যায়।

মওলানা আতা

সম্ভবত ১৩০০ থেকে ১৩৫০ সনের মধ্যে মওলানা আতা নামক একজন বিখ্যাত আলেম দিনাজপুর জেলায় ইসলাম প্রচার করেন। এ জেলার দেবীকোট নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত। গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৮–১৩৮৮ খৃ.) তাঁর মাযারের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ মসজিদের শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায় যে, মওলানা আতা একজন শ্রেষ্ঠ সূফী, অদ্বিতীয় মুহাক্কিক (বিশেষজ্ঞ) আলেম এবং সত্য, ন্যায় ও দীনের প্রদীপ ছিলেন। তাঁর দরগাহের চারটি শিলালিপির তারিখ হচ্ছে ১৩৬৩, ১৪৮২, ১৪৯১ ও ১৫১২ খৃস্টাব্দ। সম্ভবত প্রথম শিলালিপিটি সুলতান সিকান্দার শাহ স্থাপন করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আলেম ও সূফী শায়খ আখী সিরাজুদ্দীনের (মৃত্যু ঃ ১৩৫৭ খৃ.) সমসাময়িক ছিলেন।

শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় ইসলাম প্রচারে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর অবদান সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চতুর্দশ শতকে বাংলায় আর এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হচ্ছেন শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন। তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রভূমি গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বসে তিনি ইসলাম প্রচার অভিযান চালিয়ে যান। দিল্লীর হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬–১৩২৫ খৃ.) তিনি ছিলেন প্রিয় শাগরিদ। তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁকে 'আইনায়ে হিন্দ' বা হিন্দুস্তানের মুকুর উপাধিতে ভূষিত করেন। বাল্যকালেই তিনি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে উপনীত হন। সেখানে মওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদীর (মৃত্যু ঃ ১৩২৭ খৃ.) উপর তার শিক্ষা-দীক্ষার ভার পড়ে। ফখরুদ্দীন জাররাদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কিছুকালের মধ্যে শায়খ আখী

সিরাজুদ্দীন বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ ছাড়াও মওলানা রুকনুদ্দীনের কাছেও তিনি কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এভাবে সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিতগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি অল্প কালের মধ্যে হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকেন। এমন কি 'সিয়ারুল আরেফীন' গ্রন্থে তাঁর বিদ্যাবত্তার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তৎকালীন হিন্দুস্তানে তাঁর সমকক্ষ কোনো আলেম ছিল না এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করার যোগ্যতাও কারোর ছিল না।

ইসলামী বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা-পর্ব সমাপ্তির পর হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁকে খিলাফত দান করেন এবং বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন। কিন্তু নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জীবিতকালে তিনি দিল্লী ত্যাগ করেননি। তবে এ সময় একবার মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে তিনি গৌড়ে আগমন করেন এবং আবার কিছুদিন পর দিল্লী ফিরে যান। ১৩২৫ খৃস্টাব্দে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ইন্তিকালের পর তিনি দিল্লী ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে গৌড়ে অবস্থান করেন। সাদুল্লাপুর মহল্লায় নিজের আবাসস্থলের কাছে তিনি খানকাহ ও গরীবদের জন্য একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন বাংলার দু'টি শ্রেষ্ঠ শহর গৌড় ও পাণ্ডুয়া তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁর গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কারণে ধীরে ধীরে মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর সংস্পর্শে এসে সাধারণ মুসলমানরা সঠিক ইসলামী জীবন-যাপনের সুযোগ পায় এবং বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। গৌড়ের সুলতান ও সুলতান কুমারগণ তাঁর জ্ঞান-গরিমা, ইসলামী চরিত্র ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তৎকালীন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খৃ.) তাঁর প্রধান ভক্তে পরিণত হন। তাঁর স্থাপিত খানকাহ ব্যাপক ধর্মীয়, তমদ্দুনিক ও মানবিকতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর লঙ্গরখানায় অভুক্ত, ভিখারী ও দরিদ্রদের জন্য সর্বদা খাদ্য প্রস্তুত থাকতো।

তাঁর শাগরিদদের মধ্যে শায়খ আলা-উল-হক বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন ১৩৫৭ খৃস্টাব্দে (৭৫৮ হিজরী) গৌড়ে ইন্তিকাল করেন। গৌড়ের সাগরদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শায়খ আখী সিরাজুদ্দীনকে অনেকে বাদায়ূনের অধিবাসী বলে মনে করেছেন। এ মত অবলম্বন করার ব্যাপারে মীর্জা মুহাম্মদ আখতার দেহলবীর 'তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ' গ্রন্থটি প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছে। 'রফিক-উল-আরেফীনের'

সংগ্রাহকের মতে শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী। কিন্তু অন্যান্য অধিকতর প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। 'সিয়ার-উল-আরেফীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন ছিলেন পাণ্ডুয়ানী অর্থাৎ পাণ্ডুয়ার অধিবাসী। 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শায়খ আখী সিরাজুদ্দীন তাঁর পীর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কাছ থেকে খিলাফত লাভ করার পর ওয়াতন-ই-খুদ অর্থাৎ স্বদেশ ভূমিতে ফিরে যান। অবশ্যই দিল্লী থেকে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন। 'খাজিনাতুল আসাফিয়া'র লেখক গোলাম সারওয়ারও তাঁকে বাংলার অধিবাসী বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা রুগ্ন মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাংলাদেশে আগমনের কথা উল্লেখ করেছি। 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর বাংলাদেশে আগমন ও ইসলাম প্রচার তাঁর বাংলাদেশের অধিবাসী হবার দিকেই ইঙ্গিত করে।

শাহ্ মালেক ইয়ামনী

ঢাকার ইডেন বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হযরত শাহ্ মালেক ইয়ামনীর মাযার অবস্থিত। প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত শাহ্ মালেক ইয়ামনী হযরত শায়খ শাহ্ জালাল মুজাররাদের সাথে প্রথম সিলেটে আসেন। অতঃপর সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহ্ জালাল তাঁর শাগরিদগণকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ সময় ঢাকা অঞ্চলে হযরত শাহ্ মালেক ইয়ামনী ইসলাম প্রচারে প্রেরিত হন। ঢাকা শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়।

তাঁর মাযারের পাশে হযরত শাহ্ বলখীর মাযার অবস্থিত। শোনা যায়, তিনি ছিলেন হযরত শাহ মালেক ইয়ামনীর শাগরিদ এবং ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মালেককে সহায়তা দান করার জন্য তিনি ঢাকায় আগমন করেন।

সাইয়েদ হাফেজ মওলানা আহমদ তান্নূরী

নোয়াখালী জেলার ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সাইয়েদ হাফেজ মওলানা আহমদ তান্নূরী তারাককোলী ওরফে সাইয়েদ মীরান শাহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। তিনি এ অঞ্চলে প্রথম যুগের ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম। এ জেলায় কাঞ্চনপুর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।

তিনি বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর পৌত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মওলানা আজাল্ল (র)। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮

খৃ.) পর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বংশধর ইরান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তান উপ-মহাদেশে চলে আসেন। মওলানা সাইয়েদ আজাল্লা (র) নানা স্থান ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে আগমন করেন এবং সেখানেই সাইয়েদ আহমদের জন্ম হয়। তিনি পিতার কাছে সকল ইল্‌ম শিক্ষা লাভ করার পর অন্যান্য ওস্তাদ ও পীরের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যা অর্জন ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। অবশেষে পিতার বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বারজন শাগরিদসহ পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নোয়াখালী জেলার সোনারবাগে পৌছেন। এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তিনি ও তাঁর দলবল ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি সিলেটের হযরত শাহ্ জালালের (মৃত্যু ঃ ১৩৪৭ খৃ.) সমসাময়িক বলে কথিত।

শায়খ বখতিয়ার মাইসূর

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপাঞ্চলে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে শায়খ বখতিয়ার মাইসূরের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সন্দ্বীপের রোহিনী নামক স্থানে তাঁর মাযার বর্তমান। শোনা যায়, তিনি নোয়াখালীর ইসলাম প্রচারক মওলানা সাইয়েদ আহমদ তান্নুরীর সঙ্গেই দিল্লী থেকে বাংলার এ অঞ্চলে আগমন করেন। দ্বীপ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেউ কেউ তাঁকে খৃস্টীয় তের শতকের ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

মখদুম শাহ্ জালালুদ্দীন জাঁহা গাশ্ত বুখারী

নাম থেকে অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র বুখারায় ১৩০৭ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। পাঞ্জাবের উছ নগরে তাঁর সমাধি বর্তমান। রংপুর জেলার মাহিগঞ্জে তাঁর একটি প্রাচীন আস্তানা রয়েছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ শেষে তিনি বাংলায় আগমন করেন এবং তদানীন্তন বাংলার প্রাণকেন্দ্র পাণ্ডুয়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এ সময় তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ আলেম ও সূফী আলাউল হকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সম্ভবত এখান থেকেই তিনি রংপুর জেলার মাহিগঞ্জে গমন করেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৩৮৩ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবের উছ নগরে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

রাস্তি শাহ্

কুমিল্লা জেলার ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত রাস্তি শাহ্ বিশেষ প্রসিদ্ধ। জেলার কালিবাড়ী স্টেশনের পূর্বদিকে শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি হযরত

আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর বংশধর বলে পরিচিত। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের শাসনামলে (১৩৫১–১৩৮৮ খৃ.) তিনি বাংলায় আগমন করেন বলে জানা যায়। হযরত সাইয়েদ আহমদ তান্নুরী যখন নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে আগমন করেন তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কুমিল্লার এ অঞ্চলে আগমন করেন বলে জানা যায়। কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার বহু অমুসলিম তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামে দীক্ষিত হয়। সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁকে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করেন।

শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী

কুমিল্লার শাহতলী রেল স্টেশনের নিকটবর্তী শাহতলী খন্দকার বাড়িতে হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদীর মাযার অবস্থিত। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের কাছ থেকে শাহতলী মৌজাটি নিষ্কর সম্পত্তি হিসেবে লাভ করার পর তিনি সেখানে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলামের অভাবিতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি হযরত রাস্তি শাহের সমসাময়িক ছিলেন।

সাইয়েদুল আরেফীন

বর্তমান পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত বাউফল থানার কালিগুড়ি গ্রামে হযরত সাইয়েদুল আরেফীনের মাযার অবস্থিত। দিগ্বিজয়ী তৈমুর লংগের আমলে (১৩৬১–১৪০৫ খৃ.) তিনি বাংলায় আগমন করেন। কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তৈমুর লংগের নির্দেশেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি মধ্য-এশিয়া থেকে এ সুদূর বাংলায় আগমন করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে তিনি এ দেশে আগমন করেন।

জনশ্রুতি থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করে হযরত সাইয়েদুল আরেফীন প্রথমে সমগ্র এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেখানে ইসলামের আলো এখনও প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি, সেই এলাকায় তিনি আস্তানা স্থাপন করবেন। কিন্তু তিনি দেখেন বাংলার সর্বত্র ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তবে অসংখ্য নদী পরিবেষ্টিত বাকেরগঞ্জ জেলা ভ্রমণকালে তিনি এমন বহু স্থান দেখেন, যেখানে একজনও মুসলমান নেই। এমনি একটি স্থান ছিল কালিগুড়ি। এখানেই তিনি নিজের আস্তানা স্থাপন করেন। পটুয়াখালী ও বরিশালের এ এলাকার বহু অমুসলিমকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন। এ এলাকার মুসলমানরা তাই হযরত সাইয়েদুল আরেফীনকে বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকার সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম গণ্য করেন।

শাহ্ লঙ্গর

ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত মুয়াজ্জমপুর গ্রামে শাহ লঙ্গরের মাযার অবস্থিত। তাঁর মাযার সংলগ্ন মসজিদটি গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩১–১৪৪২ খৃ.) নির্মিত হয়। অবশ্য সর্বত্রই এ সমস্ত ইসলাম প্রচারক ও দরবেশগণের মৃত্যুর পর বা বহু বছর পর তাদের আস্তানায় বা মাযারে মসজিদ নির্মিত হতে দেখা গেছে। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে হযরত শাহ লঙ্গরকে চতুর্দশ শতকের শেষের দিকের বা তারও বহু পূর্বের কোন ইসলাম প্রচারক বলা যেতে পারে।

হযরত শাহ্ লঙ্গরের প্রকৃত নাম জানা যায় না। লঙ্গর শব্দটি মূলত কোন নাম হতে পারে না। সম্ভবত এটি লঙ্গরখানা শব্দের অংশ বিশেষ। এ থেকে অন্ততপক্ষে এতটুকুন অনুমান করা যায় যে, হযরত শাহ্ লঙ্গর নিজের আস্তানার সঙ্গে কোনো বড় আকারের লঙ্গরখানা কায়েম করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি গরীব, দুঃখী ও অভাবী নও-মুসলিমদের আহার যোগাতেন। এ লঙ্গরখানা অত্যধিক প্রসিদ্ধি ও সাফল্যলাভ করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর আসল নাম ও পরিচয় এর অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর এ লঙ্গরখানাই তাঁর ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা প্রমাণ করে। আ. ন. ম. বজলুর রশীদ তাঁর 'পাকিস্তানের সূফী সাধক' গ্রন্থে শাহ লঙ্গরকে বাগদাদের কোন শাহজাদা বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, সংসার ত্যাগী শাহজাদা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের পর ঢাকার মুয়াজ্জমপুরে এসে আস্তানা গাড়েন।

শাহ মুহসিন আউলিয়া

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ঝিয়ারী গ্রামে তাঁর মাযার ছিল। নদী-ভাঙ্গনের মুখে পড়ায় সেখান থেকে তা পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী বটতলী গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাঁর কবরের পার্শ্বে রক্ষিত প্রস্তর খণ্ডে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি হিজরী ৮০০ সনে অর্থাৎ ১৩৯৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি চট্টগ্রাম বিজয়ে অংশগ্রহণকারী পীর বদরুদ্দীন আল্লামার সহযোগী ছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথ থেকে বদরুদ্দীন আল্লামা, কাত্তাল পীর ও শাহ মুহসিন আউলিয়া একই সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেন এবং এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা কদল খান গাজীর নেতৃত্বে মুবারক শাহী বাহিনীর সাথে চট্টগ্রাম বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।

শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক

বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে সুসংহত, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করার ক্ষেত্রে শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক ও তাঁর পরিবার

বিপুল অবদান রেখে গেছেন। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম অংশ থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর ধরে এ পরিবারটি তাদের অকৃত্রিম সেবা ও পরিশ্রম, বিপুল প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য এবং অপরিসীম ধৈর্য ও ত্যাগের সাহায্যে এ দেশে মুসলিম সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করে গেছেন। এমন কি এ জন্য তাঁদের কাউকে শাহাদতও বরণ করতে হয়েছে। তদানীন্তন বাংলার দু'টি প্রধান কেন্দ্র পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁও তাঁদের কর্মকেন্দ্র হবার কারণে সমগ্র বাংলার মুসলিম জীবনে তাঁদের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে রাজা গণেশের স্বল্পকালীন শাসনামলে ইসলাম ও মুসলমান সমাজের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন নেমে আসে এবং ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করে মুসলমানদেরকে বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার যে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে ওঠে এ পরিবারের শ্রেষ্ঠ আলেম ও মর্দে মুজাহিদ হযরত নূর কুতবুল আলম যথাসময়ে দৃঢ়ভাবে তার মোকাবিলা করেন।

এ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হকের পিতা উমর ইবনে আসাদ খালিদী সম্ভবত ১৩০১ খৃস্টাব্দে বা তার পূর্বে প্রধানত ভাগ্যান্বেষণেই লাহোর থেকে বাংলায় এসে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা)-এর বংশধর। ফার্সী ভাষায় লিখিত আউলিয়া-জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে শায়খ আলাউল হক ও তাঁর বংশের অন্যান্য সূফীকে বরাবরই বাঙালী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ আলাউল হক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কথা বলা সম্ভব না হলেও তাঁর শৈশব যে বাংলাদেশে কেটেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'তাজকিরা-ই-আউলিয়ার' লেখক মওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে তিনি হিজরী ৭০১ সনে (১৩০১ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, তাঁর পিতা এ সময়ে বা এর সমসময়ে লাহোর থেকে বাংলায় আগমন করেন।

বাংলায় আগমন করে তাঁর পিতা সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭–৯২ খৃ.) কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই লাখনৌতির শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। তাঁর ভাই আজম খান পাণ্ডুয়া দরবারের অন্যতম উজীর ছিলেন। কাজেই ধনাঢ্য পরিবেশে তাঁর বাল্যজীবন শুরু হয়। অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। বংশ ও বিত্তের আভিজাত্যের সাথে পাণ্ডিত্যের যোগ হওয়ায় শায়খ আলাউল হক শীঘ্রই খ্যাতির সোপানে আরোহণ করতে সক্ষম হন।

১৩২৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যু হয়। এর কিছুক্ষণ পরে তাঁর অন্যতম খলীফা শায়খ আখী সিরাজউদ্দীন পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। শায়খ আখী

সিরাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অধ্যাত্ম শক্তি ও চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে অত্যল্পকালের মধ্যে শায়খ আলাউল হক তাঁর ছাত্র শ্রেণীভুক্ত হন এবং বিত্ত-বৈভব ও আভিজাত্যের গৌরব ত্যাগ করে দারিদ্র্য ও ত্যাগের জীবন বরণ করে নেন। উস্তাদ ও মুর্শিদের সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত থেকে তিনি দ্রুত আত্মিক উৎকর্ষের সোপান অতিক্রম করতে থাকেন।

শায়খ আখী সিরাজউদ্দীন লাখনৌতি তথা গৌড়-পাণ্ডুয়া অঞ্চলে ইসলামের যে আলো প্রজ্বলিত করেছিলেন তাঁর ইন্তিকালের পর শায়খ আলাউল হক কেবল তা প্রোজ্জ্বল রেখেই ক্ষান্ত হননি বরং নিজের উত্তরসুরিগণকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যার ফলে তাঁরা বাংলার এক বিশাল এলাকায় এ আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শায়খ আলাউল হকের পাণ্ডিত্য, মনীষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কারণে অচিরেই পাণ্ডুয়া ইসলামী জ্ঞান-সাধনার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তিনি পাণ্ডুয়ায় একটি খানকাহ নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। খানকাহ্‌র সাথে একটি লঙ্গরখানাও পরিচালনা করতে থাকেন। তার লঙ্গরখানা থেকে দরিদ্র ছাত্র ও মুসাফিররা বিনামূল্যে খাদ্যলাভ করতো। এ লঙ্গরখানায় তিনি এত বেশি সম্পদ ব্যয় করতেন যার ফলে সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৮–১৩৮৯ খৃ.) এতদঞ্চলে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করেন। এ খানকাহ্‌র মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে থাকে। দু'বছর সোনারগাঁওয়ে অবস্থান করার পর সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসেন। পাণ্ডুয়ায় অবস্থান কালে বিখ্যাত সূফী বিশ্বপর্যটক মখদুম জাঁহানিয়া জালালুদ্দীন জাঁহা গাশ্‌ত বুখারী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। শায়খ আলাউল হক ১৩৯৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। পাণ্ডুয়ার ছোট দরগাহে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

শায়খ আলাউল হকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা বাংলার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে বহু দূর দেশ থেকে ইসলামী জ্ঞান পিপাসুগণ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য পাণ্ডুয়ায় সমবেত হন। বিদেশাগত এ সব জ্ঞানসাধকের মধ্যে মধ্য এশিয়ার সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী ও সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী উল্লেখযোগ্য। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ইসলামের একনিষ্ঠ মুজাহিদ ও অধ্যাত্ম জগতের গুরু হযরত সাইয়েদ নূর কুতুবে আলম ছিলেন তাঁর পুত্র, তাঁর হাতে গড়া এবং সাধনার অমৃতময় ফল।

---

১. History of Bengal, ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

২. Calcutta Review, ভলিউম ৭, ১৯৮ পৃ-উদ্ধৃত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১, পৃষ্ঠা ১৫।

৩. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইমাম শাফি'ঈ ১৫ বছর বয়ঃক্রমকালে সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।
৪. জিয়াউদ্দীন বরনী—তারিখে ফিরোজশাহী, ৮৭ পৃষ্ঠা।
৫. গোলাম হোসেন সলীম—রিয়াযুজ সালাতীন, বাংলা অনুবাদ (বাংলার ইতিহাস), ৬০ পৃষ্ঠা।
৬. East Bengal District Gazetteers, Chittagong 1908, পৃষ্ঠা ২০—২১।
৭. ডঃ এনামুল হক—A History of Sufism in Bengal, পৃষ্ঠা ২৪৭—২৪৮।
৮. ইবনে বতুতা—আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।
৯. Journal of Asiatic Society of Bengal 1922, পৃষ্ঠা ৪১৩।
১০. ইবনে বতুতা—আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।
১১. ইবনে বতুতা—আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।
১২. ইবনে বতুতা—আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামের বিধান শুধুমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক তথা মানুষের জীবনের সমগ্র বিভাগে এ বিধান একটি সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ দান করে। এ পথ-নির্দেশ মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বলেই ইসলামকে বলা হয় স্বভাব-ধর্ম। ইসলাম কোন বিশেষ মানব গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হয়নি। সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের স্রষ্টা এ বিধান প্রেরণ করেছেন। সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এ বিধান পৌঁছিয়ে দেয়া ইসলাম অনুসারীদের দায়িত্ব বিবেচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হবার কারণে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করাও ইসলাম অনুসারীদের পবিত্র দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইসলাম দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ইসলাম অনুসারীরা ইসলামের বাণী ও দাওয়াত নিয়ে দুনিয়ার যে এলাকায় পদার্পণ করেছে সেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এ ইসলামী রাষ্ট্রের মূল্য লক্ষ্য ছিল মানুষকে সকল প্রকার দাসত্ব মুক্ত করে একমাত্র সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দাসে পরিণত করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম যুগে মুসলমানরা যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানেই এ মূল লক্ষ্য অর্জনে পূর্ণ উদ্যোগী হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের এ উদ্যোগ চলতে থাকে। ইসলামের ইতিহাসের এমনি এক যুগে হিজরী প্রথম শতকে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সাকাফী ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু এলাকা জয় করে এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়পত্তন করেন। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে সিন্ধুর অধিবাসী ও আরবের অধিবাসীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ইসলামের সত্যবাণী গ্রহণ করার পর একজন সিন্ধীও একজন আরবীর সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাকে রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করা হয়নি।

অমুসলমানদেরকে অবশ্য রাষ্ট্রের এমন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা সম্ভবপর ছিল না যার সাথে নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন বিজড়িত, তবুও রাষ্ট্রের উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক অধিকার ও ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে আমাদের এ উপমহাদেশে ইংরেজের দু'শ বছরের রাজত্বকালে দেখা গেছে ইংল্যান্ডবাসীর জন্য এক আইন এবং ভারতবাসীর জন্য অন্য আইন। এমন কি ভারতীয় খৃস্টানরাও ইংল্যান্ডবাসী খৃস্টানদের সমপর্যায়ের নাগরিক অধিকার ভোগ করেনি। মুসলমানদের শাসন আমলে অন্তত এই ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। বরং এখানে এর বিপরীতটাই দেখা যায়। দেশের সামান্য একজন নাগরিকের ফরিয়াদে বাদশাহ ও সুলতানকে কাযীর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দেখা গেছে এবং কাযী তাঁর ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় একটুও দ্বিধা করেননি।

ত্রয়োদশ শতকে ইসলাম অনুসারীদের আদর্শ-প্রীতি ও আর্দশ-নিষ্ঠায় যথেষ্ট ভাটা পড়েছিল। এ ছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের আরব মুসলিম বিজেতাগণের ইসলামের প্রতি শর্তহীন ও নিঃস্বার্থ আনুগত্যের অতি অল্প অংশই পরবর্তীকালের মুসলিম তুর্কী ও আফগান বিজেতাগণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ইসলামী বিধি-নিষেধের প্রতি যথেষ্ট উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে ইসলামী রাষ্ট্রের বহু মূলনীতি উপেক্ষিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত জুলুম-শাসনের অবসান করেছিলেন। এ দেশের হতাশা-ক্লিষ্ট নির্যাতিত মানবতাকে জাতীয় জীবনে উচ্চ আসন দান করেছিলেন। এতে সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত তথাকথিত উচ্চ বর্ণের মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের কিছুটা ক্ষতি অবশ্যই হয়েছিল কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষের সামগ্রিক জাতীয় লাভের তুলনায় তা অতি নগণ্য। খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের বাংলার মুসলিম বিজেতাগণ যদি ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অনুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এ দেশের অনুকূল পরিবেশে ইসলাম শতকরা একশ ভাগ বিজয় লাভ করতো।

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় মুসলমানদের বিজয় অভিযান শুরু হয়। দু'শ থেকে আড়াই'শ বছরের মধ্যে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলমানদের শাসনাধীন হয়। এ সময় মুসলিম বিজেতা ও শাসকগণকে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁরা বিজিত এলাকায় শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনে সক্ষম হন। এ পর্যায়ে আমরা মুসলিম বিজয়ের দু'শ বছরের ঘটনাবলী আলোচনা করবো।

মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা কোন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ অভিযানের কয়েক'শ বছর পূর্ব থেকে মুসলিম সূফী, দরবেশ, আলেম ও মুজাহিদগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে আসছিলেন। সম্ভবত ইসলাম প্রচারকদের অভাবিতপূর্ব সাফল্যই বখতিয়ার খলজীকে বঙ্গ অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে। বখতিয়ার খলজী যখন নদীয়া ও লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন, তার মাত্র কয়েক বছর পর শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী গৌড় থেকে মাত্র ১৭ মাইল দূরে পাণ্ডুয়ায় অবস্থান করে সারা বাংলায় ইসলাম প্রচার অভিযান পরিচালনা করেন।

মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী শীস্তানের অন্তর্গত গরমসীরের অধিবাসী ছিলেন। ১১৯২ খৃস্টাব্দে মুঈজুদ্দীন মুহাম্মদ সাম উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছর পর তিনি দিল্লীতে আসেন। অসম সাহসী ও উচ্চাভিলাষী হওয়া সত্ত্বেও অনাকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণে দিল্লীতে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। তাই দিল্লী থেকে তিনি পূর্ব-ভারতে চলে আসেন এবং সেখান থেকে প্রথমে দক্ষিণ বিহারে (ওদন্তপুরী বিহার) ও পর বছর নদীয়া (নোদিয়া) ও গৌড় (লক্ষণাবতী) অভিযানে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর নদীয়া অভিযানের কাহিনী আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। তাঁর নদীয়া অভিযানের তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে। তবে এই তারিখ ১২০০ থেকে ১২০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কুতুবুদ্দীন আইবেকের সভাসদ হাসান নিজামীর 'তাজুল মাসীর' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১২০৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে কুতুবুদ্দীন কালিঞ্জর দুর্গ জয় করে সেখান থেকে সরাসরি বাদায়ূনে চলে আসেন। তাঁর বাদায়ূনে চলে আসার পরপরই মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ওদন্তপুরী বিহার থেকে তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কুড়িটি হাতী, বিবিধ রত্ন ও বহু অর্থ উপঢৌকন স্বরূপ দেন। মিনহাজুস সিরাজের 'তাবকাতে নাসিরী' থেকে জানা যায় যে, বিহার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কুতুবুদ্দীন আইবেক তাঁকে খিলাত দান করেন এবং পর বছর তিনি নদীয়া অভিযান করেন। কাজেই ১২০৩ খৃস্টাব্দের পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী নদীয়া অভিযান করেন বলে মনে করাই সঙ্গত হবে।

মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া অভিযানের পর লক্ষণাবতী (লাখনৌতি) বা গৌড় জয় করেন এবং মিনহাজের বর্ণনা মতে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার দু'বছর পর্যন্ত আর কোনো অভিযানে বের হননি। এ দু'বছর তিনি লাখনৌতি রাজ্যের শাসন-শৃংখলা সুবিন্যস্ত করতে যত্নবান হন। সমগ্র

রাজ্যটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেন। নিজের বিভিন্ন সহযোগী সেনানায়ককে বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এ মাদ্রাসাগুলোতে মুসলমানদেরকে ইসলাম ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দান করা হতো। সূফী ও দরবেশদের জন্য তিনি কয়েকটি খানকাহও নির্মাণ করেন। হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি ভেঙ্গে ফেলেন বলে জানা যায়। বহু হিন্দুকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি রক্ত-লোলুপ ছিলেন না এবং অযথা নরহত্যা ও প্রজা নিপীড়নও তিনি পছন্দ করতেন না।

লাখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে কোচ, মেচ ও থারু নামে তিনটি উপজাতির বাস ছিল, তন্মধ্যে মেচ জাতির জনৈক সর্দার বখতিয়ারের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আলী মেচ। লাখনৌতি জয়ের দু'বছর পর বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে বের হলে এ আলী মেচ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিব্বত অভিযানে বখতিয়ার সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এ অভিযানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি বখতিয়ারকে ভীষণভাবে পীড়িত করে। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ৬০২ হিজরীতে (১২০৬ খৃ.) তাঁর মৃত্যু হয়। রিয়াযুস সালাতীনের বর্ণনা মতে তাঁর অনুচর নারানকোই-এর শাসনকর্তা আলী মর্দান তাঁকে হত্যা করেন।

প্রাক স্বাধীন আমল

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৩৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ১৩২ বছর ২৩ জন শাসনকর্তা বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁদের অনেকেই দিল্লী থেকে নিযুক্ত হয়ে আসলেও আসলে তাঁরা ছিলেন নামমাত্র দিল্লীর অধীন। কেউ কেউ দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠাতেন, গনীমতের (শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অর্থ-সম্পদ) এক-পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করতেন। অধিংকাংশ শাসনকর্তাই মুদ্রায় নিজের নাম অঙ্কন করেন। কোন কোন শাসনকর্তার মুদ্রায় নিজের নামের সাথে দিল্লীর বাদশাহ্‌র নামও দেখা যায়। আবার গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ ও নাসির উদ্দীন মাহমুদের মুদ্রায় বাগদাদের খলীফার নামও পাওয়া গেছে। বাংলার শাসনকর্তাগণ নিজেদের নামে খুতবাও পাঠ করাতেন। দিল্লীর সাথে মুদ্রা ও রাজস্বের সম্পর্ক কিছু বিজড়িত থাকলেও শাসন প্রণালীর ক্ষেত্রে এ আমলের বাংলার শাসনকর্তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এদিক দিয়ে এ আমলের মুসলিম বাংলাকে স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ বলা যায়।

অন্য কথায় বলা যায়, এ আমলের বাংলার উপর দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের। অনেক সময় বাংলার এক শাসনকর্তার মৃত্যু হলে অন্য

একজন তাঁর আসনে বসতেন অতঃপর তিনি দিল্লী থেকে নিজের সপক্ষে পরোয়ানা আনাতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে একজনকে বিতাড়িত করে অন্যজন শাসনকর্তার আসনে বসতেন এবং বিতাড়িত জন দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা করতেন। ফলে দিল্লীর সেনাদল এ ক্ষেত্রে বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করতো। আবার কোনো ক্ষেত্রে দিল্লীর বাদশাহ দুর্বল হলে বাংলার বিতাড়িত শাসনকর্তা ভাগ্য-বিড়ম্বনার শিকার হতেন। যেমন অযোধ্যার শাসনকর্তা তামুর খান বাংলার শাসনকর্তা তুগরল তুগান খানকে বিতাড়িত করে লাখনৌতি দখল করলে দিল্লীর দুর্বল সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ বাংলার বিতাড়িত শাসনকর্তাকে কোন সাহায্য করতে পারেননি।

এ আমলকে বলা যায় বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক আমল। এ প্রাথমিক আমলের শাসনকর্তাগণ ছিলেন তুর্কী ও আফগান জাতীয়। আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাঁদের লক্ষ্য না থাকলেও আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র থেকে তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। ইসলামে তাঁরা ছিলেন নবাগত। মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তান, খোরাসান ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের নিকটতম পূর্বপুরুষরা দীর্ঘকাল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার পর অবশেষে ইসলামের দুর্জয় শক্তির কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তৌহিদী সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বকে তাঁরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিরকবাদী ও পৌত্তলিক সমাজ ব্যবস্থার নিষ্পেষণ থেকে দুর্গত মানবতাকে রক্ষা করে তৌহিদী সমাজ ব্যবস্থার সুফল ও কল্যাণে বাংলার মানুষের জীবনক্ষেত্র ভরিয়ে তোলার প্রেরণাও তাঁদের বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছিল। তাই তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালের মোগল আমলের 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো' ধরনের প্রবণতা দেখা যায়নি। বিলাসিতার বাহুল্যও এখানে কম পরিদৃষ্ট হয়। অন্তত মুসলিম শাসনের এ প্রথম আমলে বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রবণতা যথেষ্ট দেখা যায়।

বখতিয়ার খলজী লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করলেও আসলে তিনি এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোটে (বর্তমান গঙ্গারামপুর) বসে শাসন পরিচালনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় এক যুগ পর্যন্ত দেবকোটের এ গুরুত্ব অপরিবর্তিত থাকে। গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহের শাসনামলে (১২১৩–১২২৬ খৃ.) দেবকোটের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং লাখনৌতি পুরোপুরি রাজধানী হয়ে ওঠে। গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ ১৪ বছর রাজত্ব করেন। তিনি বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় প্রেরণার উৎস ছিলেন। আলেম, দরবেশ ও সৈয়দদের নিয়মিত বৃত্তি দান করে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারে সাহায্য করেছেন। দেশের দূরবর্তী এলাকা থেকে দুস্থ মুসলমানরা তাঁর কাছে আসতো এবং তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে

বিদায় দিতেন। লাখনৌতি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি দেবকোট থেকে লাখনৌর বা রাজনগর (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত) পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করেন। তিনি দিল্লীর অধীনতা মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। ১২২৬ খৃস্টাব্দে তিনি পূর্ববঙ্গ ও কামরূপে বিজয় অভিযান চালাচ্ছিলেন এমন সময় দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ এক বিরাট সেনাবাহিনীর সাহায্যে সহজেই লাখনৌতি অধিকার করেন। সংবাদ পেয়ে গিয়াসুদ্দীন তাঁর বিজয় অভিযান ত্যাগ করে দ্রুত ফিরে এসে নাসিরুদ্দীনকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

অতঃপর সুলতান ইলতুৎমিসের অনুমোদনক্রমে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (১২২৬–১২২৮ খৃ.) লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি মাত্র দেড় বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাসিরুদ্দীন মাহমুদও ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনিও বিভিন্ন শহরের আলেম ও সৈয়দগণকে অর্থ দানে সহযোগিতা করেন।

নাসিরুদ্দীন মাহমুদের পর চারজন শাসনকর্তা লাখনৌতি রাজ্য শাসন করেন। অতঃপর ১২৩৬ খৃস্টাব্দে তুগরল তুগান খান লাখনৌতির শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি প্রায় ৮ বছর বাংলা শাসন করেন। তিনি দেশের সর্বত্র ইসলাম বিস্তারে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। এ সময় তাবকাতে নাসিরীর লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজুস সিরাজ লাখনৌতিতে আসেন। তিনি তিন বছর (১২৪১–১২৪৪ খৃ.) বাংলায় অবস্থান করে এখানকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। মিনহাজের সাক্ষ্যমতে লাখনৌতি রাজ্য তৎকালে গঙ্গার দু'তীরে রাঢ় ও বরেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং লক্ষণ সেনের বংশধররা তখনও বিক্রমপুরে রাজত্ব করছিলেন। জাজনগর (উড়িষ্যা) রাজ প্রথম নরসিংহ দেবের সাথে তুগরলের তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবার নরসিংহদেব জাজনগরের সীমানা অতিক্রম করে লাখনৌতি অবরোধ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর তুগরল জাজনগর রাজকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। অতঃপর জাজনগর রাজকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি অগ্রসর হয়ে জাজনগর আক্রমণ করেন। তিনি জাজনগরের সীমান্তস্থিত কটাসিন দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা বিশ্রাম ও আহারে ব্যস্ত থাকাকালে জাজনগরের সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিছন থেকে আক্রমণ চালায়। ফলে তুগরল পরাজিত হয়ে লখনৌতি ফিরে আসেন। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি দিল্লীতে সাহায্যের আবেদন জানান। ইতিমধ্যে জাজনগর রাজ আবার লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে লাখনৌর অবরোধ করে সেখানকার সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করেন।[১] অতঃপর অগ্রসর হয়ে লাখনৌতি অবরোধ করেন। কিন্তু

অবরোধের দ্বিতীয় দিনে দিল্লীর বাদশাহ্‌র নির্দেশে অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে লাখনৌতি পৌঁছে যাওয়ায় জাজনগর রাজ সসৈন্যে পলায়ন করতে বাধ্য হন। জাজনগর রাজের পরাজয়ের পর তুগরল তুগান খানের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়, এবং তুরান খান তাঁকে বিতাড়িত করে লাখনৌতির শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করেন।

তমুর খান দু'বছর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পর জালালুদ্দীন মাসুদ জানী চার বছর বাংলা ও বিহার শাসন করেন। অতঃপর ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর সাথে জাজনগর রাজের তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথম দু'বার জাজনগর রাজ পরাজিত হন এবং তৃতীয় বার যুজবক পরাজিত হন। পর বছর যুজবক 'উমর্দন'[২] রাজ্য আক্রমণ করে জয় করে নেন। উমর্দন জয়ে যুজবক অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ওঠেন এবং অযোধ্যার রাজধানী অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তিনি নিজের জন্য সুলতান মুগীসুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে লাখনৌতি অধিকার করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। যুজবক লাখনৌতি ত্যাগ করে মুসলিম রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কামরূপ অভিযানে বের হন। কামরূপের বড় বড় নগরগুলো তিনি একের পর এক জয় করে ফেলেন। কিন্তু কামরূপের রাজধানীতে তিনি কামরূপ সেনাদল কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এখানে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর ১২৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১২৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচজন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। এই সময় পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু অংশ মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুগীসুদ্দীন তুগরল খান

সম্ভবত বাংলায় মুসলিম শাসন এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন ১২৭১ খৃস্টাব্দে দিল্লীর বিশিষ্ট আমীর আমীন খানকে বাংলার শাসনকর্তা ও তুগরল খানকে তাঁর সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তুগরল খান সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তুগরল খান ছিলেন বলবনের প্রিয়পাত্র। তিনি প্রায় ১২ বছর বাংলাদেশ শাসন করেন। তিনি পূর্বে সোনারগাঁও পর্যন্ত বিজয় অভিযান চালান। সোনারগাঁওয়ের নিকটবর্তী নরকিলা (সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে) নামক স্থানে তিনি 'কিলাই-তুগরল' নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলা ও ঢাকা জেলার বৃহত্তর অংশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহীর' লেখক

জিয়াউদ্দীন বারনীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তুগরল খান জাজনগর রাজ্যেও অভিযান চালিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-রত্ন ও হস্তী লাভ করে ফিরে আসেন। 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' থেকে জানা যায়, ত্রিপুরার রাজকুমারদের মধ্যে সিংহাসনের দ্বন্দ্বে তুগরল খান কুমার রত্নফাকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করেন এবং তাঁকে চার হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য ও মাণিক্য উপাধি দান করেন। এরপর থেকেই ত্রিপুরার রাজ পরিবারে মাণিক্য উপাধির প্রচলন হয়। বিনিময়ে রাজা রত্নফা তুগরল খানকে ১০০টি হস্তী ও বহুবিধ মহামূল্য বস্তু উপঢৌকন দান করেন।[৩] এভাবে তুগরল খানের আমলে মুসলিম শাসনের প্রভাব পূর্বদিকে সমতট ও বঙ্গের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তুগরল খান বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল উদার এবং দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। এ জন্য মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সবাই তাঁকে ভালোবাসতো। বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য এক সময় আলেম ও দরবেশগণকে তিনি পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করেছিলেন। জিয়াউদ্দীন বারনীর বর্ণনা মতে তুগরল খান দিল্লীতেও দান স্বরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন।

বিভিন্ন অভিযানে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে তুগরল খান নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। তারপর তিনি মুগীসুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুতবা পাঠ করান। ফলে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তুরমতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠান। মালিক তুরমতি তুগরলের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। পর বছর বলবনের প্রেরিত আর একটি সেনাদলও তুগরলের হাতে পরাজিত হয়। অতঃপর বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তুগরল তাঁর নৌবহর নিয়ে সরযু নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে আসেন। তিনি লাখনৌতি থেকে পশ্চাদপসরণ করে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং এখান থেকে জাজনগরের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথে বলবনের সেনাবাহিনীর হাতে ধৃত ও নিহত হন। তুগরল নিহত হলে বলবন বহু বন্দী ও ধন-রত্ন নিয়ে বিজয় গৌরবে লাখনৌতিতে ফিরে আসেন। লাখনৌতির বাজারে এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে বধ্যমঞ্চ নির্মীত হয় এবং তাতে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারিবাহক এবং পাইকদের ফাঁসি দেওয়া হয়। এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর বলবন বাংলার বিশৃংখল শাসন ব্যবস্থাকে শৃংখলাবদ্ধ করেন এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্র বগ্‌রা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পুত্রকে তিনি দেশের শাসন শৃংখলা সম্পর্কে বেশ কিছু উপদেশ দেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে ঃ "প্রজাদের

কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ এত কম রাজস্ব আদায় করা উচিত হবে না যাতে তাদের পক্ষে বিরোধী ও বিদ্রোহী হওয়া সম্ভবপর হয় ; আবার এত অধিক আদায় করা উচিত নয় যার ফলে তারা নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হয়। কর্মচারীদের এমন বেতন দেওয়া উচিত যাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে তাদের কষ্ট না হয়। আত্ম স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হুকুম দেওয়া উচিত নয় আবার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিচারমূলক কাজ করাও অনুচিত। যারা পার্থিব বিষয়াদি ত্যাগ করে আল্লাহ্র সেবায় আত্মনিয়োগ করে আছেন তুমি তাঁদের পরামর্শ নিয়ো।" পুত্রকে এ পরামর্শ দেবার পর তিনি তুগরলের হস্তীগুলোসহ ১৩৮২ খৃস্টাব্দে দিল্লী ফিরে যান।

বগ্রা খানের প্রকৃত নাম ছিল নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। গিয়াসুদ্দীন বলবন ছিলেন যতটা কর্মঠ ও সংযমী নাসিরুদ্দীন বগ্রা খান ছিলেন ঠিক ততটা অলস ও বিলাসী। লাখনৌতিক শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার পর পিতার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে তিনি পুরোপুরি বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। তিনি প্রায় নয় বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন কাইকাউস ১২৯১ খৃস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১২৯৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁর ক্ষমতারোহণের পূর্ব থেকেই পূর্ববঙ্গের বিরাট অংশ মুসলমানদের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। কারণ, তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরের একটি মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, তা 'বঙ্গ' এর ভূমি-রাজস্ব থেকে প্রস্তুত। প্রাচীন কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তাঁর আমলে পশ্চিম বঙ্গের সাতগাঁ (ত্রিবেনী) অঞ্চল মুসলমানদের রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁর জনৈক সেনাপতি উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী এ অঞ্চল জয় করেন। এভাবে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের এক'শ বছরের মধ্যে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। এ সময়ে পূর্ববঙ্গে লক্ষণ সেনের বংশধরদের রাজত্বের অবসান সূচিত হয়।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ

রুকনুদ্দীন কাইকাউসের পর শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার সুলতান হন। তিনি ৭০১ থেকে ৭২২ হিজরী (১৩০১–১৩২২ খৃ.) পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সুদীর্ঘ বাইশ বছর কাল রাজ্য শাসন করেন। তাঁর সময় রাজ্যের আয়তন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সাতগাঁও, ময়মনসিংহ, সোনারগাঁও ও সুদূর সিলেট পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। মনে হয় ইসলাম প্রচারকে তিনি একটি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তাঁর এক সেনাপতি উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী

সাতগাঁও অঞ্চল (ত্রিবেনী) জয় করেন। সম্ভবত সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের শাসনামলের শেষের দিকে সাতগাঁও অভিযান শুরু হয়। সাতগাঁও-এর কতিপয় হিন্দু সামন্ত রাজা অথবা ভূদেব নৃপতির বিরুদ্ধে এ অভিযান চলে। সুলতানের সেনাপতি জাফর খাঁন এ যুদ্ধে শহীদ হন। অতঃপর শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলের প্রারম্ভেই দ্বিতীয় জাফর খান বাহরাম আতিগীনের সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।[৪] সরকার সাতগাঁও বলতে তখন রাঢ়ের বৃহত্তম অংশকে বোঝাতো। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে এভাবে রাঢ়ের বৃহত্তম অংশের উপর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর অপর এক সেনাপতি সিকান্দার শাহ ১৩০৩ খৃস্টাব্দে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের বিরাট দরবেশ বাহিনীর সহায়তায় সিলেট জয় করেন। নদীয়া ও লাখনৌতির পতনের পর তৎকালীন দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ সিলেটে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং রাজা গৌর গোবিন্দ এ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রতিভূ হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই সিলেটে মুসলিম সেনাদলকে শতাব্দীর বৃহত্তম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সেনাপতি দু'বার পরাজয়ের পর তৃতীয় বার হযরত শাহ জালাল ও তাঁর দরবেশ বাহিনীর সহায়তায় বিজয় লাভ করেন। এভাবে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ তদানীন্তন বাংলায় ইসলাম প্রচারে রত আলেম-দরবেশ-মুজাহিদ দলের সহায়তা করেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী সুলতান ছিলেন সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক স্টেপলটনের বর্ণনা মতে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজ্য বিহার, লাখনৌতি, সাতগাঁও ও বঙ্গ (সোনারগাঁও) এ চারটি সরকারে বিভক্ত ছিল। বিহারের সমসাময়িক সূফী আলেম শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী তাঁর 'মুলফুযাত'-এ উল্লেখ করেছেন যে, কামারুও (কামরূপ রাজ্য) ফিরোজ শাহের শাসন এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইয়াহইয়া মানেরীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে সোনারগাঁও-এ তাঁর রাজধানী ছিল বলে ধারণা করা যায়।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের দ্বন্দ্বের কারণে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলক বঙ্গ অভিযানের সুযোগ পান। ১৩২৪ খৃস্টাব্দে তিনি শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র নাসিরুদ্দীন ইবরাহীম শাহকে লাখনৌতির ও বাহরাম খান ওরফে তাতার খানকে সোনারগাঁও ও সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গিয়াসুদ্দীন তোগলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাংলার শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর আমলে ১৩৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লাখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে কদর খান, মালিক ইযযুদ্দীন ও বাহরাম

খান। এ সময় বাহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁও-এ বিদ্রোহ করেন। এরপর থেকে বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের শাসন আমল শুরু হয়।

স্বাধীন সুলতানগণের আমল

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

স্বাধীন সুলতানগণ বাংলায় প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করেন। তাঁরা দিল্লীর কোন প্রকার অধীনতা স্বীকার করতেন না। তাঁরা নিজেদের নামে মুদ্রা তৈরী করতেন ও খুতবা পড়াতেন। এ আমলে বাংলার সম্পদ বাংলায়ই থেকে যেতো, দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঠানো হতো না। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ওরফে ফখ্‌রাহ্ ছিলেন এ ধরনের প্রথম স্বাধীন সুলতান। বাহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর তিনি সোনারগাঁও অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। ফলে লাখনৌতি ও সাতগাঁও-এর শাসনকর্তাদ্বয় একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। ফখরুদ্দীন পরাজিত হন। কিন্তু বিজয়ী শাসনকর্তাদ্বয় ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরোধের সুযোগে ফখরুদ্দীন পুনর্বার সোনারগাঁও দখল করতে সক্ষম হন। লাখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান নিহত হন। ফলে ফখরুদ্দীন লাখনৌতিও সাময়িকভাবে দখল করতে সক্ষম হন। পরে কদর খানের অধীনস্থ আলী মুবারক নামক এক ব্যক্তি ফখরুদ্দীনের নিযুক্ত লাখনৌতির শাসনকর্তাকে হত্যা করায় লাখনৌতি তাঁর হস্তচ্যুত হয়। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ লাখনৌতি অধিকদিন নিজের অধিকারে রাখতে সক্ষম না হলেও সোনারগাঁওসহ পূর্ববঙ্গের সমগ্র এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। সোনারগাঁও তাঁর রাজধানী হবার কারণে তিনি পূর্ববঙ্গে অধিক দূর পর্যন্ত মুসলিম শাসন বিস্তৃত করার সুযোগ পান। বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের আমলের রাজ কর্মচারী শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। চট্টগ্রাম এলাকার কিংবদন্তি ও প্রাচীন পুঁথির বিবরণী থেকে জানা যায় যে, কদল খান গাজী চট্টগ্রাম জয় করেন এবং এ যুদ্ধে শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা ও তাঁর দরবেশ বাহিনী তাঁকে সহায়তা দান করেন। সম্ভবত কদল খান গাজী ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন। ফখরুদ্দীনকে এ এলাকায় বিশেষ কর মগদের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরুদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর বাদশাহ্ মুহাম্মদ তোগলকের প্রতিনিধি। মুহাম্মদ

তোগলকের সাথে তখন ফখরুদ্দীনের বিরোধ চলছিল। তাই তিনি গোলযোগের ভয়ে ফখরুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। কিন্তু ফখরুদ্দীনের শাসন আমলে বহু বিবরণ তিনি লিখে গেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, ফখরুদ্দীনের নৌ-বাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এ নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি লাখনৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দীন আলী শাহের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতেন। দু' শাসনকর্তার মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হতো। ফখরুদ্দীন ফকীর অর্থাৎ সূফী-দরবেশদেরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। সাদকাঁও (চাটগাঁ) ছিল তাঁর অন্যতম রাজধানী। একবার এক শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার সময় তিনি শায়দা নামক এক ফকীরকে চট্টগ্রামে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। কিন্তু শায়দা ফখরুদ্দীনের ভক্তির মর্যাদা রাখতে পারেননি। ফখরুদ্দীনের অনুপস্থিতিতে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং ফখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেন। ফখরুদ্দীন চট্টগ্রামে ফিরে আসলে শায়দা ভীত হয়ে সোনারগাঁও-এ পলায়ন করেন। কিন্তু সোনারগাঁও-এর অধিবাসীরা তাঁকে বন্দী করে ফখরুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে শায়দা ও তাঁর সঙ্গে বহু ফকীরের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু এ ঘটনার পরও ফকীরদের প্রতি ফখরুদ্দীনের ভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সম্ভবত সাধারণ ফকীর সমাজ শায়দার এ বিশ্বাসঘাতকতাকে সুনজরে দেখেননি এবং শায়দাকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালে ফকীরগণ যে কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্নও ছিলেন—এ ঘটনা থেকে এ কথাও প্রমাণ হয়। ইবনে বতুতা আরো লিখেছেন যে, ফখরুদ্দীনের রাজ্যে ফকীর-দরবেশদের অবাধ যাতায়াত ছিল। ফখরুদ্দীনের আদেশ বলে ফকীরগণ বিনা ভাড়ায় নৌকায় যাতায়াত করতে পারতেন। নিঃসম্বল ফকীরদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করা হতো। এভাবে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ফকীর-দরবেশদের সহায়তায় পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। ১৩৩৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করে ফখরুদ্দীন মুবরাক শাহ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সিলেটের হিন্দুরা ফখরুদ্দীন সরকারকে নানা প্রকার কর দেওয়া ছাড়া তাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক দিতে বাধ্য হতো। বাংলাদেশের সর্বত্র জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব কম ছিল, যা সারা ভারতের কোথাও কল্পনা করা যেতো না।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও সেকেন্দার শাহ

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী সোনারগাঁও-এর সুলতান হন। তিনি দু'বছর রাজত্ব করেন। ইতিপূর্বে লাখনৌতির শাসনকর্তা

আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে তাঁর অধীনস্থ হাজী ইলিয়াস নামক এক ব্যক্তি (১৩৪২ খৃ.) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করে লাখনৌতির সিংহাসনে বসেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যুর পর তিনি সোনারগাঁও আক্রমণ করে ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইতিপূর্বে তিনি সাতগাঁও-ও দখল করে নিয়েছিলেন। তিনি নেপাল আক্রমণ করে সেখান থেকে বহু ধন-রত্ন আনেন। নেপালের সমসাময়িক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ইলিয়াস শাহ নেপাল আক্রমণ করে সেখানকার বহু নগর জ্বালিয়ে দেন ও বহু মন্দির ধ্বংস করেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। পশ্চিমে তিনি ত্রিহুত, চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী পর্যন্ত অঞ্চল জয় করেছিলেন। পূর্বে কামরূপের কতকাংশও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এভাবে রাজ্য বিস্তার অভিলাষী ইলিয়াস শাহ দিল্লী সাম্রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করার কারণে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এ আক্রমণের ফলে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ গৌড় নগরের পাশে গঙ্গা তীরে অবস্থিত দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ফিরোজ শাহ প্রায় এগার মাস গৌড় অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানের ফলে ত্রিহুত প্রভৃতি পশ্চিমের নবাধিকৃত স্থানগুলো ইলিয়াস শাহের হস্তচ্যুত হয় কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। 'রিয়াযুস সালাতীন'-এর বর্ণনা মতে ৭৫৭ হিজরীতে (১৩৫৬ খৃ.) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে দিল্লী ও বাংলা রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত হয় এবং দিল্লী কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলাদেশে তিনজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও সূফী বর্তমান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ আখী সিরাজুদ্দীন উসমান, শায়খ আলাউল হক ও রাজা বিয়াবানি। ইলিয়াস শাহ সূফী ও আলেমগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের ইসলাম প্রচারে সর্বতোভাবে সহায়তা দান করতেন। তিনি ১৩৫৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেকেন্দার শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি আনুমানিক তেত্রিশ বছর (১৩৫৮–১৩৯১ খৃ.) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক পুনর্বার বাংলাদেশে অভিযান চালান। এবারের অভিযানে ফিরোজ শাহের প্রায় দু'বছর সাত মাস সময় লাগে। কিন্তু এ অভিযানেও ফিরোজ শাহকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। সেকেন্দার শাহ দুর্ভেদ্য

একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। সন্ধির চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের উপর সেকেন্দার শাহের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ (১৩৬৯ খৃস্টাব্দে নির্মীত) সেকেন্দার শাহের একটি অদ্বিতীয় কীর্তি। উপমহাদেশে নির্মীত মসজিদসমূহের মধ্যে দিল্লীর জামে মসজিদের পর এর স্থান। দেওকোটের (বর্তমান গঙ্গারামপুর) মওলানা আতার মাযারেও তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর সমসাময়িক পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আলেম ও সূফী শায়খ আলাউল হকের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

শেষ জীবনে বিদ্রোহী কনিষ্ঠ পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। ১৩৯১ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ লাখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তিনি যেমন জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন তেমনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। কুড়ি বছরের রাজত্বকালে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারেননি কিন্তু রাজ্য শাসনে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী আইনের প্রয়োগ কি পরিমাণ হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও দেশে যে ইসলামী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আইনের সামনে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং একজন সামান্য বিধবার মধ্যে যে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না বিভিন্ন ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত তাঁর রাজত্বকালের একটি ঘটনা 'রিয়াযুস সালাতীন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ একদিন তীর ছোঁড়া অভ্যাস করার সময় সুলতানের একটি তীর ঘটনাক্রমে এক বিধবার ছেলেকে আহত করে। বিধবা কাযী সিরাজুদ্দীনের কাছে এর প্রতিবিধান করার জন্য ফরিয়াদ জানায়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল কাযী পেয়াদার হাত দিয়ে সুলতানের কাছে সমন পাঠান। পেয়াদা সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছে সহজ পথে সুলতানের কাছে সমন নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় দেখে প্রাসাদের মসজিদে আযান দিতে থাকে। অসময়ে আযান দেবার কারণে তাকে ধরে নিয়ে সুলতানের কাছে হাজির করা হয়। সেখানে সে সুলতানকে কাযীর সমন দেয়। কাযীর তলব পেয়ে সুলতান কালবিলম্ব না করে নিজের ক্ষুদ্র তরবারিটি বগলের নিচে লুকিয়ে রেখে কাযীর আদালতে হাজির হন। কাযী তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিধবার ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দেন। সুলতান কাযীর নির্দেশ পালন করেন এবং বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

তখন কাযী সুলতানকে সমাদর করে মসনদে বসান। সুলতান বগলের নিচ থেকে তরবারি বের করে বলেন, "কাযী, পবিত্র আইনের বিধান অনুযায়ী আমি আপনার আদালতে হাজির হয়েছি। আপনি যদি ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে আইনের এক চুল ব্যতিক্রম করতেন তাহলে আমি এ তরবারি দিয়ে আপনার শিরশ্ছেদ করতাম।" কাযী মসনদের নিচ থেকে বেত বের করে বললেন, "যদি আজ আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র পবিত্র আইনের বিধান মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম করতে দেখতাম তাহলে এ বেতের আঘাতে আপনার পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করতাম।" সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে কাযীকে উপহার দিয়ে ফিরে আসেন।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে কুরআনিক 'আদল' কায়েমের এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বস্তুত চতুর্দশ শতকের মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ ধারা তখনও অপরিবর্তিত ছিল। তবে ১৪০৬ খৃস্টাব্দের চৈনিক পরিব্রাজক মা-হুয়েন তার 'য়িঙ্গ-য়াই-শেঙ্গ-লান' গ্রন্থে তদানীন্তন বাংলায় নারিকেল, ধান, তাল ও কাজঙ্গ (সম্ভবত দ্বাদশ শতেকর চর্যাপদসমূহে উল্লিখিত কঙ্গুচিনা) থেকে উৎপন্ন মদ প্রকাশ্যভাবে বিক্রির কথা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, রাজধানীতে প্রকাশ্যে সঙ্গীত চর্চা হতো, পেশাদার গায়কদলও ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায়, দেশে ইসলামী বিধান প্রচলনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি শৈথিল্য বর্তমান ছিল।

সূফী মুজাফফর শাম্‌স বলখীর সাথে গিয়াসুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাজ্য শাসন ব্যাপারে তিনি বল্‌খীর বহু পরামর্শ মেনে চলতেন বলে জানা যায়। তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ আলেম ও মধ্যযুগীয় বাংলার ইসলামী চেতনার দিশারী হযরত শাহ্ নূর কুত্‌বে আলম ছিলেন তাঁর একান্ত সুহৃদ ও সহপাঠী। পঞ্চদশ শতকের আরবী পণ্ডিত আবদুর রহমান আস্ সাখওয়ারের বর্ণনা মতে, গিয়াসুদ্দীন বহু অর্থ ব্যয়ে মক্কার 'উম্মেহানী ফটকে' এবং মদীনার 'শান্তির ফটকে' দু'টি মাদ্রাসা নির্মাণ করান। মক্কার মাদ্রাসাটি নির্মাণ করতে বার হাজার মিসরী মিসকাল স্বর্ণ লেগেছিল। এ ছাড়াও তিনি মক্কাতে একটি সরাইখানা নির্মাণ ও আরাফাতে একটি খাল খনন করান বলে কাযী কুতুবুদ্দীন হানাফী বিলগ্রামী রচিত 'তারিখে মক্কা' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। মক্কার মাদ্রাসা ও সরাইখানার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি এ দু'টি প্রতিষ্ঠানকে বহু মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। মক্কা শরীফ ও মক্কা-মদীনার প্রতিটি লোকের জন্য তিনি উপহার স্বরূপ বহু অর্থ প্রেরণ করেন। গিয়াসুদ্দীন চীন সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজ্য শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য হিন্দুদেরকে বড় বড় রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। এভাবে তাঁর দরবারে হিন্দু অমাত্যদের প্রভাব বেড়ে যায়।

এ ধরনের এক অমাত্য ভাতুড়িয়ার (দিনাজপুর) জমিদার গণেশ বা কংসের চক্রান্তে ১৪১০ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন।

---

১. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।
২. সম্ভবত জাজনগর বা উড়িষ্যার কোনো একটি এলাকা। কেউ কেউ একে উড়িষ্যার মান্দারণ বলে দাবি করেছেন।
৩. কৈলাস চন্দ্র সিংহ—ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, প্রকাশকাল, ১৮৭৬ খৃ., ১১—১২ পৃষ্ঠা।
৪. যদুনাথ সরকার—The History of Bengal, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচারের এ পর্যায়টি পঞ্চদশ শতকের শুরু থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ অবধি প্রায় তিন'শ বছর ধরে চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলিম রাজশক্তি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি বাংলার বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এদিকে বিদেশাগত মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল না। এ দু'য়ের সংমিশ্রণে একটি শক্তিশালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। কাজেই তৃতীয় পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকদের পথ ছিল তুলনামূলকভাবে সুগম। কিন্তু তবুও তাঁদেরকে বহুস্থানে অমুসলিম শক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

শাহ নূর কুত্‌বুল আলম

বাংলাদেশের ইতিহাসের একজন অনন্য সাধারণ পুরুষ ছিলেন হযরত শাহ নূর কুত্‌বুল আলম। তিনি কেবল তদানীন্তন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও সূফী ছিলেন না বরং একই সঙ্গে তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতা। পাণ্ডুয়ার শায়খ আলাউল হক পরিবারের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর আমলেই মুসলিম বাংলা বৃহত্তম রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। একজন মর্দে মুজাহিদের ন্যায় তিনি এ সংকটের মুকাবিলা করেন এবং যথাসময়ে মুসলিম জাতির সঠিক নেতৃত্ব দান করে ইসলামের অগ্রগতির পথে প্রকাণ্ড বাধা দূর করেন। এ জন্য তাঁকে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বস্তুত প্রায় দেড়শ বছর ধরে তাঁর পরিবার বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব দান করে এ দেশে ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ সুগম করে।

শাহ নূর কুত্‌বুল আলম ছিলেন গৌড়ের ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের (রাজত্বকাল ঃ ১৩৯৮–১৪১০ খৃ.) সহপাঠী ও বন্ধু। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরিবর্তিত ছিল। সুলতান তাঁর মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিভিন্ন পরামর্শ মেনে চলতেন। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনা মতে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্মের পূর্বে বা পরে তাঁর পিতা তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ আলেম ও সূফী শায়খ আলাউল হকের বাংলার বাইরে বসবাসের কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। কাজেই আমাদের মতে পিতৃগৃহ পাণ্ডুয়ায় তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। যোধপুরের কাযী হামিদুদ্দীন কুঞ্জনশীন নাগোরী (১২৫৬–১৩৬০ খৃ.) ছিলেন তাঁর উস্তাদ। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে ১৩৫০ খৃস্টাব্দের পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। উস্তাদ হামিদুদ্দীন নাগোরীর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরও পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর পরবর্তী জীবন গড়ে ওঠে। পুত্রকে যথাযথভাবে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য পিতার চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ জন্য ভোগ-বিলাসের জীবন থেকে দূরে তাঁকে কৃচ্ছ্রসাধনার জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। পিতা পরিচালিত খানকাহ-সংশ্লিষ্ট লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। ফকীর, ভিখারী, মুসাফিরগণের কাপড় ধোয়া, তাদের ওযু-গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানকার মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তৎসংলগ্ন পায়খানা সাফ করা প্রভৃতি কাজ তাঁকে নিজের হাতে করতে হতো। দূরবর্তী বন থেকে লঙ্গরখানার জন্য প্রতিদিন জ্বালানি কাঠও তাঁকে সংগ্রহ করে আনতে হতো। কথিত আছে, একদিন এভাবে জ্বালানি কাঠ বহন করে আনার সময় পথে তাঁর ভাই আযম খাঁর সাথে দেখা হয়। তাঁর এ ভাই আযম খাঁ গৌড়ের সুলতানের অধীনে একজন মন্ত্রী ছিলেন। কুতবুল আলমের কষ্ট দেখে ভাই আযম খাঁ তাঁকে এহেন মজুরের কাজ ত্যাগ করে তাঁর অধীনে কোনো সম্মানজনক চাকরি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করার লোভনীয় প্রস্তাব তিনি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন।

এভাবে সেবা, নির্লোভ জীবন যাপন ও আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত আনুগত্যের মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্ম সাধনার খ্যাতি বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করার জন্য বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী জ্ঞান-পিপাসুরা পাণ্ডুয়ায় সমবেত হতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর মাদ্রাসা ও খানকাহ বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান অনুশীলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সোনারগাঁওয়ের হযরত শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার মাদ্রাসার ন্যায় পাণ্ডুয়ার হযরত শাহ্ নূর কুত্‌বুল আলমের এ মাদ্রাসাটিও তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। মানিকপুরের শায়খ হুসামুদ্দীন, লাহোরের শায়খ কাকু, আজমীরের শায়খ শামসুদ্দীন, তাঁর দুই ছেলে শায়খ বরকতউদ্দীন ও শায়খ আনওয়ার এবং পৌত্র শায়খ জাহিদ পাণ্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর এ শিক্ষায়তনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অধীনে একটি মাদ্রাসা, একটি খানকাহ, একটি লঙ্গরখানা ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে এ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য সুলতান হোসেন শাহ্ অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন বলে জানা যায়।

ইতিপূর্বে বলেছি, সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ছিল এবং রাজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সুলতান তাঁর পরামর্শও নিতেন। এভাবে প্রকারান্তরে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ আত্মিক উৎকর্ষ ও নিঃস্বার্থ জনসেবামূলক কার্যক্রমের কারণে মুসলিম জনতা তাঁকে নিজেদের যথার্থ পরিচালক ও নেতা মনে করতো। কাজেই সামাজিক ও জাতীয় সংকট মুহূর্তে জনগণ তাঁর কাছ থেকেই যথার্থ নেতৃত্বের আশা করতো। তাই সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মৃত্যুর মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বৃহত্তম সংকট দেখা দিল তার সমাধানে তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে এলেন এবং একজন মর্দে মুজাহিদের ন্যায় এ সংকটের মোকাবিলা করে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানের জীবন ও সম্ভাবনাকে রাহু মুক্ত করলেন।

ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আমলে কতিপয় হিন্দু সভাসদকে বড় বড় রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। মুজাফ্ফর শামস বল্খী ও শাহ নূর কুত্বুল আলম এ ব্যাপারে যথাসময়ে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ এ নীতি অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসনামলের শেষের দিক থেকেই হিন্দু অমাত্যরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে ওঠে। গিয়াসুদ্দীন স্বয়ং এ চক্রান্তের শিকার হন। গিয়াসুদ্দীনের অমাত্য ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ বা কংস নারায়ণ ছিলেন এ চক্রান্তের মূল পরিকল্পক ও পরিচালক। কাজেই গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর পরবর্তী তিনজন ইলিয়াস শাহী সুলতান মূলত গণেশের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ফলে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মৃত্যুর মাত্র চার বছর পর আমরা গণেশকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁকে রাজা কংস বা গণেশ নামে অভিহিত করেছেন। সাম্প্রতিককালের হিন্দু ঐতিহাসিকগণ তাঁকে দনুজ মর্দন দেব নামেও চিহ্নিত করেছেন। সম্ভবত সিংহাসন লাভের পর তিনি দনুজ মর্দন দেব (দৈত্য দলনকারী) নাম গ্রহণ করেন।

১৪১৪ খৃস্টাব্দে রাজা গণেশ এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করলে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। প্রায় দু' শতাব্দীকাল থেকে রাজ্যহারা বর্ণ হিন্দুদের পুঞ্জীভূত আক্রোশ রাজা গণেশের শাসন দণ্ডের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত শাহ নূর কুত্বুল আলম ও আশরাফ সিমনানীর পত্রাবলী এবং গোলাম হোসাইন সলীম রচিত রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থ থেকে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারা যায়। রিয়াযের বর্ণনা মতে

রাজা গণেশ মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক আলেম ও দরবেশকে হত্যা করেন। বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাকে সালাম না করার কারণে শায়খ বদরুল ইসলামকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন এবং অন্যান্য বহু আলেমকে নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। রাজা গণেশের অত্যাচারে ধৈর্যহারা হয়ে হযরত নূর কুত্‌বুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে বাংলা রাজ্য আক্রমণ করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। নূর কুত্‌বুল আলমের পত্র পেয়ে ইবরাহীম শর্কী দ্রুতগতিতে সৈন্য পরিচালনা করে ফিরোজপুর (পুরাতন মালদহ) এসে শিবির স্থাপন করেন।

এদিকে ইবরাহীম শর্কীর সেনাবাহিনী গৌড়ের অদূরে পৌঁছে গেছে শুনে রাজা গণেশ বিপদ গণলেন। নিরূপায় হয়ে তিনি হযরত নূর কুত্‌বুল আলমের সম্মুখে গিয়ে এ বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। নূর কুত্‌বুল আলম তাঁকে জানালেন, "একজন অত্যাচারী পৌত্তলিকের জন্য আমি একজন মুসলমান সুলতানের কাছে অনুরোধ করতে পারবো না—বিশেষ করে যিনি আমার ইচ্ছা ও অনুরোধে এসেছেন।" নিরাশ হয়ে রাজা অবশেষে নিজের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু রাজার স্ত্রী তাতে বাদ সাধলেন। তিনি এ বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখলেন। অবশেষে রাজা গণেশ তাঁর বার বছরের ছেলে যদুকে (নামান্তরে জিত্‌মল) ইসলামে দীক্ষিত করে সিংহসানে অধিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিলেন। হযরত নূর কুত্‌বুল আলম রাজা গণেশের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে নিজের মুখ থেকে চিবানো সুপারি বের করে যদুর মুখে দিলেন, অতঃপর তাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করলেন এবং তার নাম রাখলেন জালালুদ্দীন। এ সংবাদ সর্বত্র প্রচার করে তার নামে খুত্‌বা পাঠের নির্দেশ দিলেন। সেদিন থেকে বাংলায় আবার মুসলমানী আইন জারি হলো। হযরত নূর কুত্‌বুল আলমের অনুরোধে অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে সুলতান ইবরাহীম শর্কী সসৈন্য জৌনপুরে ফিরে গেলেন।

সুলতান ইবরাহীম শর্কীর বাংলা ত্যাগ করার পর রাজা গণেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। জালালুদ্দীনকে সরিয়ে নিজেই সিংহাসনে বসলেন এবং সুবর্ণধেনু ব্রতের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে পুনর্বার হিন্দু করলেন। অর্থাৎ সোনার গরু তৈরী করে জালালুদ্দীনকে গরুর মুখের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পশ্চাদ্দিক দিয়ে টেনে বের করা হলো এবং গরুর মূর্তি ভেঙে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। কিন্তু জালালুদ্দীন যেহেতু শাহ নূর কুত্‌বুল আলমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাই তিনি ইসলামের উপর নিজের বিশ্বাস

ত্যাগ করেননি এবং পুনর্বার হিন্দুত্বে প্রবেশের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

অতঃপর রাজা গণেশ পূর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগলেন। এমনকি তিনি নূর কুত্‌বুল আলমের পরিবারের লোকজন, তাঁর চাকর-বাকর ও প্রতিপালিত ব্যক্তিদের উপরও নির্যাতন শুরু করলেন। কুত্‌বুল আলমের পুত্র শায়খ আনওয়ার ও তাঁর পৌত্র শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত করলেন। সেখানে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করা হলো। কথিত আছে, "যেদিন এবং ঠিক যে মুহূর্তে সোনারগাঁও-এর মাটি আনওয়ারের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয় ঠিক সেদিন রাজা গণেশের মৃত্যু হয়।"[১]

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর হযরত নূর কুত্‌বুল আলমের প্রচেষ্টায় যদুকে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ যে ইসলামের একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর আমলে এ দেশে ইসলাম যে অধিকতর বিস্তৃত হয়েছিল ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা অবশ্যই আলোচনা করবো।

জালালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণের পর শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁও থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং সুবর্ণধেনু ব্রতে অংশগ্রহণকারী ব্রাহ্মণদেরকে শাস্তি দেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পরও নূর কুত্‌বুল আলম বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তাজকিরার বর্ণনা মতে তিনি ১৪৪৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। 'আইন-ই-আকবরী'র মতে ১৪০৫ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আইনের মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ ১৪০৫ খৃস্টাব্দের বহু পরে রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেন। 'মিরআতুল আসরার' নামক ফার্সী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ৮১৮ হিজরীর (১৪১৫ খৃ.) ৯ যিলকদ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্লকম্যান মৃত্যুর তারিখ নির্দেশক একখানা শিলালিপিতে উৎকীর্ণ শব্দাবলীর সাংখ্যিক মান ৮৫১ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই ৮৫১ হিজরীকে (১৪৪৭ খৃ.) তাঁর মৃত্যু সন ধরলে তাজকিরার বর্ণনাই সঠিক প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ তিনি ১৪৪৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ও তাঁর পুত্র আহমদ শাহ উভয়ই হযরত শাহ্ নূর কুত্‌বুল আলমের শাগরিদ ছিলেন, এ কথা বিবেচনা করলে ১৪৪৭ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যু-তারিখ হিসাবে মেনে নেয়াই সঙ্গত মনে হয়।

তাঁর শাগরিদ ও ছাত্রবৃন্দ বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। তাঁর দুই পুত্র শায়খ বরকত উদ্দীন ও শায়খ আনওয়ার শহীদ এবং এক পৌত্র শায়খ জাহিদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

শায়খ আনওয়ার শহীদ ও শায়খ জাহিদ

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও অগ্রগতিতে কুতবুল আলম পরিবারের দান অতুলনীয়। বাংলাদেশে ইসলামকে একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পরিবার তার সর্বস্ব দান করেছে। এ পরিবারের দু'জন নিঃস্বার্থ ইসলামসেবী শায়খ আনওয়ার শহীদ ছিলেন হযরত শাহ নূর কুতবুল আলমের দ্বিতীয় পুত্র এবং শায়খ জাহিদ ছিলেন তাঁর প্রথম পুত্র শায়খ বরকত উদ্দীন বা রিফাত উদ্দীনের পুত্র। তাঁরা উভয়েই নূর কুতবুল আলমের শিষ্য ছিলেন। দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে গিয়েই তাঁরা রাজা গণেশের বিরাগভাজন হন। হযরত শাহ নূর কুতবুল আলমের প্রচেষ্টায় প্রথমবার সিংহাসন-চ্যুত হবার পর প্রতারণা ও কূট-কৌশলের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার সিংহাসন লাভ করেই রাজা গণেশের প্রতিশোধ স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। কুতুব পরিবারের দুই মর্দে মুজাহিদকে তিনি পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করেন। রিয়াযের বর্ণনা থেকে জানা যায়, শায়খদ্বয়ের সোনারগাঁওয়ে পৌছার পর রাজা গণেশের লোকেরা তাঁদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালাতে থাকে। তারা তাঁদের কাছ থেকে লুকানো সম্পদের সন্ধান নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আসলে কোন লুকানো সম্পদের সন্ধান তাঁদের জানা ছিল না। কাজেই নিরাশ হয়ে তারা প্রথমে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করে। ১৪১৮ খৃস্টাব্দে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। অতঃপর যখন তারা শায়খ জাহিদকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন তিনি বলেন, একটি গ্রামে একটি বৃহৎ কড়াই লুকানো আছে। মাটি খুঁড়ে তারা মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ কড়াই দেখতে পায়। তারা জিজ্ঞেস করলো, "বাকী কি হল ?" জাহিদ বললেন, "কেউ চুরি করেছে বলে মনে হয়।" এ ঘটনাটি একটি অলৌকিক ব্যাপারের ফল বলে জানা যায়।[২] ইত্যবসরে গৌড়ে অত্যাচারী রাজা গণেশের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন।

জালালুদ্দীন সিংহাসনে বসার পর শেখ জাহিদকে সোনারগাঁও থেকে ফিরিয়ে আনেন। সুলতান তাঁর প্রতি সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন।[৩] হযরত শাহ নূর কুতবুল আলমের ইন্তিকালের পর প্রকৃতপক্ষে শায়খ জাহিদই পাণ্ডুয়ার আলেম সমাজের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। ১৪৫৫ খৃস্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও তখনও দেশের কোন কোন স্থানে হিন্দু সামন্ত ও জমিদারদের

প্রভাব অপরিবর্তিত ছিল। মুসলিম আলেম ও সূফীগণ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে এসব সামন্ত ও জমিদারদের চক্ষুশূল হন এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। দিনাজপুরের উত্তরাংশে চিহিল গাজীর ইসলাম প্রচার প্রচেষ্টা এরই একটি অধ্যায়। দিনাজপুর জেলায় এ চিহিল গাজীর মাযার আছে। 'চিহিল গাজী' অর্থ চল্লিশ জন জিহাদকারী। বিদেশ থেকে যেসব ইসলাম প্রচারক উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচার করতে আসেন এক সময় তাঁদের মধ্য থেকে চল্লিশ জন আলেম ও দরবেশ দিনাজপুরের উত্তরাংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ তাঁদের ইসলাম প্রচারকে সুনজরে দেখতে পারেননি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁদেরকে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এ সংঘর্ষে তাঁরা জয়ী হন। তাঁদের দলের নেতা ছিলেন হযরত শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী। অন্যান্য দরবেশের নাম এখনও অজ্ঞাত। এ চল্লিশ জন ইসলাম প্রচারককে একই স্থানে পরপর কবরস্থ করা হয় বলে মনে হয়। এ জন্য সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে, চিহিল গাজী একজন দরবেশের নাম। দিনাজপুরে তাঁদের সমাধি থেকে ওয়েস্টমেকট সাহেব সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৪৬০ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ এ শিলালিপিটি থেকে জানা যায় যে, পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে চল্লিশজন গাজী এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

এছাড়াও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে গোরা সাইয়েদ সাহেব, পীর মানিক জাহান, হযরত বালা শহীদ, গোরা শহীদ সাহেব, মওলানা আফতাবুদ্দীন কুতুব, শায়খ সিরাজুদ্দীন আউলিয়া, হুসাইন মুরিয়া বাগদাদী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁদের জীবন কাহিনী ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত বিবরণ জানা যায়নি।

মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী

শায়খ আলাউল হক পাণ্ডুয়ায় যে মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেছিলেন মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী ছিলেন সেখানকার একজন সুযোগ্য ছাত্র। কথিত আছে, তিনি মধ্য এশিয়ার এক রাজ বংশের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানলাভ ও অধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ্যে সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে বের হন। অবশেষে হিন্দুস্তানে এসে বাংলার শায়খ আলাউল হকের খ্যাতি শুনে পাণ্ডুয়ায় চলে আসেন এবং শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বহু বছর এখানে অবস্থান করে অধ্যাত্ম জ্ঞান-শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। শায়খ

আলাউল হকের মৃত্যুর পর তিনি জৌনপুরে চলে যান। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর দরবারেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি ইবরাহীম শর্কীকে উদ্বুদ্ধ করেন। সম্প্রতি নূর কুতবুল আলম ও আশরাফ সিমনানীর পত্রাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, নূর কুতবুল আলম সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে গৌড় আক্রমণ করতে অনুরোধ করলে সুলতান আশরাফ সিমনানীর পরামর্শ চান।

এ থেকে অনুমান করা যায়, বাংলার বাইরে অবস্থান করলেও বাংলার ও বাংলার মুসলমানদের সমস্যার সাথে তিনি নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। জৌনপুরে এ বিখ্যাত আলেম ও সূফীর মৃত্যু হয় এবং সেখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত।

শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ

শায়খ আলাউল হকের আর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ। দীর্ঘদিন উস্তাদের সাহচর্যে থাকার পর তিনি তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত পূর্ণিয়ায় তাঁর মাযার অবিস্থত। বাংলায় অবস্থানকালে তিনি ও তাঁর পুত্র বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ অপরাধে রাজা গণেশ তাঁর পুত্রের প্রাণনাশ করেন। সম্ভবত এ সময়ই তিনি গৌড় ত্যাগ করে পূর্ণিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হন। যুক্কার পোশ অর্থ ধূলি ধূসরিত। সম্ভবত তিনি অতি সাধারণ ও দরিদ্র জীবন যাপন করতেন বলে এই উপাধিতে ভূষিত হন।

শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ

শায়খ বদরুল ইসলাম গৌড়ের একজন সর্বজনমান্য আলেম ছিলেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। যার ফলে রাজা গণেশ তাঁর প্রতি রুষ্ট হন ও তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থে তাঁর উপর রাজা গণেশের নির্যাতন সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। একদিন শায়খ মুঈনুদ্দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম রাজা গণেশকে সালাম না করেই তার সামনে বসেছিলেন। রাজা গণেশ রুষ্ট হয়ে তাঁকে সালাম না করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে শায়খ বললেন, "আলেমদের পক্ষে পৌত্তলিকদেরকে সালাম করা শোভনীয় নয়–বিশেষ করে তোমার মতো নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু বিধর্মীর, যে মুসলমানদের রক্তপাত করছে।" শায়খ

বদরুল ইসলামের এ নির্ভীক জবাবে রাজা গণেশ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। কিন্তু তার করার কিছু ছিল না। একদিন রাজা একটি নিচু ও সংকীর্ণ দ্বার বিশিষ্ট কক্ষে বসে শায়খকে ডাকলেন। শায়খ সেখানে পৌঁছে রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রথমে পা ঘরের মধ্যে রেখে পরে মস্তক নত না করেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজা গণেশ ক্রোধান্ধ হয়ে শায়খ বদরুল ইসলামকে তাঁর ভাইদের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ শায়খকে হত্যা করা হলো এবং অন্য আলেমদেরকে নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হলো।[৪]

হযরত আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানীও জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর কাছে লিখিত পত্রে এ শহীদ আলেমদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

শাহ ইসমাইল গাজী

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ার গ্রামে এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার গড় মান্দারণে শাহ ইসমাইল গাজীর মাযার বর্তমান। বাংলাদেশের মুজাহিদ সূফীগণের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সেনাপতি। রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে অবস্থিত তাঁর মাযারের খাদিমের কাছে রিসালাতুশ্ শুহাদা নামক (১৬৩৩ খৃ.) ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এ গ্রন্থে ইসমাইল গাজীর জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শাহ ইসমাইল গাজী মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ বংশজাত ছিলেন। শৈশব থেকেই বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করে তিনি বিবিধ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অবশেষে ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে একদল সঙ্গী-সাথীসহ তিনি প্রাচ্য দেশসমূহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৫–১৪৭৪ খৃ.) তিনি লাখনৌতি নগরে আগমন করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সুলতানের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে তিনি একটি জনহিতকর কাজ করে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। লাখনৌতি নগরের উত্তর দিকে ছুটিয়া পটিয়া নামক একটি নদী বা জলাভূমি ছিল। বর্ষাকালে এ জলাভূমিটি পানিতে ভরে যেতো এবং বন্যায় লাখনৌতি প্রদেশের যথেষ্ট ক্ষতি হতো। বরবক শাহের রাজত্বকালে এ নদী বা জলাভূমির চতুর্দিকে বাঁধ দেবার বহু চেষ্টা হয়। কিন্তু কোনো চেষ্টাই ফলবতী হয়নি। ইসমাইল গাজী ছুটিয়া পটিয়ার উপর সেতু নির্মাণ করে প্রদেশবাসীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান তাঁকে গাজী উপাধিতে ভূষিত করে পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজাদের দমন করতে পাঠান।

রিসালাতুশ্ শুহাদার বর্ণনা মতে উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে পরাজিত করে ইসমাইল গড় মান্দারণ দুর্গ দখল করেন। অতঃপর তিনি কামরূপের রাজা কামেশ্বরকেও পরাজিত করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে সম্ভবত মান্দারণ তৎকালে উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশীয় রাজাগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ইসমাইল কর্তৃক পরাজিত কামেশ্বর ছিলেন সম্ভবত কামতাপুরের রাজা। কারণ আসামের আহম-বংশীয় রাজাদের ইতিহাসে কামেশ্বর নামে কোনো রাজার নাম পাওয়া যায় না।[৫] অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ইসমাইল গজপতি বংশীয় উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের কোনো সৈন্যাধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করে মান্দারণ দুর্গ জয় করেন। মান্দারণ তৎকালে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কপিলেন্দ্র দেব তা জয় করেন।[৬] রিসালার বর্ণনা থেকে জানা যায়, কামরূপের রাজা ইসমাইল গাজীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

উপর্যুপরি এ সব বিজয়ের কারণে সুলতান সম্ভবত তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে তাঁর সহজাত মানবিক গুণাবলী ও নিঃস্বার্থ ইসলাম সেবা ও ইসলাম প্রচার অভিযান স্বভাবতই ইসলাম প্রিয় ও সুপণ্ডিত সুলতান বরবক শাহকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রতি সুলতানের এ আকর্ষণ অনেকের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুলতানের এক হিন্দু সেনাপতি ঘোড়াঘাটের সীমান্ত দুর্গাধ্যক্ষ ভান্দসী রায় স্বজাতীয়গণের ধর্মান্তর গ্রহণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ সময় ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করেন। তিনি সুলতানকে সংবাদ দেন যে, ইসমাইল গাজী কামরূপের পরাজিত ও পার্বত্য অঞ্চলে শিবির জীবনযাপনকারী রাজার সাহায্যে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সুলতান হিন্দু সেনাপতির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে শাহ ইসমাইল গাজীর শিরশ্ছেদ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। সৈন্যগণ সুলতানের হুকুম পালন করলো। ৮৭৮ হিজরীর শাবান মাসের ১৪ তারিখে (১৪৭৪ খৃ.) বাংলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ এভাবে শাহাদত বরণ করেন। শোনা যায়, তাঁর কর্তিত মস্তকটি রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার গ্রামে ও মস্তকবিহীন ধড়টি হুগলী জেলার গড় মান্দারণে সমাহিত করা হয়। সুলতান পরে ভান্দসী রায়ের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে যারপরনাই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন।

খান জাহান আলী

যশোহর ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামী সমাজ-বিধি প্রবর্তনে হযরত উলুগ খান-ই-জাহান বা খান জাহান আলীর

নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এ দুই জেলায় ব্যাপক প্রচলিত জনশ্রুতি এবং বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই এ এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন শিষ্য-শাগরিদকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

খুলনা জেলার বাগেরহাটে তাঁর সমাধি অবস্থিত। সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্‌র এক নগণ্য দাস, বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ-প্রত্যাশী, রসূলে করীম (সা)-এর বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলেমগণের বন্ধু, বিধর্মী মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী উলুগ্‌-খান-ই-জাহান (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) হিজরী ৮৬৩ সালের ২৬ যিলহজ্জ বুধবার রাত্রে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে জান্নাতগামী হন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সমাহিত হন।" শিলালিপিতে উল্লিখিত তারিখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৪৫৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন ছিল গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭–১৪৫৯ খৃ.) আমল। এ আমলেই হযরত খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন এবং এ সমগ্র এলাকার শাসনভার লাভ করেন। পয়গ্রাম কসবাতে তাঁর রাজধানী ছিল। কাজেই তিনি যে তদানীন্তন বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর ধর্মপ্রাণতা, সততা, জনসেবা ও চরিত্র-মাধুর্য এ অঞ্চলের জনগণের ওপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র একজন যথার্থ অনুগত বান্দা এবং সূফী ও দরবেশ মনে করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণের সামনে তিনি নিজেকে একজন যথার্থ মুসলমান হিসাবে তুলে ধরেন এবং জনগণের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে জনগণের সেবক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণের হিতার্থে তিনি এলাকায় বহু রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, অসংখ্য দীঘি খনন এবং বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মাণ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনগণ তাঁর দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে, তাঁর অনুকরণে তারাও বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের জনসেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেয়।

যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খান জাহান আলী প্রথমে এখানকার অতি প্রাচীন নগরী বারোবাজারে আগমন করেন। এখানে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন এবং ইসলামী ইবাদতের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য গড়ে তোলেন

একটি সুরম্য মসজিদ। এ মসজিদটি এখনও বর্তমান আছে।[৭] এ ধরনের মসজিদ বারোবাজার থেকে বাগেরহাটের পথে তিনি বেশ কয়েকটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বারোবাজার মূলত উত্তর বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্ধনের ন্যায় নিম্ন বঙ্গের বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। হযরত খান জাহান আলী যখন এখানে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রচার মাহাত্ম্যে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দুর মনে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানদের নামানুসারে এখানে গড়ে ওঠে কয়েকটি গ্রাম। মুরাদগড়, সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর ও রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম তার পরিচয় বহন করছে।[৮] বারোবাজার থেকে তিনি যশোহরের কয়েকটি স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের শাগরিদদের প্রেরণ করেন। এঁদের মধ্যে বাহরাম শাহ ও গরীব শাহ অন্যতম। তাঁর অন্য শাগরিদদের মধ্যে বুড়া খাঁ, ফতেহ খাঁ, মোহাম্মদ তাছির ওরফে পীর আলী, মীর খাঁ, চাঁদ খাঁ, এখতিয়ার খাঁ, মেহের উদ্দীন, বখতিয়ার খাঁ, পীর জয়ন্তী ও আলম খাঁর নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে বুড়া খাঁ ও ফতেহ খাঁ খানপুর ও বিদ্যানন্দকাঠি অঞ্চলে বহু অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। আমাদি গ্রামে তাঁরা একটি গুম্বজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি আজও বিদ্যমান আছে।

তাঁর অন্যতম প্রধান শাগরিদ পীর আলী পূর্বে হিন্দু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় মোহাম্মদ তাছির। তিনি বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে ইসলামে দীক্ষিত করেন বলে জানা যায়। তিনি যেসব ব্রাহ্মণকে ইসলামে দীক্ষিত করেন তারা এখনও এতদঞ্চলে পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়ে আসছে।[৯] মাগুরার পীর-জয়ন্তীও পূর্বে হিন্দু ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

মূলত যশোহর ও খুলনার সমগ্র এলাকা ছিল খান জাহান আলীর কর্মস্থল। এ দুই জেলায় তিনি ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন। বাগেরহাট শহরটি তাঁরই নির্মীত এবং তিনি তার নামকরণ করেন খলীফতাবাদ। বাংলার সুলতানদের মধ্যে একমাত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ-ই খলীফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকায় প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরীর (১৪৫৭ খৃ.) একটি শিলালিপিতে এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের কয়েকটি মুদ্রাতে তাঁকে খলীফা উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। সম্ভবত সুলতানের এ উপাধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত শহরের খলীফতাবাদ নামকরণ করেন। বাগেরহাটের সুরম্য ষাট-গম্বুজ মসজিদ তাঁর একটি মহান কীর্তি। বস্তুত বাংলার এ দক্ষিণাংশে ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কৃতিত্বের সিংহভাগই যে হযরত খান জাহান আলীর প্রাপ্য তাতে সন্দেহ নেই।

খালাস খান

কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে সুন্দরবনের বেদকাশী নামক স্থানটিকে খালাস খান নিজের ইসলাম প্রচার কেন্দ্র রূপে বেছে নিয়েছিলেন। তখন যশোহর জেলা ও সুন্দরবনের এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত এসে পৌছেনি। তিনিই এ অঞ্চলে প্রথম ইসলাম প্রচারক। সম্ভবত তাঁর আগে বা সমসময়ে যশোহর জেলার অন্যান্য অঞ্চলে বড় খান গাজী ও খান জাহান আলীর আবির্ভাব হয়েছিল। তুর্কী সুলতানদের রাজত্বকালে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর আগমনকালের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বেদকাশী গ্রামে খালাস খাঁ দীঘির পাড়ে একটি প্রাচীন কালীমঞ্চের কাছে খালাস খাঁর মাযার অবস্থিত। দীঘি খনন করা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনিও খান জাহান আলীর ন্যায় জনহিতকর কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অভিযান চালিয়েছিলেন। কোন রাজশক্তির সহায়তা ছাড়াই পৌত্তলিকতার অবসান করে এ অঞ্চলকে তৌহীদের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য তাঁকে যে বিপুল সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদী

বাংলার বাইরের যে সকল আলেম বাংলায় এসে ইসলাম প্রচার করেছিলেন কিন্তু শেষ জীবনে বাংলার বাইরে অবস্থান করেছিলেন, বিহারের হযরত বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৪৪০ খৃস্টাব্দে তিনি বিহারে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে তাঁর মাযার অবস্থিত। মওলবী গোলাম নবী খান লিখিত 'মিরআতুল কওনাইন' নামক গ্রন্থ থেকে মওলানা মুহাম্মদ উবায়দুল হক 'তাজকিরায়ে আওলিয়ায়ে বাঙ্গালা' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, হযরত বদরে আলম যাহিদীর পূর্ব-পুরুষ ছিলেন হযরত শিহাব উদ্দীন মক্কী। তাঁর পুত্র হযরত ফখরুদ্দীন পিতার নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানের মিরাঠাবাদে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পৌত্র বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদী মিরাঠাবাদেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত সূফী পরিব্রাজক মখদুম জালালুদ্দীন জাঁহানীয়া জাঁহাগশ্‌ত বুখারীর (১৩০৭-১৩৯৩ খৃ.) বিশেষ দোয়া লাভ করেন এবং বিভিন্ন ইলমে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি পিতার উপদেশ ও বিহারের বিখ্যাত আলেম ও সূফী হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর (মৃত্যু ঃ ১৩৮০ খৃ.) অনুমতিক্রমে তিন-চার'শ দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বাংলায় আসেন এবং চট্টগ্রামের

উপকূলে কেন্দ্র স্থাপন করে ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। পরে তিনি হযরত মানেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ১৩৮০ খৃস্টাব্দে বিহারে গমন করেন। কিন্তু তাঁর বিহার পৌঁছার পূর্বে মানেরীর মৃত্যু হয়। অতঃপর সুদীর্ঘ জীবন যাপন করার পর ১৪৪০ খৃস্টাব্দে তিনি বিহারে ইন্তিকাল করেন।

তাজকিরাতুল আউলিয়ায়ে বাঙ্গালার এ বর্ণনার কারণে কেউ কেউ চট্টগ্রাম বিজয়ী মওলানা বদরুদ্দীন আল্লামা (মৃত্যু ঃ ১৩৫০ খৃ.)–যিনি সাধারণত শাহ্ বদর নামে পরিচিত—ও মওলানা ইসমাইল বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদীকে অভিন্ন করে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামার আলোচনায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। চট্টগ্রাম বিজয়ী শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা ১৩৫০ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে তাঁর মাযার রয়েছে। অন্যদিকে মওলানা বদরে আলম যাহিদী ১৪৪০ খৃস্টাব্দে বিহারে মৃত্যুবরণ করেন। তাজকিরার বর্ণনা মতে অবশ্যই মওলানা বদরে আলম যাহিদী তাঁর তিন-চার'শ সঙ্গী-সাথী সহকারে চট্টগ্রাম এসেছিলেন এবং এখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি।

এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা অঞ্চলে অবস্থান করে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। কালনা শহরে তাঁর আস্তানা আজও সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছে।[১০]

মওলানা বরখুরদার

গৌড়ের তাজ খাঁ নামক জনৈক আমীরের পুত্র মওলানা বরখুরদার পনের শতকের শেষের দিকে স্থায়ীভাবে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আসল নাম জানা যায় না। 'বরখুরদার' উপাধি বিশেষ। এর অর্থ হচ্ছে 'সাহেবজাদা' বা সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্র। সম্ভবত তাঁর পিতা গৌড়ের সুলতানের কোনো উচ্চ পর্যায়ের আমীর বা সভাসদ ছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮১–১৪৮৭ খৃ.) গৌড়ে অবস্থিত তার মাযার প্রাঙ্গণে ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে সৈয়দ রাহাতের পুত্র সৈয়দ দস্তর কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মীত হয়। মাযার সংলগ্ন মসজিদগুলো সাধারণত মাযার নির্মাণের পরপরই বা বহু বছর পর নির্মীত হয়েছে দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায় যে, মওলানা বরখুরদার অন্তত ১৪৮৬ খৃস্টাব্দের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছিলেন এবং পনের শতকের মধ্যভাগে বা শেষের দিকে ইসলাম প্রচারকার্যে রত ছিলেন।

শাহ্ শরীফ জিন্দানী

উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শাহ শরীফ জিন্দানী এক বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। পাবনা জেলার তাড়াশ থানার নওগাঁ গ্রমে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি কোন্ সময় কিভাবে এখানে এসেছিলেন তার সঠিক বিবরণী পাওয়া যায় না। তবে যতদূর অনুমান করা যায়, তিনি উত্তর ভারত থেকে আগত সূফী-দরবেশদের সাথে সংশিষ্ট ছিলেন এবং স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মিলনীতে মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে বহু লোকের সমাগম হয়।

শাহ্ মজলিস

বর্ধমানের কালনা শহরের যে স্থানে হযরত বদরুদ্দীন বদরে আলমের মাযার অবস্থিত, তার থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে শাহ মজলিস নামক জনৈক দরবেশের মাযার অবস্থিত। তাঁর মাযার সংলগ্ন একটি প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃ.) এ শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল। কাজেই স্বভাবতই অনুমান করা যায়, সুলতান হোসেন শাহের আমলে পূর্বেই হযরত শাহ মজলিস এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। অনেকে তাঁকে হযরত বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদীর (মৃত্যু ১৪৪০ খৃ.) সহকর্মী মনে করেন। এ কথা মনে করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ বদরে আলম যাহিদী তাঁর যে তিন-চার'শ সঙ্গী-সাথী সমভিব্যাহারে ইসলাম প্রচারার্থে বাংলাদেশে এসেছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁদের সবাই হযরত যাহিদীর সঙ্গে বিহারে ফিরে যাননি। তাঁদের অনেকেই নিশ্চয়ই এ দেশে রয়ে গিয়েছিলেন। হযরত শাহ মজলিস তাঁদেরই একজন হবেন সন্দেহ নেই। আমাদের এ অনুমান সত্য হলে হযরত শাহ মজলিসকে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের একজন ইসলাম প্রচারক বলে মেনে নিতে হয়।

বাবা আদম

বগুড়ার শান্তাহার থেকে কিছু দূরে আদম দীঘিতে বাবা আদমের দরগাহ অবস্থিত। কতিপয় শিষ্য সহকারে তিনি ইসলাম প্রচারার্থে উত্তর বঙ্গে আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় জনগণের পানির কষ্ট নিবারণ করার জন্য তিনি এ অঞ্চলে একটি দীঘি খনন করেন। তাঁর নামানুসারেই দীঘিটির নাম হয় আদম দীঘি। প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, ইসলাম প্রচারের কারণে তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজ কর্মচারী ও সৈন্যদলের দ্বারা উৎপীড়িত হন।

কেউ কেউ বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ ও বগুড়ার বাবা আদমকে অভিন্ন মনে করেছেন। কিন্তু উভয়কে অভিন্ন মনে করার কোনো নিশ্চিত কারণ এখনও আমাদের হাতে নেই। পূর্ববঙ্গ এলকায় প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বাবা আদম শহীদ সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আসেন। কিন্তু বগুড়ার বাবা আদম সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি স্থলপথে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গে আসেন। অন্তত এ দিকটি বিচার করলে উভয়কে অভিন্ন মনে করা যায় না।

শাহ মান্নাহ্

ঢাকার সোনারগাঁও এলাকায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-স্থলের নিকটবর্তী মগরাপাড়া গ্রামে হযরত শাহ মান্নাহ্র মাযার অবস্থিত। তাঁর মাযার সংলগ্ন একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে ৮৮৯ হিজরীর মহররম মাসে (১৪৮৪ খৃ.) সুলতানের পরিচ্ছদ রক্ষক মুয়াজ্জমাবাদ বা মাহমুদাবাদের উজির ও সর্লস্কর (সেনাবাহিনী প্রধান) এবং সিলেট থানার সর্লস্কর কর্তৃক মাযার প্রাঙ্গণে অবস্থিত মসজিদটি নির্মীত হয়। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, ১৪৮৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে হযরত শাহ মান্নাহ ইন্তিকাল করেছিলেন। তিনি পূর্ব বঙ্গের সোনারগাঁও এলাকায় আগত ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম ছিলেন। ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী নিয়ে তিনি এ এলাকায় এসেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করে এ দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

শাহ জালাল দক্ষিণী

দক্ষিণ ভারতের গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন শাহ জালাল দক্ষিণী। গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের আমলে তিনি বহু শিষ্য-শাগরিদ সমভিব্যাহারে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন। কথিত আছে, তিনি বাদশাহর ন্যায় জাঁকজমক সহকারে বসতেন এবং শাগরিদদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করতেন। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং তাঁর শাগরিদগণের প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে তৎকালীন সুলতান তাঁর বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন। এ সেনাদলের হাতে হযরত শাহ জালাল দক্ষিণী ও তাঁর শাগরিদগণ সবাই নিহত হন। যতদূর জানা যায়, ঢাকা ও সন্নিহিত এলাকায় তিনি ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থ প্রণেতা ও হাকিম হাবিবুর রহমান সাহেবের মতে ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউস (বঙ্গভবন) এলাকার মধ্যে তিনি শাগরিদগণসহ

সমাহিত আছেন।[11] মওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী লিখিত 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি উত্তর ভারতের স্বনামধন্য সূফী শায়খ সলীম চিশতীর বিখ্যাত বাঙালী শাগরিদ শায়খ পিয়ারার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

কোন কোন গ্রন্থে ১৪৭৬ খৃস্টাব্দে সুলতানের সেনাদল কর্তৃক তাঁর নিহত হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[12] এ সময় গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহ। এ ছিল তাঁর রাজ্য শাসনের শেষ বছর। এ বছর তিনি নিজ সুযোগ্য পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে রাজ্য শাসন করেন। তাঁরা পিতা-পুত্র উভয়েই ছিলেন ইসলাম অনুরাগী। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তবে সম্ভবত হযরত শাহ জালাল দক্ষিণীর কোনো শত্রু—যে একসঙ্গে ইসলামের বিস্তৃতি ও অগ্রগতিরও শত্রু ছিল—সুলতানকে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও প্ররোচিত করে তুলেছিল এবং সুলতানও বহুদূরে অবস্থান করার কারণে যথার্থ তদন্ত না করে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে ইতিপূর্বে আমরা প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৪৭৪ খৃস্টাব্দে শাহ ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে ভান্দসী রায়ের চক্রান্ত এবং বরবক শাহ কর্তৃক তাঁর নিহত হবার কথা আলোচনা করেছি। এর ফলে আমাদের এ অনুমান আরো শক্তিশালী হয়।

শায়খ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী

হযরত নূর কুতবুল আলমের সুযোগ্য ও অন্যতম শাগরিদ ছিলেন শায়খ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী। তিনি বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মানিকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নূর কুতবুল আলমের পাণ্ডুয়াস্থ শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করে তিনি সর্ব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর নিয়ম ও শৃংখলার মধ্যে জীবন যাপন করতেন এবং ইসলামী ইবাদত-বন্দেগীর বিভিন্ন ধারা নিয়মিত পালন করে চলতেন। এক সময় তিনি একাধারে সাত বছর রোযা রাখেন। ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর প্রাচুর্য যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে তা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কর্মসূচি গ্রহণ করে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বেছে নেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। তাই ইসলাম প্রচারের জন্য একটি সুদক্ষ ও সুসংগঠিত প্রচারক বাহিনী গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর এ সুসংগঠিত প্রচারক বাহিনীর প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গে ও বিহারে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৪৭৭ সালে মানিকপুরে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর

শাগরিদগণ তাঁর মূল্যবান বাণীসমূহ সংগ্রহ করে 'রফিকুল আরিফীন' নামক একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রাজী হামিদ শাহ ও শাহ সিদু পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাজী হামিদ শাহ ছিলেন মানিকপুরের অধিবাসী। শায়খ হুসামুদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি শায়খের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং ১৪৯৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করে যান। সিদু শাহ ১৫২৬ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

শাহ সুলতান আনসারী ও শাহ আবদুল্লাহ গুজরাটি

বর্ধমানের মঙ্গলকোটে হযরত শাহ মাহমুদ গজনবী ইসলামের যে বীজ বপন করেন পরবর্তীকালের দু'জন ইসলাম প্রচারক তাকে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে শক্তিশালী চারাগাছে পরিণত করেন। তাঁদের একজন ছিলেন হযরত শাহ সুলতান আনসারী। তিনি ১৪৯৪ খৃস্টাব্দে জন্মভূমি মদীনা ত্যাগ করে হিন্দুস্তানে আসেন। প্রথমে মুলতানে ও গুজরাটে কিছুদিন অবস্থান করার পর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলায় আগমন করেন। পশ্চিম বঙ্গের মঙ্গলকোটে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি সেখানে পৌত্তলিক সমাজে তৌহীদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। সমসময়ে দক্ষিণ ভারতের গুজরাট এলাকা থেকে শাহ আবদুল্লাহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকোটে আগমন করেন। সম্ভবত ইতিপূর্বে গুজরাটে শাহ সুলতান আনসারীর সাথে শাহ আবদুল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং শাহ সুলতানের সাহচর্য লাভ করার জন্যই তিনি মঙ্গলকোটে আগমন করেন। শাহ আবদুল্লাহ গুজরাটী গৌড়ের সুলতান নসরত শাহের আমলে (১৫১৯–১৫৩২ খৃ.) মঙ্গলকোটে আগমন করেন বলে জানা যায়। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে তাঁরা পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। দীর্ঘদিন এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পর মঙ্গলকোটে তাঁদের ইন্তিকাল হয় এবং এখানেই তাঁদের সমাধি বিদ্যমান।

হাজী বাবা সালেহ

হাজী বাবা সালেহ্ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ও তাঁর পরবর্তী গৌড়ীয় সুলতানদের আমলে মালিক উপাধিধারী একজন বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন। তিনি নিজের সমগ্র কর্মজীবনে বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচলনের কাজ করে যান। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে যান। জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের আমলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের নিকটস্থ বন্দর নামক স্থানে ৮৮৬ হিজরীর যিলকদ মাসের প্রথম দিবসে

(২ জানুয়ারি ১৪৮২ খৃস্টাব্দে) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের আমলের আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পরবর্তীকালে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৫০৪ খৃস্টাব্দে হাজী বাবা সালেহ আজিমনগর নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সোনারগাঁওয়ে আবিষ্কৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই একই ব্যক্তি ৯১১ হিজরী (১৫০৫ খৃ.) ও ৯১২ হিজরীতে (১৫০৬ খৃ.) সেখানে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫০৬ খৃস্টাব্দে হাজী বাবা সালেহ্ ইন্তিকাল করেন।

মখদুম শাহ্ জহীরুদ্দীন

পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলায় আগত ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে মখদুম শাহ জহীরুদ্দীন অন্যতম। গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-১৫৩২ খৃ.) তিনি বীরভূম জেলায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলামের আলো চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। অন্যান্য বহু ইসলাম প্রচারকের ন্যায় জনসেবাকেই তিনি ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। সেবা ও সহনশীলতার মাধ্যমে তিনি অমুসলিমদের হৃদয়দেশ সত্য ও ন্যায়ের আলোকমালায় উদ্ভাসিত করেছিলেন। পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত অসংখ্য মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বীরভূম জেলার মখদুম নগর নামক স্থানে তাঁর মাযার বিদ্যমান। তাঁর নামেই এই স্থানটির নামকরণ হয়। মখদুম নগরের সমস্ত অধিবাসী তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়।

মুবারক গাজী

সুন্দরবন অঞ্চলের বিশাল কিংবদন্তির নায়ক মুবারক গাজীর প্রভাব এলাকার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মুজাহিদ দরবেশ হিসাবে তিনি সর্বত্র পরিচিত। তাঁর সম্পর্কিত প্রচলিত কিংবদন্তির বেড়াজাল থেকে তাঁর আসল পরিচয়টুকু উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কথিত আছে, বাঘের উপদ্রব থেকে সুন্দরবন এলাকার জনগণকে তিনি রক্ষা করেন। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবে তিনি তাদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারের পথ সুগম করেন। তাঁর হাতে অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত চব্বিশ পরগণা জেলার বাঁশড়া নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত।

একদিল শাহ

চব্বিশ পরগণা জেলার বিপুল পরিমাণ মুসলিম জনবসতির পেছনে যে সব ইসলাম প্রচারকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা কাজ করেছে একদিল শাহ তাঁদের

অন্যতম। এই জেলার বারাসাত অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলার হাবশী সুলতানদের শাসনামলের শেষের দিকে অথবা সুলতান হোসেন শাহের আমলের প্রথম দিকে তিনি এ এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। তাঁর পূর্বে আরো কয়েকজন সাধক এ এলাকায় ইসলামের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি ইসলামের কাফেলাকে আরো শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট করেছিলেন। বারাসাতে তাঁর মাযার অবস্থিত।

শাহ আফজাল মাহমুদ ও গাজী মুহাম্মদ বাহাদুর

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে পাবনা জেলায় ইসলামের দাওয়াত প্রবেশ করেছিল। তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইসলাম প্রচারক এ জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করে গেছেন। হযরত মখদুম শাহ আফজাল মাহমুদ এ সব ইসলাম প্রচারকের অন্যতম। সম্ভবত সুলতানী শাসনামলে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। স্থানীয় কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি এতদঞ্চলের প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার রাঘব রায়ের পুত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর জমিদার পুত্র শায়খ রুকনুদ্দীন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সিরাজগঞ্জের উত্তরে অবস্থিত গুণেরগতি গ্রামের রুকনী সাহেবরা তাঁরই বংশধর বলে পরিচিত। সিরাজগঞ্জ শহরে হযরত শাহ আফজাল মাহমুদের মাযার অবস্থিত।

পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলে আর একজন ইসলাম প্রচারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ছিলেন গাজী শায়খ মুহাম্মদ বাহাদুর। সিরাজগঞ্জের পশ্চিম দিকে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী চান্দপাল গ্রামের পূর্ব সংলগ্ন দীঘিটি তিনি খনন করেছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমানে দীঘিটি মজে গেছে এবং 'গাজী বাহাদুরের দহ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, গাজী বাহাদুর কাবুল থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেন। স্থানীয় বিভিন্ন হিন্দু রাজা বা জমিদার তাঁর ইসলাম প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। তিনি উক্ত হিন্দু রাজা বা জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গাজী বাহাদুর তাঁদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন। গাজী বাহাদুর প্রথমে চান্দপাল গ্রামে বাস করতে থাকেন, অতঃপর প্রচারের সুবিধার জন্য সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী ফুলবাড়ী গ্রামে আবাস স্থাপন করেন। সিরাজগঞ্জ মহকুমার ফুলবাড়ী, বাগডুমুর, নন্দিনা প্রভৃতি গ্রামের শায়খ সাহেবগণ গাজী শায়খ মুহাম্মদ বাহাদুরের বংশধর বলে পরিচিত।

শাহ্ মুয়াজ্জাম দানিশ মন্দ

গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহের আমলে (১৫১৯–১৫৩২ খৃ.) হযরত শাহ মুয়াজ্জাম দানিশ মন্দ বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। কথিত আছে, তিনি বাগদাদের খলীফা হারুনর রশীদের বংশধর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবার সাথে সাথে অধ্যাত্ম জ্ঞানেও উচ্চ আসনের অধিকারী ছিলেন। রাজশাহী জেলায় তিনি নিজের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ জেলায় বাঘা নামক গ্রামে এসে তিনি বসবাস শুরু করেন। তাঁর গুণে ও চরিত্র মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে নিকটবর্তী মখদুমপুর নামক স্থানের প্রভাবশালী জমিদার আল্লাহ বখ্শ বরখুরদার লশকরী নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এরপর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে বাঘায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তিনি একটি মাদ্রাসা ও একটি খানকাহ্ স্থাপন করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জ্ঞান সাধনার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। সুলতান নুসরাত শাহের আমলে নির্মীত বাঘার প্রাচীন মসজিদটি এখনও তাঁর ইসলাম প্রচারের সাক্ষ্য বহন করেছে। তাঁর পুত্র মওলানা হামিদ দানিশ মন্দও একজন উঁচু দরের আলেম ছিলেন। তিনিও সারা জীবন ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বস্তুত রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারে এ পরিবারের দান অপরিসীম। বাঘায় হযরত দানিশ মন্দের সমাধি অবস্থিত।

শাহ্ আলী বাগদাদী

ঢাকা জেলায় আগত ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত শাহ আলী বাগদাদী অন্যতম। ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্র থেকে দশ মাইল উত্তরে মীরপুর শহরতলিতে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর নাম থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। শোনা যায়, তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে এক'শ জন দরবেশসহ দিল্লীতে আসেন। দিল্লী থেকে এসে প্রথমে ফরিদপুরে আস্তানা গাড়েন। অতঃপর সেখান থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং নিজের সঙ্গী-সাথীসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মাযারে প্রাপ্ত একখানি কিতাব থেকে জানা গেছে যে, তিনি ৮৯৫ হিজরী সনে (১৪৮৯ খৃ.) বাংলাদেশে আগমন করেন।[১৩] তিনি দীর্ঘদিন এ দেশে ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর ৯২৩ হিজরীতে (১৫১৭ খৃ.) মীরপুরে ইন্তিকাল করেন। মিঃ এ্যালেন ১৫৭৭ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যুকাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] অন্যদিকে ডঃ এনামুল হক ১৪৮০ খৃস্টাব্দের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করেছেন।[১৫] ডঃ সাহেবের দাবির ভিত্তি হচ্ছে, মাযার সংলগ্ন

মসজিদের শিলালিপি। মাযার সংলগ্ন মসজিদের একটি আরবী শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, ৮৮৫ হিজরীতে (১৪৮০ খৃ.) মসজিদটি নির্মীত হয়। কাজেই হযরত শাহ আলী বাগদাদী ১৪৮০ খৃস্টাব্দের পূর্বে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর মাযার সংলগ্ন মসজিদটি নির্মীত হয়। আমাদের মতে, এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। হযরত শাহ আলী বাগদাদী ১৪৮০ খৃস্টাব্দে নির্মীত এ মসজিদটিতে নিজের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কাজেই মৃত্যুর পর তাঁর মাযার সংলগ্ন নতুন মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়নি।

শায়খ জালাল হাল্‌বী

সিরিয়ার অন্তর্গত হাল্‌ব তথা আলেপ্পো নগরীর এ স্বনামধন্য আলেম ও সূফী ১৪৬২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে তিনি ১৫০৫ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচারের পর ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জালালাবাদ গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর বংশধরগণ আজও জালালাবাদ ও নিকটবর্তী বখতপুর গ্রামে বাস করে আসছেন।

শাহ্ আদম কাশ্মীরী ও শাহ্ জামাল

টাঙ্গাইলের আটিয়া গ্রামে হযরত শাহ্ আদম কাশ্মীরীর মাযার অবস্থিত। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সূফী শায়খ সলীম চিশ্‌তীর শাগরিদ ছিলেন। কথিত আছে, বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে তিনি মোগল সেনাপতি সাঈদ খান পন্নীর সাথে বাংলাদেশে আগমন করেন। চল্লিশজন শাগরিদ ও সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলের আটিয়া ও শেরপুরে কেন্দ্র স্থাপন করেন। সাধারণের মধ্যে তিনি হযরত বাবা নামে প্রসিদ্ধ। হযরত বাবা টাঙ্গাইলের আটিয়া ও শেরপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাবা শাহ্ আদম কাশ্মীরীর ভাগিনা জামাল মামার খোঁজে বহু স্থান ভ্রমণ শেষে টাঙ্গাইলে এসে তাঁর সাক্ষাৎ পান। কিন্তু মামার সাহচর্যে থেকে তিনিও দেশে ফেরার পরিবর্তে হযরত শাহ্ আদম কাশ্মীরীর সাথে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত হন। কাগমারীতে টাঙ্গাইল এলাসিন রাস্তার সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত মাযারটি শাহ্ জামালের মাযার বলে পরিচিত।

জামালপুর শহরের পশ্চিম দিকে শাহ্ জামাল নামক আর একজন দরবেশের মাযার দেখা যায়। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে ইয়ামন দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এলাকায় আগমন

করেন। তিনি জামালপুর শহরে কেন্দ্র স্থাপন করে ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নামেই জামালপুর শহরের নামকরণ হয়। বাবা আদম কাশ্মীরীর ভাগিনা শাহ্ জামাল ও ইয়ামনের শাহ্ জামাল একই ব্যক্তি কিনা তা বলার মতো কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

শাহ্ চাঁদ আউলিয়া

পটিয়া থানার এক মাইলের মধ্যে শ্রীমতী নদীর তীরে শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার মাযার অবস্থিত। পটিয়া থানার মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সবাই তাঁর প্রতি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে।

কথিত আছে, তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং দিল্লীতে আত্মগোপন করে বাস করতেন। দিল্লীর জনৈক শাহাজাদী মনের মত স্বামী সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে ভাগ্য গণনা করার জন্য যান। তিনি শাহাজাদীকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর স্বামীভাগ্য নেই। এতে শাহাজাদী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। শাহাজাদীর ভয়ে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার সর্বপূর্ব প্রান্তে চলে আসেন। এ এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পর তিনি চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়েন। ইতিপূর্বে তিনি যেসব স্থানে অবস্থান করেছিলেন সে স্থানগুলো তাঁর নামে পরিচিত হয়। যেমন মেঘনা পারের চাঁদপুর বন্দর, সীতাকুণ্ডের চাঁদপুর, চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী চাঁদগাঁও এবং পটিয়ার চাঁদখালী। এ সব স্থানের নামকরণ থেকে শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। তিনি যেখানে অবস্থান করতেন সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

শোনা যায়, কিছুদিন পর দিল্লীর শাহাজাদীও তাঁর অনুসন্ধানে লোকজনসহ পটিয়ায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ঘটনাক্রমে শাহাজাদীর আগমনের কিছুদিন পরেই শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার মৃত্যু হয়। শাহাজাদী তাঁর ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অতঃপর মাযারের খাদিমরূপে জীবন-যাপন করতে থাকেন। জনশ্রুতি অনুসারে হযরত শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার প্রায় পাঁচ'শ বছর পূর্বে চট্টগ্রামে আসেন। এ কথা সত্য হলে বলা যায় যে, শাহ্ চাঁদ আউলিয়া পনের শতকে জীবিত ছিলেন।

হাজী বাহরাম সাকা

পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান শহরে হাজী বাহরাম সাকার মাযার অবস্থিত। মাযার সংলগ্ন ১৫৭৪ সনে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি তাঁর স্মারক মাযার বিশেষ। কারণ বর্ধমানে তাঁর মৃত্যু হয়নি। সিংহলের পথে তাঁর মৃত্যু হয়। মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনীর বর্ণনা মতে বাহরাম সাকা আল্লাহ্ প্রেমে

নিবেদিত একজন সূফী ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন নিশাপুরের কাবুশান নামক স্থানের অধিবাসী শায়খ জামী মুহাম্মদ। আগ্রার পথে পথে পানি বিতরণ করে বেড়াতেন বলে তাঁর নামের সাথে 'সাকা' বিশেষণটি যুক্ত হয়েছে। তিনি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। অন্য এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে[১৬] তিনি তুর্কীস্তানের অধিবাসী ছিলেন। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) তিনি দিল্লীতে আসেন। বাদশাহ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। কিন্তু আবুল ফজল ও ফৈজীর প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তির কারণে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলায় চলে আসেন। বর্ধমানে পৌঁছে তিনি জয়পাল নামক জনৈক তন্ত্রসিদ্ধ হিন্দু যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনলেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর প্রতি অস্বাভাবিক অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। বাহরাম সাকা একটি সুদৃশ্য বাগানে অবস্থিত তার গৃহে গমন করলেন। যোগী তার তান্ত্রিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বাহরাম সাকাকে চমকিত করতে চাইলেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে যাদু ও কারামতের লড়াই শুরু হয়ে গেলো। এ লড়াই জনতার জন্য ছিল বেশ উপভোগ্য। যেমন যোগী বাতাসে উড়ে চলতেন আর বাহরাম সাকা তাঁকে জোর করে নামিয়ে নিতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে যোগী পরাজয় স্বীকার করলেন এবং পরাজয়কে তাঁর নিজের ধর্মের পরাজয় বলে মেনে নিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র সত্য ধর্ম ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন। এভাবে জয়পাল তাঁর শিষ্যদলসহ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সাধারণ অমুসলিমদের উপর হযরত বাহরাম সাকার প্রভাব কি পরিমাণ বিস্তৃত হয়েছিল এবং এভাবে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র সত্য দীন গ্রহণ করার পথ সুগম হয়েছিল। এ কারণে বর্ধমান থেকে সিংহলের যাত্রা পথে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে তারা বর্ধমানে তাঁর স্মারক সমাধি স্থাপন করে। বাদশাহ আকবর তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর মাযারের ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেন।[১৭] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হাজী বাহরাম সাকা ১৬০৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। ফাত্‌হী লিখিত ফার্সী ভাষায় তাঁর মাযার সংলগ্ন শিলালিপির নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ থেকে তাঁর মৃত্যু সনের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

زهی درویش علم کشته بهرام + که در عرفان دل او بود دریا

زعالم رفت در راه سرایدیب + شد از ملك فنا بهرام دانا

حساب سال موت ان بکانه + زحق کردم چون فتحی تمنا

ندا آمد که تاریخ وفاتش + بود درویش ما بهرام سقا

سنه . ۹۸ هجری قدسی

অর্থাৎ— "বাহরাম ছিলেন বিশ্বের এক বিস্ময়কর দরবেশ,
কারণ আল্লাহ্‌র রহস্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর হৃদয় সমুদ্রের ন্যায়।
সরন্দ্বীপের (সিংহল) পথে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন,
রহস্যজ্ঞানী বাহরাম মরজগত থেকে বিলীন হয়ে গেলেন।
সেই অসাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু সনের হিসাব করবো
ফাত্‌হী যেমন সত্য হিসাবের আকাঙ্ক্ষা করেছে ঃ
আমাদের দরবেশ বাহরাম সাকার
মৃত্যু সনের তারিখ ধ্বনিত হচ্ছে ৯৭০ হিজরী সন।"

এ থেকে জানা যায় যে, ৯৭০ হিজরী সনে অর্থাৎ ১৫৬২ খৃস্টাব্দে হাজী বাহরাম সাকা সরন্দ্বীপ বা সিংহলের পথে ইন্তিকাল করেন। আর সেই যুগে তাঁর লাশ কয়েক'শ বা হাজার মাইল দূরে থেকে বর্ধমানে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না জাহাজ ডুবির ফলে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল তাও জানা যায়নি। কাজেই বর্ধমানে তাঁর সমাধিটি স্মারক সমাধি হওয়াই স্বাভাবিক।

খাজা চিশ্‌তী বেহেশ্‌তী

ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব পার্শ্বে হযরত খাজা শরফুদ্দীন ওরফে খাজা চিশ্‌তী বেহেশ্‌তীর মাযার অবস্থিত। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬–১৬০৫ খৃ.) তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন। এতদঞ্চলে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। অনেকে তাঁকে নওয়াব আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশ্‌তীর উত্তর পুরুষ বলে মনে করেন। হিজরী ৯৯৮ সনে (১৫৮৯ খৃ.) তিনি ইন্তিকাল করেন বলে জানা যায়।

শাহ্‌পীর

চট্টগ্রাম থানার সাতকানিয়ায় এ দরবেশের মাযার অবস্থিত। কিংবদন্তি অনুসারে তাঁর আসল নাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং তিনি দিল্লীর কোন যুবরাজ ছিলেন। যৌবনকাল শেষে পার্থিব মোহমুক্ত হয়ে তিনি ধর্মীয় জীবনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় বিভিন্ন স্থান সফর করতে করতে তিন বা চার'শ বছর পূর্বে সাতকানিয়ায় এসে আস্তানা গাড়েন। এখানে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন।

ডঃ এনামুল হক এ প্রসঙ্গে উত্তর ভারতের অন্তর্গত মীরাটের বিখ্যাত সূফী শাহ্‌পীর ও সাতকানিয়ার শাহ্‌পীরকে অভিন্ন মনে করেছেন।[১৮] মীরাটের এ সূফীর

সমাধিতে মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান একটি মাযার তৈরী করে দিয়েছিলেন। মীরাটের এ সূফী ১৬৩২ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেছিলেন। এ কথা সত্য হলে স্বীকার করতে হয় যে, সাতকানিয়ার মাযারটি শাহ্পীরের একটি স্মারক মাযার এবং তিনি সতের শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

কাযী মুওয়াক্কিল

চট্টগ্রামের মীরেশ্বরাই থানার নিকটবর্তী গোবলিয়া দীঘির পাড়ে এ ইসলাম প্রচারেকের মাযার অবস্থিত। মোগল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৯–১৭০৭ খৃ.) তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও উন্নত চরিত্র মাধুর্য বহু অমুসলিমকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দানে সাহায্য করে।

তাঁর সম্পর্কিত প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের একজন কাযী ছিলেন। তাঁর উন্নত চরিত্র ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে বাদশাহ্ তাঁকে 'কাযী-উল-কুজ্‌ত' বা প্রধান বিচারপতির পদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অচিরেই সম্রাজ্ঞীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমার রায় নিয়ে সম্রাজ্ঞীর সাথে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। কাযী নির্ভীকচিত্তে সম্রাজ্ঞীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে রায় দেন। ফলে সম্রাজ্ঞী রুষ্ট হয়ে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করেন। সম্রাজ্ঞীর ভয়ে কাযী মুওয়াক্কিল দিল্লী ত্যাগ করে চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং দুনিয়ার লালসা ত্যাগ করে ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে একজন সূফীর জীবন যাপন করতে থাকেন।

শাহ নিয়ামতুল্লাহ্

'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, শাহ নিয়ামতুল্লাহ্ দিল্লী প্রদেশের কনাউল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশ পর্যটন করতে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এভাবে দেশ পর্যটন করতে করতে একদিন দিল্লী থেকে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর প্রাচীন গৌড়ের ফিরোজপুর মহল্লায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচারে রত থাকেন। তখন বাদশাহ্ শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা শুজা (১৬৩৯–১৬৬০ খৃ.) ছিলেন বাংলার গভর্নর। শাহজাদা তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে গৌড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাযার গাত্র সংলগ্ন শিলালিপিতে নিম্নোক্ত বাক্যটি লিখিত হয়েছে ঃ "নিয়ামতুল্লাহ বাহারুল উলুম মুদাম"। অর্থাৎ নিয়ামতুল্লাহ জ্ঞান ও বিদ্যার একটি চিরন্তন সমুদ্র। এ শব্দগুলোর

সাংখ্যিক মান দাঁড়ায় ১০৭৫ হিজরী অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃস্টাব্দ। এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

খাজা আনওয়ার শাহ্ শহীদ

বর্ধমান শহরে আঠার শতকের প্রথম দিকে খাজা আনওয়ার শাহ্ নামক একজন ইসলাম প্রচারক প্রচার কার্যে রত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানা যায় না যে, ১৭১৫ খৃস্টাব্দে একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেছিলেন। সুলতান ফররুখ শিয়ার তাঁর সমাধির উপর একটি মাযার নির্মাণ করে দেন। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান শহরে তাঁর মাযার অবস্থিত।

সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ঘাটাইল থানার পারসী গ্রামে সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারীর মাযার দীর্ঘ অযত্নের ফলে বর্তমানে অনেকটা ধ্বংসোন্মুখ হয়েছে। কথিত আছে, মুগল শাসন আমলে সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বুখারার ইমাম আলী রেজা প্রমুখ ছিলেন তাঁর পূর্ব-পুরুষ। সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী ঘাটাইল এলাকায় ইসলাম প্রচার এবং মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সংস্কার ও কলুষমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান বলে জানা যায়।

মওলানা শাহ্ আবদুর রহীম শহীদ

মওলানা শাহ্ আবদুর রহীম শহীদ ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর সতের শতকের শেষের দিকে তিনি বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। কেবলমাত্র শাহ্ নজমুদ্দীন নামক এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন তাঁর সঙ্গী। বিশ বছর অবধি একাধারে ইবাদতে মশগুল থাকার পর তিনি হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ঢাকার লক্ষ্মীবাজার মহল্লায় তাঁর খানকাহ অবিস্থত ছিল। ১১৫৮ হিজরীর ৭ শাবান (১৭৪৫ খৃ.) একজন পাগল তাঁর দেহে সাতটি তরবারির আঘাত করে। ফলে এক মাস তিন দিন পর রমযানের ৯ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। লক্ষ্মীবাজার মহল্লার মিয়া সাহেবের ময়দানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। বর্তমানে এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত।

এ ছাড়াও ঢাকার ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ইসলাম প্রচারকের আগমন হয়েছে। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও নিরলস সাধনার ফলে বাংলাদেশে ইসলাম শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আগমনকারী এ সব ইসলাম প্রচারকের মাত্র কয়েকজনের কাহিনী আমরা এখানে বিবৃত করার সুযোগ পেয়েছি। আঠার শতকের প্রথমার্ধের পর থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

---

১. আকবর উদ্দীন অনূদিত রিয়ায়ুস্ সালাতীনের বর্ণনার যথোচিত সংক্ষিপ্ত রূপ।
২. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়ায়ুস্ সালাতীন, আকবর উদ্দীন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, পৃষ্ঠা ঃ ৯১।
৩. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়ায়ুস্ সালাতীন, আকবর উদ্দীন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।
৪. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়ায়ুস্ সালাতীন, বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।
৫. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬৬—১৬৭ পৃষ্ঠা।
৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ৫৬ পৃষ্ঠা।
৭. হোসেন উদ্দীন হোসেন—যশোরাদ্য দেশ, ৭৫ পৃষ্ঠা।
৮. হোসেন উদ্দীন হোসেন—যশোরাদ্য দেশ, ৭৫ পৃষ্ঠা।
৯. চৌধুরী শামসুর রহমান—পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, ৯৬ পৃষ্ঠা।
১০. চৌধুরী শামসুর রহমান—পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, ৮৭—৮৮ পৃষ্ঠা।
১১. হাকিম হাবিবুর রহমান—আসুদগান-ই-ঢাকা, ১৯৪৬ খৃ., ৩২ পৃষ্ঠা। আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী—আখবারুল আখইয়ার, ১৭৩ পৃষ্ঠা।
১২. সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, ১৮০ পৃষ্ঠা।
১৩. East Pakistan District Gazetteers, Dacca, 1969, ৯৮ পৃষ্ঠা।
১৪. East Bengal District Gazetteers, Dacca, 1912, ৬৫ পৃষ্ঠা।
১৫. Enamul Hoq–A History of Sufism in Bengal, ২৩৩ পৃষ্ঠা।
১৬. Bengal District Gazetteer–Bardwan, 1910, ১৯০ পৃষ্ঠা।
১৭. Bengal District Gazetteer–Bardwan, 1910, ১৯০ পৃষ্ঠা।
১৮. Enamul Hoq–A History of Sufism in Bengal, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা

ইতিপূর্বে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকার কিছু অংশ বর্ণনা করেছি। এ দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ইসলাম প্রচারের স্বর্ণ যুগ। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি একদিকে আরব, ইয়ামন, ইরাক, ইরান, তুর্কীস্তান, মধ্য এশিয়া ও হিন্দুস্তানের উত্তরাংশ থেকে আগত অসংখ্য আলেম, সূফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার অভিযান চালান এবং অন্যদিকে এ আমলের মুসলিম শাসকদের মধ্যেও ইসলাম প্রচারের প্রেরণা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টার সঙ্গে শাসকদের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম সংযুক্ত হয়ে এ আমলে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। ইসলাম প্রচারের এ তৃতীয় পর্যায়েও রাজশক্তিকে কম-বেশি সক্রিয় দেখা যায়।

স্বাধীন সুলতানদের আমল

বর্ণহিন্দু অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষের দিকে ও তৃতীয় পর্যায়ের শুরুতে রাজশক্তির পক্ষ থেকে আসে এক প্রচণ্ড বাধা। রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের ফলে এ বাধার সৃষ্টি হয়। রাজা গণেশ মূলত ছিলেন এ দেশের মুষ্টিমেয় বর্ণ হিন্দুর প্রতিভূ। তিনি ছিলেন দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগণার একজন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ জমিদার। তিনি সুলতান আযম শাহের দরবারের একজন আমীর ছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষের কয়েকজন সুলতানের আমলে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। দরবারে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে অবশেষে ১৪১৪ খৃস্টাব্দে দুর্বল সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। অতঃপর শুরু হয় মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন। তাঁর মাত্র কয়েক বছরের রাজ্য শাসনের প্রকৃতি দেখে মনে হয় এ দেশের বুক থেকে ইসলামকে উৎখাত করে দেবার জন্য তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে হযরত শাহ নূর কুতবুল আলমের প্রসঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণ রাজা গণেশের এ স্বল্পকালীন শাসনকালকে হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন।[১] বস্তুত দু'শ বছরের মুসলমানী শাসনের পর এটিকে বর্ণ হিন্দুদের প্রথম অভ্যুত্থান বলা যেতে পারে। এ অভ্যুত্থানের সাথে সাধারণ ও বাংলার বৃহত্তম হিন্দু (অমুসলিম তথা অ-বর্ণহিন্দু) সমাজের কোন সম্পর্ক আজও আবিষ্কৃত হয়নি। সম্ভবত রাজ পরিবারে দুর্বলতা ও নিজস্ব কূটনৈতিক চক্রান্তের সফলতার জোরেই রাজা গণেশ কয়েক বছর ক্ষমতার আসনে টিকে ছিলেন। কিন্তু ১৪১৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই চার বছর কালের বর্ণ হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে।

রাজা গণেশের পর তাঁর পুত্র যদু বা জিতমল জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। রিয়াজের বর্ণনা মতে তাঁর পিতার নীতির বিরুদ্ধে তিনি বহু পৌত্তলিককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। গৌড়ে তিনি একটি মসজিদ, একটি হাউজ, একটি জালালী পুকুর ও একটি পান্থনিবাস নির্মাণ করেন। ইবনে হাজার ও আল-সাখাওয়ী লিখিত গ্রন্থদ্বয় থেকে জানা যায় যে, জালালুদ্দীন ইসলামের বহু প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। তাঁর পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদগুলোর সংস্কার সাধন করেন। মক্কায় তিনি একটি ভবন ও একটি সুন্দর মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। বাগদাদের খলীফা ও মিসরের বাদশাহর কাছে তিনি অনেক উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং খলীফার কাছে থেকে শাসন বিষয়ক অনুমোদনও আনিয়েছিলেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজের মুদ্রায় কালেমা উৎকীর্ণ করেন এবং 'খলীফাতুল্লাহ' উপাধিও গ্রহণ করেন। ১৪৩৩ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ প্রায় তিন বছর রাজত্ব করেন।

রুকনুদ্দীন বরবক শাহ ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ

শামসুদ্দীন আহমদ শাহের পর ইলিয়াস শাহী বংশের জনৈক শাহজাদা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পৌত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ফেরেশতার বর্ণনা অনুসারে নাসির উদ্দীন সিংহাসন লাভের পূর্বে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রিয়াযের বর্ণনা মতে নাসির উদ্দীন সব কাজ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সাথে সম্পন্ন করতেন। তাঁর রাজত্বকালে লোকেরা সুখে ও শান্তিতে বাস করতো। তিনি প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর একজন সেনাপতি খান জাহান আলী যশোর ও খুলনা জয় করে এ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র রুকনুদ্দীন বরবক শাহ ১৪৫৫ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৪৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বরবক শাহ অনেক নতুন রাজ্য জয় করে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর সেনাপতি ইসমাইল গাজী উড়িষ্যার মান্দারণ ও কামরূপ জয় করেছিলেন। ইতিপূর্বে ইসমাইল গাজীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি। 'তারিখে ফেরেশতা'র বর্ণনা মতে, বরবক শাহ সুবিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এমনকি তাঁর রাজত্বকালে কাযীগণ কোন বিষয়ে বিচার করতে অক্ষম হলে তিনি নিজেই বিচারের ভার গ্রহণ করতেন। তাঁর রাজত্বকালে কেউ প্রকাশ্যে মদপান করতো না। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের গতি দ্রুততর হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন মসজিদ নির্মীত হয়েছিল। তিনি মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র ও ফার্সী ভাষায় 'ফরহিন্দ-ই-ইবরাহিমী' নামক শব্দকোষ রচয়িতা ইবরাহিম কাইয়ূম ফারুকী এবং কবি আমীর জৈনুদ্দীন ও মালাধর বসু তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ ও বড় বড় পদে নিয়োগ করেছিলেন। অনন্ত সেন ছিলেন তাঁর প্রধান চিকিৎসক। বিশ্বাস রায় ও তার ভাইয়েরা ছিলেন তাঁর মন্ত্রীদের অন্যতম। কেদার রায় ছিলেন ত্রিহুতে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ভান্দসী রায় ছিলেন তাঁর অধীনে সীমান্ত অঞ্চলে ঘোড়াঘাট দুর্গের অধ্যক্ষ। এ ছাড়াও নারায়ণ দাস, কেদার খাঁ, জগদানন্দ রায়, ব্রাহ্মণ সুনন্দ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রী বৎস্য, মুকুন্দ প্রমুখ হিন্দু রাজকর্মচারী তাঁর অধীনে রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এ হিন্দু কর্মচারীগণ রাজস্ব, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন।

এভাবে দেখা যায়, রাজশক্তি একদিকে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও এর ফলে হিন্দুদের স্বার্থ ও প্রভাব বিনষ্টের কোন কারণ দেখা যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুরা রাজশক্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করে ইসলামের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। যেমন ইতিপূর্বে রাজা গণেশের পর্যায়ে দেখা গেছে। এ ছাড়াও বরবক শাহের বিশিষ্ট সেনাপতি ও ইসলাম প্রচারক ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে ভান্দসী রায়ের চক্রান্ত ও তাঁকে হত্যার ব্যাপারে বরবক শাহকে প্ররোচিত করার ঘটনাটি আমরা ইতিপূর্বে ইসমাইল গাজীর আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ইসলাম প্রচারের ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ভান্দসী রায়ের ছিল না। গৌড়ের দরবারের এ হিন্দু প্রাধান্যের প্রভাব রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে মুসলিম জীবনেও পরিব্যাপ্ত হয়। এর ফলে বিশেষ করে নও-মুসলিমদের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন-যাপন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। ইসলাম ও শিরক তথা পৌত্তলিকতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীকালের

মুসলিম শাসকদের সময়ও এ ধারা অব্যাহত ছিল। শেষের দিকে রাষ্ট্রযন্ত্রে ইসলাম বিরোধী প্রভাব ও প্রবণতা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

রুকনুদ্দীন বরবক শাহের পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬ খৃস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৪৮১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ফেরেশতার বর্ণনা অনুসারে তিনি কঠোরভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষা করতেন। কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস করতো না। তাঁর রাজ্যে প্রকাশ্যে মদ্যপান একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আলেমগণকে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, যেন ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে তাঁরা পক্ষপাতিত্ব না করেন। তিনি নিজে পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাই পিতার ন্যায় তিনিও মামলার বিচারের ক্ষেত্রে কাযীদের সাহায্য করতেন এবং কাযীগণ কোন মামলার রায় দিতে ব্যর্থ হলে তিনি নিজে সেক্ষেত্রে নিষ্পত্তি করে দিতেন। তাঁর রাজত্বকালে রাজধানী গৌড়ে ও তার আশেপাশে বহু মসজিদ নির্মীত হয়, তন্মধ্যে তিনি নিজেও কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন।

জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ ও যবন হরিদাস

শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৪৮২ খৃ. থেকে ১৪৮৭ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তবকাতে আকবরী ও রিয়াযুস সালাতীনের বর্ণনা অনুসারে তিনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর আমলে প্রজারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করতো। তাঁর আমলের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ষোড়শ শতকের হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের নেতা শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম। শ্রী চৈতন্য ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণববাদী লেখক বিশেষ করে শ্রী চৈতন্যের জীবনীকারগণ জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের যুগের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনীগুলোর সত্যতা অবশ্যই বিচার সাপেক্ষ। তবে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের এবং মুসলমানদের তথাকথিত হিন্দু-বিদ্বেষের কাহিনীগুলো হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এখানে শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, বৈষ্ণববাদীরা এভাবে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের পথ রুদ্ধ করার একটা শক্তিশালী প্রচেষ্টা চালায়।

চৈতন্যভাগবতে শ্রী চৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে যবন হরিদাসের যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে, জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল।

চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায় ঃ হরিদাস মুসলমান হয়েও কৃষ্ণনাম জপ করতো। কাজেই কাযী তার বিরুদ্ধে 'মুলুকপতি' অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছে নালিশ করেন। মুলুকপতি হরিদাসকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হরিদাস বলে যে, সব জাতির ঈশ্বর এক। অতঃপর মুলুকপতি বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও হরিদাস কৃষ্ণনাম ত্যাগ করে 'কালিমা উচ্চার' (কালেমা উচ্চারণ) করতে রাজী হলো না। এরপর কাযী তাকে বাজারে প্রকাশ্যে বাইশটি বেত্রাঘাত করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে কৃষ্ণনাম জপের অবাধ অনুমতি দিলেন।

চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা অনুসারে যদি যথার্থই যবন হরিদাস নামে কোন মুসলমান এভাবে কালেমা উচ্চারণ করতে রাজী না হয়ে প্রকাশ্যে কৃষ্ণনাম জপতে শুরু করেছিল বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে যে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ইসলামী আইনে মুরতাদের জন্য মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় কোন শাস্তি নেই। অথচ দেখা যায় 'মুলুকপতি' মুরতাদ যবন হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতায় চমকিত হয়ে তাকে শির্ক ও কুফরীতে নিমজ্জিত হবার অনুমতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে 'মুলুকপতি' বা শাসনকর্তার ঈমানও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম শাসকগণ ঈমানী দিক দিয়ে তৎকালে এতদূর দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। এ জন্যে আমাদের কাছে যবন হরিদাসের কাহিনীটি একটি কল্পকাহিনী বলে মনে হয়। নও-মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত ও হিন্দুদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এ কাহিনী তৈরী করা হয়েছিল। না হলে তৎকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এতবড় একটা ঘটনার অবশ্যই কিছু না কিছু উল্লেখ করতেন। এ ব্যাপারে জনাব মমতাজুর রহমান তরফদার বলেছেন যে, চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের ন্যায় প্রথম দিকের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে যবন হরিদাস জন্মগত মুসলমান ছিল এ কথা বলা হয়নি। সে জন্মগত মুসলমান ছিল কিনা এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। সম্ভবত সে একজন জন্মগত হিন্দু ছিল এবং কোন মুসলমান তাকে প্রতিপালিত করেছিল। কাজেই মুসলমান পরিবারের সাথে অবস্থান করার কারণে হিন্দু সমাজে সে যবন নামে পরিচিত হয়।[২]

জনৈক হাবশী খোজা জালালুদ্দীন ফতেহ শাহকে হত্যা করে। এরপর থেকে ছ'বছর পর্যন্ত হাবশীদের রাজত্ব চলে। শেষ হাবশী সুলতান মুজাফ্ফর শাহের রাজত্বকালে বাংলায় যথেষ্ট গোলযোগ দেখা দেয়। এ গোলযোগ কিছুটা মুজাফ্ফর শাহের সৃষ্টি আর কিছুটা তাঁর প্রধানমন্ত্রী সাইয়েদ হোসেন সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। রিয়াযের বর্ণনা মতে মুজাফ্ফর শাহ বহু সংখ্যক বিদ্বান, ধার্মিক ও

সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর বিরোধী বহুসংখ্যক বিধর্মী রাজাকেও তিনি হত্যা করেছিলেন। তাঁর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া যখন শুরু হলো তখন সে প্রতিক্রিয়ার আগুনে ঘি ঢাললেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী সাইয়েদ হোসেন। একদিকে তিনি সুলতানকে এমন সব পরামর্শ দিলেন যার ফলে প্রজাদের উপর জুলুমের মাত্রা অনেক বেড়ে গেলো, অন্যদিকে তিনি দরবারের সভাসদ ও আমীরগণকে সুলতানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। এভাবে একদা বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মুজাফ্ফর শাহকে হত্যা করে সাইয়েদ হোসেন নিজেই বাংলার মসনদে বসলেন।

হোসেন শাহ ও শ্রী চৈতন্য

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩–১৪৯৪ খৃস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম গণ্য করা হয়। তিনি দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময় বাংলা রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। বাংলাদেশের প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশও তাঁর শাসনাধীন ছিল। প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। ৯০৭ হিজরীর সমকালীন এক শিলালিপির অন্তর্লিখন থেকে দেখা যায় যে, তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।[৩] ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আলেম ও দরবেশগণকে বহু অর্থ দান করেন। হোসেন শাহের দরবারে মুসলিম আমীরদের সাথে সাথে হিন্দু আমীরদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। হিন্দুদেরকে তিনি বড় বড় উচ্চ রাজ কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভ্রাতা হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পর তাঁরা চৈতন্য দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৃন্দাবনে চলে যান।

তাঁর রাজত্বকালে শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব বাংলার ইসলামের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রী চৈতন্য তাঁর আমলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। নবদ্বীপ ছিল বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থল। অবশ্যই শ্রী চৈতন্যের জন্মের বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই নবদ্বীপ হিন্দু ধর্ম চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। এ নবদ্বীপকে কেন্দ্র করেই তিনি সারা বাংলাদেশে তাঁর বৈষ্ণব আন্দোলন পরিচালনা করেন। সাময়িকভাবে হলেও তাঁর পরিচালিত বৈষ্ণব আন্দোলন যে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন কি চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায় যে, চৈতন্য দেবের

আন্দোলন সুলতান হোসেন শাহের মনেও কিছুটা সাময়িক ভাবান্তর সৃষ্টি করেছিল। চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলোর দাবি অনুযায়ী হোসেন শাহের রাজত্বকালে কয়েক জন মুসলমান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন শ্রীবাসের মুসলমান দরজী চৈতন্য দেবের রূপ দেখে প্রেমোন্মাদ হয়ে মুসলমানদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে হরিনাম কীর্তন করেছিল। উৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমান্ত অধিকারী ১৫১৫ খৃস্টাব্দে চৈতন্য দেবের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। যবন হরিদাসের কথা আমার ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে ও নগর-সংকীর্তনকালে সম্মুখের সারিত বসে থাকতে দেখা গেছে। চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলোর এসব দাবি সত্য হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, হোসেন শাহের আমলে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা ও জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছিল এবং শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে শির্ক থেকে রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। সম্ভবত এ অভাব দূর করার জন্য হোসেন শাহ তাঁর আমলে অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

তবে চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব আন্দোলন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা লিখে গেছেন যে, হোসেন শাহ ও তাঁর অধীন শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলার বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করতো। এসব হিন্দু যে উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সরকারী আনুকূল্য ও সরকারী চাকরি লাভের যোগ্যতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই বর্তমান ছিল। এ ছাড়াও চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলো থেকে ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনের বিরোধিতা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন শ্রী চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

> হরিনদী নামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জন
> হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন ॥[৪]

তবে হোসেন শাহের দু' মন্ত্রী রূপ ও সনাতন নামক ভ্রাতৃদ্বয় যে চৈতন্য দেবকে দেখে প্রেমোন্মাদ হয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেননি তার অনেক প্রমাণ আছে। এ ব্যাপারে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"............... জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে অতি সঙ্গোপনে এমন সব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল যে, মুছলমান ঐতিহাসিকগণও তার কোন তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই।

"ইহা শুধু অনুমানের ব্যাপারে নহে। রূপ ও সনাতন গৌড় রাজ্যের শাসন পরিচালনের সর্ব্বৈব অধিকার লাভ করার পর হোছেন শাহের সর্বনাশ করার জন্য সদাসর্বদা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন।

"........... প্রকৃত তথ্য এই যে, উভয় রূপ ও সনাতন দেশে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। বিলম্বে হইলেও হোছেন শাহ এ সব সংবাদ যথা সময়ে অবগত হইলেন। ফলে তিনি দৃঢ়তার সাথে ইহাদের অপকর্মগুলির তদন্ত-তদারকে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত মুখে প্রকাশ, একদা হোসেন শাহ্ সনাতনকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার।
হেথা তুমি কৈলে আমার সর্বনাশ ॥'

[বিশ্বকোষ, ২১, ১৩৭ পৃষ্ঠা]

"এই নরহন্তা দুস্যুবৃত্তিধারী জ্যৈষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় বৈরাগ্যের তাড়নায় এমনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন যে, কনিষ্ঠ সনাতনের পলায়নের সুব্যবস্থা হওয়ার পূর্বে তিনি চৈতন্য প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে সনাতন গোস্বামী নিজের ধন-দওলত পাচার করিবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। এমন সময় সুলতান হোছেন তাঁহাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সনাতন নানা টাল-বাহানা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে থাকেন। .... অবশেষে তিনি বন্দী হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। বলা আবশ্যক, এ সংসার বিরাগী গোস্বামী মহাশয় কারা রক্ষককে নগদ সাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়া বন্ধন মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ....

"জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোঁসাই দস্যুবৃত্তি দ্বারা যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা নিয়া পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। আর বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে তিনি নিজে (সনাতন) যে রাজকোষের কি বিপুল পরিমাণ অর্থ অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার অছিয়তনামার বিবরণগুলি হইতে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইতেছে ৭+১০=১৭ হাজারের হিসাব তো বৈষ্ণব সাহিত্যের বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে। ইহা বাদে আরও যে ধন-সম্পদ তাঁহার হাতে মৌজুদ ছিল, চৈতন্য চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত বচনে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

"এই অবস্থায় চৈতন্য দেব ভক্তদ্বয়ের সহিত মিলিত হইলেন। ...."

"ছোলতান হোসেনের প্রাথমিক দোষ-দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া গৌড় রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসী রূপধারী বৈষ্ণব জনতা যে বাংলাদেশ হইতে ইছলাম ধর্ম ও মোছলেম

শাসনকে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার জন্য গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ছোলতানের ও স্থানীয় মোছলেম নেতাদের যথাসময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তাহার অবসান ঘটিয়া যায়।"[৫]

এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, রূপ ও সনাতনের শ্রী চৈতন্যের শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করার মূলে ধর্মীয় তাড়নার পরিবর্তে নিজেদের অপকর্ম ঢাকবার প্রয়াসই অধিক কাজ করেছে। এভাবে দেখা যায়, শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন তৎকালীন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে এ সমাজের লোকদের ইসলাম গ্রহণের গতি সাময়িকভাবে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তবে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের গতি কোনদিন দ্রুত ছিল না এবং এ সময়ও তার মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। চৈতন্য দেবের ধর্মমত, তাঁর কার্যাবলী ও মুসলিম সমাজের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নসরত শাহের রাজ্যের আয়তন বিশাল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিহুত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন এবং গৌড়ে অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ১৫২৬ খৃস্টাব্দে বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

নাসিরুদ্দীন নসরত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়) মাত্র এক বছর রাজত্ব করার পর তাঁর পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের হাতে নিহত হন। অতঃপর গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব শেষ হয়। এরপর শুরু হয় আফগানদের ৩৭ বছরকালীন রাজত্ব।

আফগান শাসনামল

বাংলার প্রথম আফগান শাসক হচ্ছেন শেরশাহ সূর। ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখানে মাত্র এক বছর বসবাস করার পর বাংলাদেশে শাসনের সুব্যবস্থা করে তিনি খিজির খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে মোগল বাদশাহ হুমায়ূনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ১৫৪০ খৃস্টাব্দে হুমায়ূনকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করে তিনি দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন। ইতিমধ্যে

তিনি আগ্রার শ্রেষ্ঠ আলেম কাযী ফজীলতকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান। একজন শ্রেষ্ঠ আলেমকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করায় শের শাহের শিক্ষা ও বিদ্বান প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ আমলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠিত হয়। রাস্তা-ঘাট, সরাই, পুল, দুর্গ, কূপ, মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা প্রভৃতি নির্মীত হয়। সোনারগাঁও থেকে দিল্লী পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মীত হয়। পরবর্তীকালে এটি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত হয়। এর সোনারগাঁও থেকে হাওড়া পর্যন্ত অংশটি বহু পূর্বেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের শাসনামলে মুসলিম জনজীবনে ইসলামী ভাবধারা, আদর্শ ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণববাদী আন্দোলন মুসলিম সমাজে যে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল আফগান শাসকদের ৩৭ বছরের শাসন তা অনেকাংশে দূরীভূত করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৫৪৫ খৃস্টাব্দে শেরশাহ্‌র মৃত্যুর পর দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু এর পরও ১৫৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় আফগানদের শাসন অপরিবর্তিত থাকে। অসমিয়া বুরুঞ্জীর মতে গৌড়ের আফগান শাসক ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সিকান্দার সূরের ভ্রাতা কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলো বিধ্বস্ত করেন।

আফগান শাসকদের মধ্যে সুলায়মান কররানী ছিলেন সবচাইতে শক্তিশালী। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ও বিজেতা ছিলেন। তাঁর রাজ্যের সীমা ক্রমশ দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন নদ ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই সময় দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হস্তগত হওয়ার ফলে এ সমস্ত অঞ্চল থেকে হতাবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে সুলায়মান কররাণীর আশ্রয় গ্রহণ করে। সুলায়মান কররানী ১৫৬৩ থেকে ১৫৭২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলেন। বাদায়ূনীর বর্ণনা মতে তিনি প্রত্যহ সকালে ১৫০ জন শায়খ ও আলেম সহযোগে দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠান করতেন। তিনি আলেম ও সূফীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ দেশে শরীয়তের বিধান কার্যকরী করার জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। বাদায়ূনী লিখেছেন, সুলায়মান বিশ্বাসহীনতার (শির্‌ক ও কুফরী) কেন্দ্রস্থল কটক-বেনারস জয় করেছিলেন এবং জগন্নাথকে (পুরী) দারুল ইসলামেও পরিণত করেছিলেন। অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সুলায়মান কররানীর আফগান সেনাপতি কালাপাহাড় পুরী জয় করেন। তিনি জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন অধিকার করেন।

মন্দিরটি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করেন এবং মূর্তিগুলো খণ্ড খণ্ড করে নোংরা স্থানে নিক্ষেপ করেন। বহু সোনার মূর্তিসহ অনেক মণ সোনা তাঁর হস্তগত হয়। এই প্রথম উড়িষ্যা মুসলমানদের অধিকারে আসে।[৬]

সুলায়মান কররানীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানী ছিলেন বাংলার শেষ আফগান শাসক। রিয়াযের বর্ণনা অনুসারে তিনি সর্বদা মদ পান করতেন ও নীচ শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশতেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ও লোক-লশ্‌কর ছিল অসংখ্য, সাজ-সজ্জা ছিল বেশুমার, অর্থ ও সম্পদ ছিল প্রচুর। মোগল বাদশাহ্ আকবরের সাথে সংঘর্ষে ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে তাঁর পতন ঘটে। তাঁর পতনের সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসে আফগান যুগেরও পতন হয়। অবশ্য দাউদ কররানীর মৃত্যুর পরও বাংলার অনেক অংশে আফগান নায়কেরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন। তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দমন করতে মোগলদের যথেষ্ট সময় লাগে।[৭]

মোগল ও নবাবী আমল

১৫৭৬ খৃস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ দিল্লীর মোগল বাদশাহ্‌দের শাসনাধীনে আসে। প্রথম দিকে প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত এ দেশে মোগলদের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলাদেশে একজন মোগল সুবাদার ছিলেন এবং মাত্র কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী গৌড় ও এ সেনানিবাসগুলোর আশেপাশেই মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশের অন্যান্য সমগ্র এলাকা চরম বিশৃংখলার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। আফগানরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলছিল। এ সময় মোগল বাদশাহ্ আকবরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং 'দীন-ই-এলাহী' নামক নতুন ধর্মমত প্রচারের প্রচেষ্টার ফলে জৌনপুরের কাযী তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার ফতোয়া দেন। এর ফলে বাংলার পাঠানরা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কাজেই আকবরের শাসনকালে বাংলার মোগল সুবাদারগণ কেবলমাত্র এ পাঠান বিদ্রোহ দমনেই অতিবাহিত করেন।

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃস্টাব্দে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে ১৬০৮ খৃস্টাব্দে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে মোগল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, শৃংখলা ও সুশাসন প্রবর্তন করে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করে এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীর নগর। এরপর থেকে একশ বছর পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাতেই অবস্থিত থাকে।

মাঝখানে মাত্র কয়েক বছরের জন্য রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়। ইসলাম খান ১৬১৩ খৃস্টাব্দে মারা যান।

বাংলায় মোগল আমলের প্রথম দিকে যে দীর্ঘকালীন বিদ্রোহ চলতে থাকে তা বাংলার ইতিহাসে বারভুঞাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে খ্যাত। এই বারভুঞাদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান এবং কয়েকজন ছিলেন হিন্দু। বারভুঞাগণ ছিলেন স্বাধীন জমিদার। এঁদের কেউ কেউ কয়েকটি পরগণা আবার কেউ কেউ জেলারও অধিকারী ছিলেন। হিন্দু বারভুঞার অধীনে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যদল দেখা যায়, আবার মুসলিম বারভুঞার হিন্দু সেনাপতি ও সেনাদলও দেখা যায়। হিন্দু বারভুঞাদের অধীনে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও চলে। এ ব্যাপারে যশোরের প্রতাপাদিত্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মুসলিম বারভুঞাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে ইসলাম ও মুসলমান বাংলার জনজীবনের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল এবং রাজশক্তিকে বাদ দিলেও রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে বাংলার মুসলমানরা যে একটি বিরাট শক্তি তা সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছিল।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, মোগল আমলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অনুভূতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভাটা পড়েছিল। বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেই মোগল শাসনকর্তা-গণের দৃষ্টি ছিল বেশি। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পর থেকে নবাবী আমলের পূর্ব পর্যন্ত যেসব সুবাদার বাংলাদেশ শাসন করেন, তাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯–১৬৫৯ খৃ.) (২) শায়েস্তা খান (১৬৬৪–১৬৬৮ খৃ.) এবং (৩) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্‌শান (১৬৮৯–১৭১২ খৃ.)। শায়েস্তা খানের সুশাসনের ফলে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম এত সস্তা হয় যে, তা আজও প্রবাদে পরিণত হয়ে আছে। রিয়াযের বর্ণনা মতে, তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, দুস্থ বিধবাদের ও অন্য অভাবীদের গ্রাম ও জমি দান করে তাদের অবস্থা ভালো করেন। তাঁর সময় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো। শাহজাদা আজিমুশ্‌শান অত্যন্ত বিলাসী ও অর্থলিপ্সু ছিলেন। তিনি অর্থ উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশি। মোগল সুবাদারগণের মধ্যে একমাত্র শায়েস্তা খান ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। ধর্মীয় নির্দেশাদিও তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং অত্যাচারীদের নির্মূল করার ব্যাপারে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অন্য সুবাদারগণ ইসলামের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে মেনে চলতেন না, যার প্রভাব বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানদের উপর যথেষ্ট পড়ে।

মোগল সুবাদারদের আমলে বাংলাদেশে ইউরোপ থেকে আগত পর্তুগীজ মিশনারীদের তৎপরতাও বেড়ে যায়। তারা বাংলাদেশে খৃস্ট ধর্ম প্রচার শুরু করে। হুগলী, ঢাকা, শ্রীপুর ও পিপলীতে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দুকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। স্থানীয় মোগল শাসকগণ এতে কোন বাধা দিতেন না বরং ওলামা ও পীরগণ মিশনারীদের ধর্মান্তকরণে বাধা দিলে মোগল সুবাদার মিশনারীদের সাহায্য করতেন। স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মান্তকরণের সাথে সাথে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের তৎপরতাও বেড়ে যায়। ইতিপূর্বে আরাকান রাজ চট্টগ্রাম জয় করায় চট্টগ্রাম এ জলদস্যুদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬২১–১৬২৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজ জলদস্যুরা সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রায় ৪২ হাজার মুসলমান ও হিন্দুকে বন্দী করে চট্টগ্রামে আনে ও তাদের মধ্য থেকে ২৮ হাজার ব্যক্তিকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে।[৭] পর্তুগীজরা এদেরকে বিভিন্ন বন্দরে বিক্রয় করে বেড়াতো। এদের হাতের মধ্যে ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে বেত চালিয়ে অনেককে এক সঙ্গে বেঁধে নৌকার পাটাতনের নিচে ফেলে রাখতো এবং প্রতিদিন উপর থেকে কিছু ভাত তাদের আহারের জন্য ফেলে দিত। শায়েস্তা খান ১৬৬৫ সালে সন্দ্বীপ জয় করেন এবং এ সময়ই পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের হাত থেকে চট্টগ্রামকেও উদ্ধার করেন।

মোগল শাসনামলে শাসন ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোগল সুবাদারদের সাথে সাথে একজন দেওয়ানও দিল্লী থেকে নিযুক্ত হয়ে আসতেন। এ দেওয়ানগণ দিল্লীর সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে তাঁদের কার্য সম্পাদন করতেন। তাঁরা হতেন রাজস্ব বিভাগের প্রধান। এ দেওয়ানদের মধ্যে আওরঙ্গজেবের আমলে নিযুক্ত জাফর খান ওরফে নওয়াব মুরশিদ কুলী খান সবচাইতে সাফল্য অর্জন করেন। শেষের দিকে কয়েক বছর তিনি সুবাদারের দায়িত্বও পালন করেন এবং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার কারণে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করতে থাকেন। তাঁর ইসলাম প্রীতি, ইসলামী আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও সুশৃংখল জীবন যাপন বাংলার জনজীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তাই আমরা এখানে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

নওয়াব মুরশিদ কুলী খান

মুরশিদ কুলী খান ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হাজী শফি ইসফাহানী তাঁকে খরিদ করেন ও তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ হাদী। তিনি তাঁকে

পুত্রতুল্য গণ্য করতেন। হাজী সাহেব তাঁকে নিজের সাথে ইরানে নিয়ে যান। হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি ভারতে চলে আসেন এবং হাজী আবদুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে দাক্ষিণাত্যে চাকরিতে যোগ দেন। পরে তিনি বাদশাহ্‌র অধীনে চাকরি নিয়ে হায়দরাবাদের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। অতঃপর জিয়াউল্লাহ খানের বদলীর পর মুরশিদ কুলী খান উপাধিসহ তিনি বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। প্রথমে তিনি তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করতেন। কিন্তু কিছুদিন পর সুবাদার শাহজাদা আজিমুশ্‌শানের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে মকসুদাবাদ চলে যান এবং নিজের নামে শহরের নাম রাখেন মুরশিদাবাদ।

ইসলাম প্রচার, ইসলামী বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানদের সহায়তা করা, দুস্থের দুর্দশা দূর করা ও অত্যাচারীদের নির্মূল করার ব্যাপারে রিয়ায লেখক গোলাম হোসাইন সলীম তাঁকে নওয়াব শায়েস্তা খানের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর আদেশ যাতে পালিত হয় সে জন্য তিনি ছিলেন কঠোর এবং কর্তব্য-সাধনে ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ছিলেন অটল। দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে তিনি কখনও অবহেলা করতেন না। বছরে তিন মাস রোযা রাখতেন ও সম্পূর্ণ কুরআন আবৃত্তি করতেন। বহু রাত তিনি কুরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠে অতিবাহিত করতেন ও খুব কম নিদ্রা যেতেন। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কুরআন নকল করতেন। তাঁর অধীনে দু'হাজার কারী নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যহ সমগ্র কুরআন পাঠ করতেন ও নওয়াবের স্বহস্তে লিখিত কপি সংশোধন করে দিতেন। শায়খ, সাইয়েদ, আলেম ও ধার্মিক লোকদের সঙ্গ তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। রবিউল আউয়াল মাসের ১ম তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মুরশিদাবাদের আশ-পাশ থেকে শায়খ, উলাম ও দরবেশদের দাওয়াত করে এনে আহার করাতেন এবং মাহিনগর থেকে লালবাগ পর্যন্ত সমগ্র নদী তীর এমনভাবে আলোকমালায় সুসজ্জিত করতেন যার ফলে নদীর অপর তীরের দর্শকগণও সমস্ত মসজিদে উৎকীর্ণ কুরআনের আয়াত পড়তে পারতো।

স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ, প্রজাদের কল্যাণ ও অত্যাচারিতের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য সস্তা করার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টিত ছিলেন। কাউকে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখতে দিতেন না। প্রতি সপ্তাহে খাদ্যশস্যের মূল্য তালিকা প্রস্তুত করাতেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা প্রকৃত যে মূল্যে খরিদ করতেন তার সাথে মিলিয়ে দেখতেন। দরিদ্রদের কাছ থেকে তালিকা-নির্দেশিত মূল্য অপেক্ষা বেশি দাম আদায় করলে তিনি ব্যবসায়ী, মহলদার ও ওজনদারদের নানা প্রকার শাস্তি দিতেন। তাদেরকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে

ঘোরাবার আদেশও দিতেন। এহেন ব্যবস্থাপনার কারণে জিনিসপত্রের দাম সস্তা ছিল এবং গরীবরা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতো।

তিনি কখনও মদ পান করতেন না। হারাম বর্জন করতেন। কখনও নাচ দেখতেন না বা গান শুনতেন না। আজীবন নিজের একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া আর কোন রক্ষিতা রাখেননি অথবা অন্য নারীর প্রতি আসক্তিও দেখাননি। শরীয়তের বিধান তিনি এমন কঠোরভাবে মেনে চলতেন যে, কখনও কোন খোজা বা শরীয়তের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ স্ত্রীলোকদেরকে তিনি হারেমে প্রবেশ করতে দিতেন না। কোন দাসী একবার হারেমেরে বাইরে গেলে তার পুনঃ প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সুস্বাদু ও ব্যয়বহুল খাদ্য অথবা বিলাস দ্রব্য তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না।

তাঁর আমলে ন্যায়বিচার এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায় ও অত্যাচার এমনভাবে নির্মূল হয়েছিল যে, জমিদারের প্রতিনিধিরা অত্যাচারিত ও ফরিয়াদীদের সন্ধানে নকরখানা থেকে চেহেল সেতুন[১] পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। কোন অত্যাচারিত বা ফরিয়াদী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া মাত্রই তারা তার সাথে আপোস-মীমাংসা করে নিতো, নওয়াবের কাছ পর্যন্ত পৌছার তার প্রয়োজন হতো না। আদালতের বিচারকদের কেউ অত্যাচারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে অত্যাচারিত ব্যক্তি নওয়াবের কাছে নালিশ করতো। তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি কারোর প্রতি অনুগ্রহ বা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে দিতেন না। বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ সবাইকে এক পাল্লায় বিচার করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জনৈক অত্যাচারিত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি নিজের পুত্রকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তিনি কুরআনের বিধান ও বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিয়োজিত কাযী মুহাম্মদ শরফ দ্বারা আইনের ব্যাখা অনুযায়ী বিচার করতেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ও নওয়াব মুরশিদ কুলী খানের শাসনামলে কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত, আলেম, বিদ্বান ও সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন তাদেরকেই কাযীর পদে নিয়োগ করা হতো। অশিক্ষিত অথবা নীচ ব্যক্তিদেরকে এ পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হতো না। ধার্মিক ও বংশানুক্রমিক কাযীদের বদলী করার অথবা তাদের পরিবর্তন করার রীতি ছিল না। তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার কর আদায় করা হতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা কারোর অধীন ছিল না। তাদেরকে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হতো না।

নওয়াব মুরশিদ কুলী খানের আমলে চোর, ডাকাত, নরহন্তা ও লুটেরাদের নাম বাংলার বুক থেকে মুছে গিয়েছিল। শহর ও গ্রামের বাসিন্দারা পূর্ণ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বাস করতো। তাঁর শাসন ব্যবস্থা এতই বলিষ্ঠ ও সার্থক ছিল যে, তখন কোন বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ঘটেনি। সে কারণে সামরিক

ব্যয় প্রায় বিলোপ করা হয়েছিল। মাত্র দু'হাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে তিনি এ প্রদেশ শাসন করতেন। নাজির আহমদ নামক জনৈক পিয়নের মারফত তিনি রাজস্ব আদায় করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এতই শক্তিশালী ও তাঁর আদেশ এতই ভীতিপ্রদ ছিল যে, তাঁর পিয়নরাই দেশে শান্তি স্থাপন ও দুষ্টদের দমন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এ ব্যাপারে কিস্তি-খেলাফীদের তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ্ ধার্মিক ও দরবেশতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের সম্পত্তির অর্ধেক দরবেশ, ধার্মিক ও আলেমগণের ভরণ-পোষণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও গরীব ও দুস্থদের জন্য তাঁর দৈনিক দান বরাদ্দ ছিল। এ জন্য মুরশিদ কুলী খান তার উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করতেন না। কিন্তু অন্যদেরকে তিনি অব্যাহতি দিতেন না। তাদেরকে নানা ধরনের শাস্তি দিতেন। শাস্তি দানের পরও জমিদারদের যে সমস্ত হিন্দু আমলা রাজস্ব পরিশোধ করতেন না তাদেরকে তিনি সপরিবারে ইসলামে দীক্ষিত করতেন।"

অবশ্য এভাবে হিন্দুদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার নীতি কোনক্রমেই ইসলাম সমর্থিত হতে পারে না। উপরন্তু এর ফলে একদিক দিয়ে ইসলামী সমাজের সমূহ ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল। দুর্নীতি দুষ্ট এবং অপরাধী চরিত্র ও মনোবৃত্তির অধিকারী লোকদের সংখ্যা ইসলামী সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ারই আশঙ্কা। তাঁর রাজস্ব আদায়ের এ কঠোর ও ভ্রান্ত নীতিটুকু বাদ দিলে, যা মূলত মোগল শাসন ও কঠোর একনায়কত্বমূলক রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিরই একটি দুষ্ট-ক্ষত, তাঁর সমগ্র জীবনের কার্যকলাপ বাংলাদেশে ইসলামী শাসন ও ইসলামী ন্যায় বিচারের একটি দিক জনগণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। শত শত আলেম, দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক যা করতে পারেন না একজন মুসলিম শাসক নিজের চরিত্র, কার্যকলাপ ও সূক্ষ্ম ইসলামী ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তা করতে পারেন। মুরশিদ কুলী খানের চরিত্র ও কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামের যতটুকু প্রতিনিধিত্ব হয়েছে তাই এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। এ জন্য মুরশিদ কুলী খানের কার্যাবলী ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "মুরশিদ কুলী খান গুণের আদর করতেন এবং তাঁর আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চ পদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া

অথবা কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন।"[১০]

মুরশিদ কুলী খান ১৬৭০ খৃস্টাব্দ থেকে বাংলার দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭১৭ খৃস্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। শেষের দিকে দিল্লীর মোগল শাসকদের দুর্বলতার কারণে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। এ অবস্থায় ১৭২৭ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুসলিম শাসনের অবসান

নওয়াব মুরশিদ কুলী খানের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে নওয়াব মীর কাসিমের পরাজয় পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮টি বছর বিশ্বাসঘাতকতার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ সময় মুসলমান শাসকগণ এমন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি, যা অন্য জাতির কাছে আদর্শ বলে গৃহীত হতে পারে। বরং এ সুদীর্ঘকালে মুসলমান শাসকবৃন্দ ও তাঁদের সহযোগীগণ এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন যা ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে অন্য জাতির মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও সুদক্ষ শাসক বলে পরিচিত নওয়াব আলিবর্দী খান নিজেই তাঁর প্রভু তনয় সরফরাজ খানের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলার মসনদ দখল করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর নীতির কোন বালাই ছিল না। শঠতা ও প্রতারণার চূড়ামণি মারাঠাদের সাথে এক চুক্তির সময় তাঁর প্রতিনিধি মুস্তফা খান কাপড়ের মধ্যে কুরআনের পরিবর্তে একটি ইট নিয়ে যান এবং তা স্পর্শ করে বারবার শপথ করেন।[১১] এভাবে মারাঠাদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তাদেরকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরআনের নাম ব্যবহার করে বিধর্মীদের মনে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে আহত করা হয়।

আলিবর্দীর দৌহিত্র নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাও মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে বাংলার মসনদকে ইংরেজদের পদানত করেন। অতঃপর ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে নওয়াব মীর কাসিমও এ একই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন এবং বাংলার মুসলিম শাসনের অবসান হয়। মুসলিম শাসনের এ শেষের দিকে বিশৃংখলা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশে মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালানোর প্রশ্নই ওঠে না।

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ৪৬ পৃষ্ঠা।
রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

২. M.R. Tarafdar—Husain Shahi Bengal, ২২৯ পৃষ্ঠা।
৩. J.A.S.B—১৮৭৪ খৃঃ, ৩০৩ পৃষ্ঠা।
৪. বৃন্দাবন দাস—শ্রী চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়।
৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১০৫—১১০ পৃষ্ঠা।
৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১১৮ পৃষ্ঠা।
৭. Campos—History of the Portuguese in Bengal, ১০৫ পৃষ্ঠা।
৮. নওয়াব মুরশিদ কুলী খান মুরশিদাবাদে সাধারণ দরবার কক্ষ হিসাবে যে ভবন নির্মাণ করেছিলেন তাকে বলা হতো চেহেল সেতুন। চল্লিশটি স্তম্ভের উপর ভবনটি নির্মীত ছিল বলেই সম্ভবত এর এ নামকরণ হয়েছিল।
৯. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়াযুস্ সালাতীন, বাংলা অনুবাদ, ১৯৮—২২৪ পৃষ্ঠা।
১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২১২—২১৩ পৃষ্ঠা।
১১. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়াযুস্ সালাতীন, বাংলা অনুবাদ, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম সমাজ ও তার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রথম যুগের সমাজ বিস্তারের ধারা বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এ কথা দাবি করা যাবে না যে, এ সমাজ ছিল রাসূলে করীম (সা) প্রবর্তিত মদীনার ইসলামী সমাজের একটি অংশ। প্রথমত, এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মদীনার প্রথম ইসলামী সমাজের কয়েক'শ বছর পর। দ্বিতীয়ত, এ সমাজ যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা রাসূলে করীম (সা), তাঁর সাহাবা বা তাবেয়ীগণের কাছ থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এমনকি তাঁদের মধ্যে কত জন ইসলামের মূল ভূখণ্ড ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির আদি কেন্দ্র আরব ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাও গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বাংলায় ও আরবে ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য দেখা যায়। আরবে রাসূলে করীম (সা)-এর মক্কী ও মদনী যুগের ন্যায় বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ এ দু' যুগের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। বাংলায় ইসলামের মক্কী যুগ কয়েক'শ বছর দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং মদনী যুগ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া অভিযানের পর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে লাখনৌতিতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামের এ মক্কী যুগ ঠিক কোন্ সময় থেকে শুরু হয়েছে তা বলা কঠিন এবং এখনও পর্যন্ত এমন কোন সূত্র আমাদের হাতে আসেনি, যার ফলে এ যুগের প্রারম্ভকালকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবুও আমরা আনুমানিক অষ্টম শতক থেকে এ যুগকে গণনা করতে পারি। যখন আরবদের বাণিজ্য বহর বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চীন সমুদ্র পর্যন্ত যাতায়াত করেছে। এ আমলে ও এর সমসাময়িক যুগে রচিত আরব ভূগোলবিদ গ্রন্থাদিতে বাংলার বিভিন্ন নগর-বন্দরের নাম আমরা পাই। তবে অষ্টম, নবম ও দশম শতকে এ দেশে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে বাংলার অভ্যন্তরে মেঘনার তীর পর্যন্ত ইসলাম পরিচিতি লাভ করেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ ছাড়া স্থলপথে পাল আমলে (অষ্টম-নবম শতকে) বাংলার পৌণ্ড্র নগর (পাহাড়পুর) ও কুমিল্লার ময়নামতিতেও ইসলাম পরিচিতি লাভ করেছিল, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অষ্টম, নবম ও দশম শতকে এ দেশে ইসলাম কি

পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করেছিল, এখানকার মুসলমানরা আংশিকভাবে হলেও কোন সমাজ কায়েম করতে পেরেছিলেন কিনা এবং কায়েম করলেও তার আকার-আকৃতি কেমন ছিল তার কোন ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নেই। তবে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতকে সূফী-দরবেশ, আলেম ও মুজাহিদগণ এ দেশে যে সকল স্থানে ইসলাম প্রচার করেন, তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে পূর্ব থেকেই ইসলাম প্রচারের নিদর্শন অনুভূত হয়। কাজেই বলা যেতে পারে, একাদশ শতকের পূর্বে এ দেশে বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন স্থানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল কিন্তু তা কোথাও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে আমরা সর্বপ্রথম শাহ সুলতান বলখী, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, মখদুম শাহদৌলা শহীদ প্রমুখ কয়েকজন সূফী, আলেম ও মুজাহিদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পাই। তাঁদের ইসলাম প্রচার যে ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল, বিরোধী শক্তির সাথে তাঁদের সংঘর্ষ থেকে তা জানা যায়। তবে দু'শ বছরের মধ্যে তাঁদের, তাঁদের সঙ্গী; সহযোগী ও শাগরিদদের এবং অন্য ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় মুসলমান সমাজের আকার কি পরিমাণ স্ফীত হয়েছিল এবং তা কতটুকু সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেছিল তা জানার কোন উপায় নেই।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পরই লাখনৌতিতে প্রথম আনুষ্ঠানিক মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করার পর বাংলার তৎকালীন রাজধানী লাখনৌতি অধিকার করেন। বখতিয়ার বিজিত লাখনৌতি রাজ্যের সীমানা ছিল ঃ উত্তরে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণ গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত।[১] একদিকে তিনি এ রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং অন্যদিকে এখানে ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি ও তাঁর সঙ্গে আগত লাখনৌতি বিজেতা সেনাবাহিনী এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আগত সৈন্যসংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় না। তবে দু'বছর পরে যখন তিনি তিব্বত অভিযানে বের হন তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার। এ ছাড়াও তাঁর তিনজন গভর্নর ইজ্জুদ্দীন মুহাম্মদ শিরান খলজী, আলী মর্দান ও আহমদ শিরান খলজীর অধীনে নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক সৈন্য ছিল, যাদের সাহায্যে তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। তিব্বত অভিযানে যাত্রা করার পূর্বে বখতিয়ার তাঁর দুই সেনাপতি ইজ্জুদ্দীন

মুহাম্মদ শিরান খলজী ও আহমদ শিরান খলজী ভ্রাতৃদ্বয়কে লখনৌর ও জাজনগর আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেন।[২] তাহলে অনুমান করা যায় যে, তাঁদের সঙ্গেও নিশ্চয়ই কয়েক হাজার সৈন্য ছিল। এ সৈন্যদের পরিবার-পরিজন ও তাদের অনুচরবর্গও নিশ্চয়ই এদের সঙ্গেই ছিলেন। বখতিয়ার খলজীর লাখনৌতি বিজয়ের পর স্থিতিশীল সরকার গঠন করার খবর শুনে মধ্য এশিয়ার ভাগ্যান্বেষীরা এতদিনে নিশ্চয়ই ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে রত্ন প্রসবিনী বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এভাবে সামরিক ও বেসামরিক বহিরাগত মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা মিলে কম করে হলেও বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মুহাম্মদ বখতিয়ার শুধুমাত্র একজন সমর-নায়ক ছিলেন না, তিনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিকও ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বহিরাগত মুসলমানদের এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাদের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিপুষ্টি ও প্রতিরক্ষারও প্রয়োজন। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এ দেশে একদিন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং এমন কি অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন লালন এবং পরিচালনার জন্য তাবকাতে নাসিরির বর্ণনা মতে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ তৈরী করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁর ওমরাহ্গণও দেশের সর্বত্র এ সব জনহিতকর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। রাসূলে করীম (সা) মদীনায় প্রবেশ করেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দেন এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবাগণের আমলে দেখা গেছে, মুসলমান সেনাবাহিনী যখনই কোন নতুন দেশ জয় করেছেন তখনই তাঁরা সর্বপ্রথম সেখানে মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। এ থেকে মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী মসজিদের এ গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। লাখনৌতিতে মসজিদ ও মাদ্রাসার সাথে সাথে খানকাহ নির্মাণ থেকে বোঝা যায়, তাঁর সঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন সূফী ও দরবেশ বাহিনীও এসেছিলেন অথবা পূর্ব থেকেই লাখনৌতি রাজ্যে সূফী ও দরবেশগণ ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন এবং তিনি তাঁদের কার্যে সহায়তা দান করেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অনুমানটিকেই আমরা অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ইতিপূর্বে এ গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা আভাসও দিয়েছিলাম যে, মাত্র গুটিকয় সৈন্যের সাহায্যে মুহম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে লক্ষ্মণ সেনকে নদীয়া থেকে বিতাড়িত করা কেমন করে সম্ভবপর হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, আঠারজন অশ্বারোহীর পেছনে আরো দশ বা পনর হাজার সৈন্যের সাহায্য

ছিল এবং হয়তো এ কথাও সত্য যে, লক্ষণ সেন নদীয়াতে তীর্থব্যাপদেশে বাস করছিলেন।[৩] নদীয়া তাঁর রাজধানী ছিল না, কাজেই তাঁর সঙ্গে কোন বড় সেনাবাহিনী ছিল না। কিন্তু তাঁর রাজধানী লক্ষণাবতী বা পূর্ব বঙ্গের রাজধানীতেও কি কোন বৃহৎ সেনাদল ছিল না, যারা পরবর্তীকালে মুহম্মদ বখতিয়ারের সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত হতো ? লক্ষণ সেন নিজেও তো একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং যৌবনে তিনি বহু বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যৌবনে তিনি কলিঙ্গ দেশে অভিযান করেছিলেন, যুদ্ধে কাশীরাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং ভীরু প্রাগজ্যোতিষের (কামরূপ ও আসাম) রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।[৪] তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন, মিনহাজের বর্ণনা মতে যাঁরা ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগেও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করছিলেন। এতদসত্ত্বেও মুহম্মদ বখতিয়ার বাংলার কোন প্রান্ত থেকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হননি। এর কারণ যথার্থই ঐতিহাসিকদের কাছে দুর্বোধ্য থাকার কথা নয়।

প্রকৃতপক্ষে একাদশ দ্বাদশ শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারের যে প্রবাহ চলছিল আমাদের মতে তা বাংলার বন্দর ও রাজধানী নগরগুলোতে সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ প্রচারের সুবিধা হেতু এ কেন্দ্রীয় নগরগুলোকেই মুসলিম প্রচারকরা বেছে নিয়েছিলেন। এ সঙ্গে বর্ণ হিন্দু শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত বৌদ্ধ ও অবর্ণ-হিন্দু জনতার বিক্ষোভ মুসলিম প্রচারকদের সহায়ক হয় এবং ইসলামের সত্য-সরল তওহীদ বিশ্বাস, মানবতাবাদ ও সাম্যের বাণী বর্ণাশ্রম পীড়িত সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র অযাচিত দান রূপে গৃহীত হয়। কাজেই বখতিয়ার খলজীর মুসলিম সেনাদলের অভিযান বাংলাদেশে সেন শাসন বিরোধী আপামর জনতার মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে, যার স্রোতের মুখে লক্ষণ সেনের ক্ষমতার দণ্ড তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়।

কাজেই বখতিয়ার খলজী প্রথমে যে মুসলিম সমাজ গঠন করেছিলেন তাতে যে এ দেশীয় নও-মুসলিমদের একটি অংশ ছিল না তা বলা যায় না। মধ্য এশিয়া থেকে আগত এ সব বহিরাগত মুসলমান, যাদের অধিকাংশ ছিলেন তুর্কীস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের বাসিন্দা এবং কিছুসংখ্যক এ দেশীয় নওমুসলিমের সমন্বয়ে বাংলাদেশের এ প্রথম মুসলিম সমাজ গঠিত হয়েছিল। মসজিদ ছিল এ সমাজের কেন্দ্র। ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব এ মসজিদের মাধ্যমেই পালিত হতো। মুসলিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ ও সূফীগণের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। খানকাহগুলো ছিল একদিকে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র এবং অন্যদিকে এগুলো বয়স্কদের জন্য আবাসিক শিক্ষায়তনের কাজও

করতো। এ সমস্ত খানকাহ্‌র মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শায়খ ও সূফীগণ মুসলমানদের চিন্তা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি এবং নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি বিধানের দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। বস্তুত বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সাড়ে পাঁচ'শ বছরের মধ্যে এ মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণের কাজ অবিরাম গতিতে চলেছিল। তবে প্রথম দু'শ বছর এর গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। অন্য কথায় বলা যায়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের বিজিত স্থানসমূহে মসজিদ ও খানকাহ্‌ নির্মাণের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক চেতনার আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত মুসলিম শাসনের এ প্রথম দু'শ বছর বাংলার বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কাজেই তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন পরিচালনার জন্য এ বিপুল সংখ্যক মসজিদ ও খানকাহ্‌র প্রয়োজন হয়েছিল।

মসজিদ ও খানকাহ্‌ নির্মাণের পাশাপাশি বাংলাদেশে আর একটি কাজ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে মন্দির ভাঙ্গা ও মূর্তি ধ্বংস। প্রথম মুসলিম শাসক বখতিয়ার খলজী হিন্দুদের বহু মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন।[৫] মুসলমান শাসকগণ যত মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেছেন তার কয়েক গুণ বরং বহু বহু গুণ বেশি মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেছেন মুসলিম সূফী, দরবেশ, গাজী ও মুজাহিদগণ। বিভিন্ন সূফী ও দরবেশ মূর্তি ধ্বংস করার মাধ্যমেই তাঁদের ইসলাম প্রচারের সূচনা করেছেন। ইতিপূর্বে সূফী ও আলেমগণের ইসলাম প্রচার অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কিত বহুবিধ ঘটনার উল্লেখ করেছি। সূফী ও দরবেশগণের আযান ধ্বনির সাথে সাথে মন্দিরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ভক্তগণ পরবর্তীকালে এগুলোকে তাঁদের অলৌকিক কাজের অংশে পরিণত করে নিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে অলৌকিকত্বের অংশ থাক বা না থাক, তাঁরা যে মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন, শত শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দেবমূর্তিগুলোর সাথে মানুষের যে আকীদা-বিশ্বাস, ভয়-ভক্তি মিশ্রিত ছিল সেগুলোকে তাঁরা বিচূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—মূলত তাঁদের সেই সফল প্রয়াসটিই অলৌকিকত্বে রূপ নিয়েছিল।

মুসলিম সূফী, দরবেশ, মুজাহিদ ও শাসকগণের এ মন্দির মূর্তি ধ্বংসের বিরুদ্ধে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ এবং বর্তমানকালের হিন্দু লেখকবৃন্দ অত্যন্ত সোচ্চার। তাঁরা একে মুসলমান শাসক ও সূফী মুজাহিদগণের একটি অপরাধ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বিশাল ভারতবর্ষের বুক জুড়ে যে বৌদ্ধ ধর্ম একদা বিস্তার লাভ করেছিল, এ উপমহাদেশেই যার জন্ম এবং শত শত বছর ধরে এ উপমহাদেশের শাসকবৃন্দ যে ধর্মকে রাজধর্মরূপে লালন করেছিলেন, সারা বিশ্বে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী পাঠিয়ে ভারতের বাইরেও যে ধর্ম বহু দেশ জয় করেছিল, সেই

বিশাল ধর্মকে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার বিরুদ্ধে কোন হিন্দু লেখককে বিবেকের তাড়না সহ্য করতে দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের এ পরিণতি থেকে বাংলার ইসলাম প্রচারক ও মুসলিম শাসকবৃন্দ যদি শিক্ষা গ্রহণ না করতেন, তাহলে আজ বাংলার বুকে ইসলামের পরিণতি বৌদ্ধ ধর্মের থেকে ভিন্নতর হতো না।

ইসলাম নির্ভেজাল তৌহীদ ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। যে কোন প্রকার শির্ক, পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, প্রতীক পূজা, অবতারবাদ এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে তিলার্ধ পরিমাণ অংশীদার যে কোন শক্তি ও সত্তাকে ইসলাম অস্বীকার করে। এ ধরনের কোন শক্তি ও সত্তাকে সামান্য পরিমাণ বিশ্বাস করে বা এদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করে কোন ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট বিঘোষিত বাণী ঃ আল্লাহ মানুষের সকল প্রকার গুনাহ ও পাপ কাজ ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু তাঁর সাথে কোন পর্যায়ের শির্ক ও অংশীদারিত্বের কোন ক্ষমা নেই।[৩] ইসলামের এ দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও নীতির কারণে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্ম এ তৌহীদের ব্যাপারেই সব চাইতে বড় দুর্বলতা দেখিয়েছে। যার ফলে উত্তরকালে সর্বগ্রাসী আর্য ধর্মের পরবর্তীকালের উদ্ভাবিত পৌত্তলিকতাবাদ ও অবতারবাদ তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের প্রশ্নে নীরব ছিলেন বা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠলে তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। যেমন জনৈক আর্যপুত্রের সাথে তার আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়।

ঈশ্বরের প্রশ্নে বুদ্ধদেবের এ নীরবতার কারণস্বরূপ বলা যায় না যে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কোন বক্তব্যে ঈশ্বর অস্বীকৃতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি নেই। আসলে তাঁর যুগে আর্য তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা পূজা এত বেশি প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের অভিব্যক্তি শুধুমাত্র প্রতিমার মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। প্রতিমাবিহীন ঈশ্বরের কল্পনা করাই সম্ভবপর ছিল না। তাই বুদ্ধদেব সম্ভবত প্রতিমার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হবার দুঃসাহস করেননি। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর নীরবতা ছিল পরোক্ষভাবে প্রতিমা পূজার অস্বীকৃতি। বৌদ্ধ ধর্মের এ দুর্বলতাই পরবর্তীকালে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আগ্রাসী নীতি গ্রহণে সাহায্য করেছিল। যে প্রতিমা পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ প্রত্যক্ষ অভিযানে অবতীর্ণ হবার সাহস করেননি তার মৃত্যুর মাত্র কয়েক'শ বছরের মধ্যেই তিনি নিজে সেই প্রতিমায় পরিণত হয়েছেন। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের বৃহত্তর অংশ পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হয়েছে এবং গৌতম বুদ্ধ হিন্দুদের দশ অবতারের এক অবতারে পরিণত হয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের এ করুণ পরিণতির পটভূমিতে ইসলাম প্রচারক সূফী, দরবেশ, মুজাহিদ ও মুসলিম শাসকগণ প্রতিমা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের এ সিদ্ধান্ত আক্রমণাত্মক হলেও আসলে ছিল প্রতিরক্ষামূলক। পৌত্তলিকতার সংস্পর্শ ও আক্রমণ থেকে ইসলাম এবং মুসলমানকে বাঁচাবার এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। প্রতিমা ও দেবমূর্তি, যাদের কল্পিত আকাশচুম্বী ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রভাব বাংলার মানুষের মনকে ভীষণভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাদের সাথে তিলার্ধ সদয় ব্যবহার করা হয়নি। তাদের অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যেসব জাঁক-জমকপূর্ণ গৃহে তাদেরকে স্থাপন করা হয়েছিল মহান বিশ্ব স্রষ্টা ও প্রতিপালকের অবমাননাকারী সেসব গৃহকে নির্দয়ভাবে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। এর ফলে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের মন থেকে ঐসব প্রতিমা, দেবদেবী ও মন্দিরসমূহের ক্ষমতা ও পবিত্রতার প্রভাব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ক্ষমতা ও পবিত্রতার অসারতা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে কোন প্রকার সংশয় ও বিভ্রান্তির অবকাশ থাকেনি। কাজেই কোন মুসলমানকে দিয়ে অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিমা পূজা করানোর সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এ ভাবে ইসলাম ও শির্কের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে এর ফলে জাহেলিয়াতের সুগভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত বৃহত্তর পৌত্তলিক সমাজ ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করেছে।

মুসলিম মুজাহিদ, শাসক ও সূফীদের মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। অর্থাৎ একটি পরিবারের, একটি পাড়ার অথবা একটি গ্রামের সমস্ত অমুসলিমই যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের মন্দির ও বিগ্রহের আর কোনো অবস্থান থাকে না, তখন সেগুলি আপনা-আপনিই ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রয়োজনের খাতিরে সেখানে দেবালয়ের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতের আলয় নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজন এড়িয়ে যদি সেখানে দেবালয় এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রেখে আবার অন্য স্থানে আল্লাহ্‌র ঘর তৈরী করা হয় তাহলে তা বাড়াবাড়ি হিসাবেই চিহ্নিত হয়। এক্ষেত্রে ঐ দেবালয় ও মূর্তিগুলো নিছক দর্শণীয় বস্তু হিসাবেই থাকবে। তাছাড়া সূফীদের মূর্তি ভাঙ্গা রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ ইসলামের আগমনে শির্কের পতন।

এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে, ইসলাম যখন বাংলা ভূখণ্ডে প্রথম আগমন করে তখন এদেশে বৌদ্ধ ও জৈনদের বসতিই ছিল বিপুল, কিন্তু

বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগ আসেনি। নিশ্চয়ই বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধমূর্তিও ভাঙ্গা হয়েছে। কারণ সেগুলি শির্কের নিদর্শন। কিন্তু হিন্দু মন্দির ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙ্গারই অভিযোগ এসেছে। এটা কেন ? বৌদ্ধ ও জৈনরা ব্যাপকভাবে এবং সামনে এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোথাও তারা প্রতিরোধ দাঁড় করায়নি। কিন্তু হিন্দুরা সশস্ত্র প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে। সারা বাংলায় তারা সর্বত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ সংঘর্ষগুলোর কেন্দ্র সম্ভবত হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন মন্দির। এসব ক্ষেত্রে এ মন্দিরগুলো এবং এসবে রক্ষিত বিগ্রহগুলো প্রভাবিত হয়েছে। তাছাড়া সারা দেশে এতো বিপুল সংঘর্ষের মধ্যে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে যে কিছু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়নি, একথা একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। ইসলাম অন্যের বিগ্রহ ও উপাসনালয় ভাঙ্গতে নিষেধ করেছে। এটা ইসলামী যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ধরনের উন্নত পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমের যে তখন বেশ অভাব দেখা দিয়েছিল একথা আমরা আগেই বলেছি।

ইসলামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদ বাংলার প্রথম মুসলিম সমাজে যথাযথ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্ণাশ্রম বিধ্বস্ত বাংলার সমাজে এ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদ এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে বিপুল সংখ্যক নিগৃহীত হিন্দু ও বৌদ্ধ কেবলমাত্র এরই আকর্ষণে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সমাজে তুর্কী, আরবীয়, ইরানী ও এ দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বখতিয়ার খলজীর হাতে মেচ জাতীয় একজন সরদার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর নাম রেখেছিলেন আলী। এ আলী মেচ পরবর্তীকালে তাঁর প্রধান অনুচরে পরিণত হয়েছিলেন। বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানে আলী তাঁর পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তাঁকে পরিপূর্ণ সহায়তা দান করেছিলেন।

মুসলিম সমাজের পরিধি ও সংগঠন ব্যবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রথম এক'শ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সর্বত্র মুসলিম সমাজ গঠন সম্ভবপর হয়নি। কারণ প্রথম এক'শ বছরে মুসলমানরা উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অংশ জয় করে পূর্ববঙ্গ জয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র লাখনৌতি, পাণ্ডুয়া, দেবকোট ও দিনাজপুরের মাহিসন্তোষ ছিল মুসলিম সামাজ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এবং সোনারগাঁওয়ে আর একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে বাংলায় বহিরাগত মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে

থাকে। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর পর যখনই দিল্লী থেকে কোন নতুন গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন বা বাংলার বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালিত হয়েছে তখনই বেশ কিছু সংখ্যক নতুন মুসলমান দিল্লী থেকে বাংলায় এসেছেন। যেমন আলি মর্দান খলজী, তুগরল তুগান খান, তমুর খান-ই-কীরান প্রমুখ গভর্নর তাঁদের লোকজন ও সেনাবাহিনীসহ লাখনৌতিতে এসেছেন। অনুরূপভাবে সুলতান ইলতুৎমিস ও গিয়াসুদ্দীন বলবন বিদ্রোহ দমনার্থে তাঁদের বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। যুদ্ধ শেষ করে তাঁরা দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তাঁদের সেনাদলের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও অফিসার নব নিযুক্ত গভর্নরের সাথে এখানেই থেকে যায়। তাদের অধিকাংশই আসলে ভাগ্যান্বেষণে উপমহাদেশে এসেছিল। কাজেই অধিক সুযোগ-সুবিধা দেখে তারা এখানেই থেকে গিয়েছিল, এ কথা বিবেচনা করাই সঙ্গত। এ ছাড়াও এ সময় চেঙ্গিস খান ও তার নাতি হালাকু খান এবং কুবলাই খান মধ্য এশিয়া, খোরাসান প্রভৃতি এলাকার মুসলিম দেশগুলো বিধ্বস্ত করায় এবং বিশেষ করে ১২৫৮ খৃস্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস করায় এ সব এলাকা থেকে মুসলমানরা দলে দলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও শান্তির রাজ্য ভারত উপমহাদেশে হিজরত করে। স্বাভাবিক কারণেই তাদের বিরাট অংশ যে সুজলা-সুফলা রত্ন প্রসবিনী বাংলায় পাড়ি জমিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সব কারণে লাখনৌতিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মাত্র এক'শ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের আয়তন যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সমগ্র বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তা না বললেও চলে।

ত্রয়োদশ শতকের লাখনৌতির মুসলিম শাসনকর্তাগণের সাথে দিল্লী, বাগদাদ ও মক্কা-মদীনাসহ মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত শহর ও এলাকাগুলোর যোগাযোগ ছিল। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু পরিগঠন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত এলাকার ওলামা, সূফী, দরবেশ ও মুজাহিদগণ বাংলাদেশে আমগন করে এখানে নতুন মুসলিম সমাজ গঠনে সাহায্য করেন। ওলামা ও দরবেশগণ মাদ্রাসা ও খানকাহ তৈরি করেন। দিনাজপুরের মাহিসুনে (মাহিসন্তোষ) মওলানা তকীউদ্দীন আরাবীর ও ঢাকার সোনারগাঁওয়ে মওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্রাসা এবং পাণ্ডুয়ায় শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর খানকাহ মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের বাংলায় আজকালকার মতো এতো বেশি সুসংগঠিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিটি মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার কাজ সেখানেই সম্পন্ন

হতো। এ ছাড়াও বহু আলেম শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা করতেন। ইসলাম প্রচারের জন্যও কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। যতদূর জানা যায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, পরকালীন সাফল্য ও ইসলামী দায়িত্ব পালনের তাগিদে আলেম ও সূফীগণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যেতেন। আবার বহু ক্ষেত্রে ওলামা ও সূফীগণের চরিত্র-মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করতো। মুসলিম বিজয়ের প্রথম শতকে কি পরিমাণ অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা বলা কঠিন হলেও মুসলিম সমাজ যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে এতটুকু বলা যায় যে, মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন, বলিষ্ঠ চরিত্র ও উন্নত আদর্শের কারণে আশপাশের সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়ে এবং তৎকালীন বাংলায় মূলত গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু সমাজপতি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর সাথে সাথে সমাজের অন্যান্য লোকও ইসলাম গ্রহণ করতো। এভাবে মুসলমান সমাজ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ত্রয়োদশ শতকের বাংলার বুদ্ধিজীবী, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ব্যাপক প্রভাব বর্ণনা করেছি। তাঁর একার প্রচেষ্টায় শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এ কথাও আলোচনা করেছি। এভাবে দেখা যায়, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার এক'শ বছরের মধ্যে বাংলার মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এ এক'শ বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি শহর ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। তন্মধ্যে পাণ্ডুয়া ও দিনাজপুরের মাহিসন্তোষ ছিল আলেম ও সূফী-দরবেশদের কেন্দ্রস্থল। অন্যদিকে লাখনৌতি ও দেবকোট (বর্তমানে দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর) ছিল মুসলিম শাসকগণের কেন্দ্রীয় স্থান। এ দু'টি শহরে মুসলমানদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি ছিল। কাজেই এ দু' শহরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়াও বিচিত্র নয়।

কয়েক'শ বছর ধরে আলেম ও সূফীগণের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম প্রচার এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষ অবধি বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি এলাকায় শক্তিশালী ভিত্তিতে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার কারণে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ব্যাপক ভিত্তিক মুসলিম সমাজ গঠনের একটি বিরাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এ সময় মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন নগর থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম আলেম ও সূফী উত্তর ভারতে হিজরত করেন। তাঁদের অনেকেই ইসলাম প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে, আবার অনেকে নিছক শান্তিতে

ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য অপরূপ প্রাকৃতিক লাবন্য ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বাংলার শ্যামল ক্ষেত্রকে বেছে নেন। তাই পরবর্তী শতকে বাংলায় ইসলাম প্রচারের গতি ছিল সবচেয়ে দ্রুত। এ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুজাহিদ, সূফী ও আলেম ছিলেন উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী, হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ ও শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা ওরফে শাহ বদর। চতুর্দশ শতকের বাংলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলমান সমাজ বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এ সময় ইসলাম প্রচারের একটি বিশাল স্রোতধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল। আবার এ শতকের মধ্যে পূর্বে সিলেট ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। এ সময় বিপুল সংখ্যক সূফী, মুজাহিদ ও আলেমের প্রচেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমান শাসকদের প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। তাই এ চতুর্দশ শতককে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণ যুগ বলা যায়।

একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ মুজাহিদ, আলেম ও সূফী। মুজাহিদগণের মধ্যে উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী, শাহ ইসমাইল গাজী ও খান জাহান আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলিম শাসনকর্তাদের অধীনে চাকরি করলেও মূলত ইসলাম প্রচারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুদ্ধ করে নগর ও দেশ জয় করেন অতঃপর সেখানে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

আলেমগণের মধ্যে মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী, মওলানা শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ, মওলানা শায়খ আলাউল হক, মওলানা শাহ নূর কুতবুল আলম ছিলেন প্রধান। বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাঁরা একদিকে ইসলাম প্রচার ও অন্যদিকে মুসলমানদেরকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাহিসন্তোষ, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁওয়ের মাদ্রাসা বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। বাংলার বাইরেও এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থিগণ এ সব শিক্ষা কেন্দ্রে সমবেত হন এবং এখানে অধ্যয়ন করে বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সরকারী উদ্যোগে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যতদূর জানা যায়, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনটিই পরিপূর্ণ সরকারী আনুকূল্য ও পরিচালনা লাভ করতে পারেনি। এগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই এর যাবতীয় ব্যয়

নির্বাহ করতেন। যার ফলে এগুলোর কোনটিই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিতে ও দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারেনি। মুসলিম শাসনের শেষের দিকের তুলনায় প্রথম দিকেই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিক প্রসার দেখা যায়। আগেই বলেছি, সে যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থিগণ শিক্ষকদের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করতে আসতেন। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো। সাধারণত একজন বিখ্যাত আলেম বা মুহাদ্দিস যেখানে বাস করতেন ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে এসে তাঁর কাছে অবস্থান করে জ্ঞান অর্জন করতেন। ইতিহাস আলোচনা করলে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকেই দেশ জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন আলেম ও মুহাদ্দিসগণের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সম্ভবত এ কারণেই এ যুগে অধিক সংখ্যক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এবং এ সব দেশবরেণ্য আলেমের গভীর পাণ্ডিত্য ও উন্নত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশ থেকে শিক্ষার্থিগণ বাংলার এ প্রাণকেন্দ্রগুলোর দিকে ধাবিত হয়েছিলেন।

মুসলিম শাসনের প্রথম দিকের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিল যথার্থ ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশের মুশরিকী ও পৌত্তলিক পরিবেশে এ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিল ইসলামী জ্ঞানের আলোকদীপ। প্রথম দু'শ-আড়াই'শ বছর এ আলোক দীপগুলো পরিপূর্ণ প্রভা বিকিরণ করে এক-একটি আলোকরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম শাসনের প্রথম দু'শ-আড়াই'শ বছর ছিল বাংলার সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়।

এ ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোতে সাধারণত আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্তবগুলোতে কুরআন শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। কুরআনের মাধ্যমে মুসলিম শিশুর শিক্ষার হাতে খড়ি হতো। সতের শতকের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল তাঁর 'তোহ্ফায়' বলেছেন ঃ

'সর্ব শাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কুরআন।' (১৪৭ পৃষ্ঠা)

অন্যান্য বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রের শিক্ষা উচ্চতর ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোতে দান করা হতো। তবে বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ এ উচ্চতর ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোর সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য মুসলিম শিশুর প্রথম পাঠ মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্তবগুলো থেকে শুরু হতো, ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে জানা যায় ঃ

'যত শিশু মুসলমান তুলিল মকতব স্থান
মখদম পড়ায় পঠনা।'

কিন্তু মক্তবের এ পাঠ কুরআন ও এর সাথে কিছুটা ফার্সী সাহিত্য পড়া বেশি অগ্রসর হতো না। অধিকাংশ সাধারণ বাঙালী মুসলমান যে আরবী-ফার্সী জানতো না তা ষোড়শ শতক ও পরবর্তীকালের কবিদের রচনা থেকে জানা যায়। কাজেই বলা যায়, উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা লাভ বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের ভাগ্যে ঘটেনি। এর ফল অশুভ হতে বাধ্য। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিক থেকে বাংলার সাধারণ মুসলমান সমাজের ওপর আমরা এর অশুভ প্রভাব লক্ষ্য করেছি।

ইসলাম প্রচারকারী তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন সূফী ও দরবেশগণ। এ সূফী ও দরবেশগণের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর কাছে লিখিত একখানি পত্র থেকে বাংলায় আগত সূফীগণের সংখ্যার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন শহরের সূফীগণের নামোল্লেখ করার পর বলেছেন, "মোটকথা বাংলাদেশের বড় শহরের কথা বাদ দিলেও এমন কোন শহর (ছোট) বা গ্রাম নেই যেখানে খোদাভীরু সূফীগণ আগমন ও বসতি স্থাপন করেননি।" এতো গেলো পঞ্চদশ শতক পর্যন্তকার অবস্থা। এর পরও তিন'শ বছর ধরে সূফীদের আগমন অব্যাহত থেকেছে। এ থেকে বাংলায় ইসলাম প্রচারক সূফীদের বিপুলায়তন কলেবরটি অনুমান করা যায়। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা হযরত শাহ সুলতান বলখী, বাবা আদম শহীদ, হযরত জালালুদ্দীন তাবরিজী, হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ ও হযতর শাহ বদরুদ্দীন আল্লামার নাম উল্লেখ করতে পারি।

সূফী ও দরবেশগণের অধিকাংশই দলবল নিয়ে শাগরিদ ও অনুচরগণসহ আসেন। তাঁদের দু'চারজন ছাড়া বাকি সবাই এ দেশে বসতি স্থাপন করেন। ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া ইসলাম প্রচারকেও তাঁরা নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অধিকাংশ সূফীই বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও সমরকুশলী ছিলেন। সম্ভবত মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদেরকে রাজনৈতিক যোগ্যতার অধিকারীও দেখা গেছে। সোনারগাঁওয়ের সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজ্যের এক স্থানে বিদ্রোহ দমন করতে যাওয়ার সময় শায়দা নামক জনৈক সূফীকে চট্টগ্রামে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সূফীগণ রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্নও ছিলেন। অবশ্য এ সূফী শাসক সুলতান ফখরুদ্দীনের সাথে সদ্ব্যবহার করেননি। তিনি সুলতানের অনুপস্থিতিতে তাঁর

শিশু পুত্রকে হত্যা করেন এবং নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তিনি নিজের এ বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি লাভ করেন।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকারী সূফীগণ ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে জিহাদে অবতীর্ণ হতেও কুণ্ঠবোধ করেননি। স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে বহুক্ষেত্রে তাঁদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। এভাবে তাঁদের অনেকে শাহাদত বরণও করেছেন। সিলেটের হযরত শাহ জালাল, চট্টগ্রামের শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা ও দিনাজপুরের চিহিল গাজীর নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইসলাম প্রচারের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অলৌকিক কার্যকলাপেরও (কারামত) আশ্রয় নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মদনপুরের হযরত শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী ও বর্ধমানের হাজী বাহরাম সাকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শাহ সুলতান রুমী বিধর্মী কোচ রাজার সম্মুখে জীবন সংহারক বিষের পাত্র পান করে রাজাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। অন্যদিকে হাজী বাহরাম সাকা বর্ধমানের জনৈক তন্ত্রসিদ্ধ হিন্দু যোগীর সাথে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের লড়াইয়ে যোগীকে পরাস্ত করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন। সূফীগণ কোনো ক্ষেত্রে অলৌকিক কার্যকলাপের ছড়া-ছড়ি করেননি। আসলে তাঁরা যে যুগে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন সে যুগে সাধারণ মানুষের উপর তন্ত্রসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। সাধারণ মানুষকে এ সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রভাব মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ধরনের কয়েকটি অপরিহার্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিলে সব ক্ষেত্রেই আমরা তাঁদেরকে বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করতে দেখি। মূলত ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম নয় বরং একটি বাস্তবাদী ধর্ম ও জীবন বিধান। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বাস্তব জগতে বিচরণ করেছেন এবং ইসলামকে বাস্তবায়িত করার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ ও কর্মনীতি প্রয়োগ করেছেন। কাজেই তাঁর অনুসারী হবার কারণে সূফী ও দরবেশগণও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বাস্তব উপায়-উপকরণ ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছেন। সূফীগণ এ দেশে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের খানকাহ নির্মাণ করেন। খানকাহগুলো ছিল ইসলামী ইবাদত-বন্দেগীর পদ্ধতি শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞান আলোচনা এবং শিক্ষার কেন্দ্র। কোথাও কোথাও খানকাহগুলোর সাথে মাদ্রাসা ও লঙ্গরখানাও থাকতো। এ লঙ্গরখানাগুলো থেকে দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের অন্নদান করা হতো। অনেক স্থলে এগুলো সমাজ ও জাতিচ্যুত নও-মুসলিমদের প্রাথমিক আশ্রয় স্থলের কাজও করতো বলে মনে হয়। সূফীগণ ইসলাম প্রচারের জন্য জনসেবাকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, এতে সন্দেহ নেই।

সূফীগণ আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাঁদের চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

সূফীগণ ও শাসক সমাজের সহায়তায় বাংলায় যে মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে ষোড়শ শতকে লিখিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তার নিম্নোক্ত চিত্রটি পাই ঃ

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি[৭] করয়ে নামাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁঝ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহবা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাটে
সাঁঝে বাজে দগড়[৮] নিশান ॥
বড়ই দানিশ বন্দ[৯] না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি ॥
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় করি ॥
আপন টোপর[১০] নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিঁয়া
ভুঞ্জিয়া[১১] কাপড়ে মোছে হাত ॥

এখানে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের কেমন একটা সৌম্য-শান্ত-সমাহিত চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথমত, মুসলমানরা নামাযের পাবন্দ। তারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। বিশেষ করে ফজরের সময় সূর্য ওঠার আগে সবাই জেগে ওঠে। পাক-পবিত্র হয়ে পাটি বিছিয়ে নামায পড়ে। দ্বিতীয়ত, তারা তসবীহ-তেলাওয়াত ও যিকির-আযকার করে। এজন্য তসবীহদানা হাতে নিয়ে তসবীহ পড়ার প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল। তৃতীয়ত, দশ-বিশজন মিলে এক সাথে গোল হয়ে বসে কিতাব-কুরআন নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ইল্‌মী আলোচনা করার রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল। এটা তাদের নিত্য দিনের প্রোগ্রাম ছিল। অর্থাৎ কুরআনী জিন্দেগী যাপন করার স্পৃহা তাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল। এ চিত্র দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীসটির

কথা মনে পড়ে। একদিন তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, সাহাবাগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেউ তসবীহ্ পাঠ ও যিকির-আযকারে মশ্‌গুল হয়েছেন আবার কোথাও কয়েকজন দলবদ্ধ হয়ে মাসআলা-মাসআয়েল আলোচনা ও ইল্‌ম চর্চা করছেন। তিনি চারদিকে নজর করার পরে এই বলে ইল্‌ম চর্চার মাহফিলে বসে গেলেন যে, ইন্নী বু'ঈস্‌তু মু'আল্লিমান অর্থাৎ "আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।" এখানে একেবারেই নবী করীম (সা) ও সাহাবাগণের যুগের সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে।

চতুর্থত, মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রোযার প্রচলন ছিল। প্রত্যেকটি মুসলমান প্রতি বছর রমযানের পুরো মাস রোযা রাখতো। অর্থাৎ ইসলাম আরোপিত ফরযগুলো পালন করার ব্যাপারে মুসলমানরা অত্যন্ত সজাগ ছিল।

পঞ্চমত, বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি একটা পৃথক চেহারা নিতে শুরু করেছিল। অমুসলিমদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার জন্য মুসলমানরা মাথায় টুপি পরতো। হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের মতো মাথায় বড় বড় চুল রাখতো না। বরং মাথায় চুল ছাঁটতো এবং দাড়ি রাখতো। আর তারা ধুতি ছেড়ে ইজার বা ঢোলা পাজামা পরতো।

এভাবে মুসলমানরা একদিকে ইবাদত-বন্দেগীতে এবং অন্যদিকে চেহারা-সুরাতে স্থানীয় অমুসলিম সমাজ থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছিল।

শাসন ব্যবস্থায় ইসলাম

বাংলাদেশে সাড়ে পাঁচ'শ বছরের অধিককাল মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুর্কী, আফগান ও মোগল শাসনকর্তা, সুলতান ও নবাবগণ এ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। জালালুদ্দীন ওরফে যদু এবং নবাব মুর্শিদ কুলী খানের ন্যায় এ দেশীয় কয়েকজন শাসকও কয়েক বছর বাংলাদেশ শাসন করেন। এ সাড়ে পাঁচ'শ বছরের মধ্যে আবার দু'শ-আড়াই'শ বছর চলেছিল স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব। বাংলা তখন দিল্লীর অধীনে ছিল না। বাংলার সুলতানগণই বাংলাদেশে শাসন করতেন। মোগল শাসনের শেষের দিকে মুর্শিদাবাদের নবাবগণও প্রায় অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

মদীনার ইসলামী খিলাফতের অবলুপ্তির প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ বছর পর বাংলাদেশে এ মুসলিম শাসনকাল শুরু হয়। মদীনার ইসলামী খিলাফত বা খিলাফতে রাশেদার পর ইসলামী বিশ্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রচলন করেন উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ। তাঁদের পর এ পথে অগ্রসর হন আব্বাসীয় বাদশাহ্‌গণ। দুর্ভাগ্যক্রমে

মুসলিম ও ইসলামী ইতিহাসের পাতায় তাঁরা সবাই খলীফা নামে পরিচিত। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) যেমন খলীফাতুর রাসূল বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফা ছিলেন এবং রাসূলের নীতি ও আদর্শ থেকে একচুল বিচ্যুত না হয়ে তাঁর নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের এ উমাইয়া (মাত্র একজন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজকে বাদ দিলে) ও আব্বাসীয় বাদশাহগণের ক্ষেত্রে সে কথা পুরোপুরিভাবে বলা যায় না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের আমলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ও সমাজের সমস্ত ব্যাপারের মীমাংসা করা হতো। এমন কি আইন ব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্র এ প্রাধান্য উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ও দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। রিয়াযের বর্ণনা মতে প্রথম মুসলিম শাসক মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী লাখনৌতিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেই ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তন শুরু করেন।[১২] কিন্তু আইন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বাংলায় মুসলিম শাসন এর ব্যতিক্রম ছিল না।

খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে দেশ ও রাষ্ট্রের মালিক ছিলেন আল্লাহ এবং জনসাধারণ ছিল আল্লাহ্র প্রজা। কাজেই প্রজাপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে—এ কথা কেবল মুখে বলা হতো না, আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া হতো এবং কর্মের মাধ্যমে এ বিশ্বাসের পূর্ণ প্রমাণ পেশ করা হতো। সেখানে রাষ্ট্র জনগণেরও মালিক বা প্রভু ছিল না এবং জনগণও রাষ্ট্রের গোলাম ও দাস ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালকগণ আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ বন্দেগী ও দাসত্ব করতেন অতঃপর আল্লাহ্র প্রজাদের ওপর আল্লাহ্র আইন জারি করতেন। কিন্তু উমাইয়া বাদশাহগণের সময় থেকে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনা হবার পর থেকে আল্লাহ্র একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারণা কেবল মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। মূলত বাদশাহ, শাহী খান্দান, আমীর-উমরাহ ও রাজকর্মচারীরাই দেশের সব কিছুর এমনকি জনগণেরও মালিক ও প্রভু হয়ে বসলেন এবং জনগণ পরোক্ষভাবে তাদের দাসে পরিণত হলো। বাংলাদেশে তুর্কী, আফগান ও মোগল শাসন এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং মুসলিম বিশ্বের সাড়ে পাঁচ'শ বছরের রাজতান্ত্রিক শাসনের পর যখন বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলার মুসলিম শাসকবর্গ সম্ভবত ইসলামী খেলাফতের এ

বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের কোন সুলতান বা নবাব অন্ততপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে পুরোপুরি জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতেন এমন কোন আভাস তাদের কার্যাবলী থেকে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনেকেই আল্লাহ্র বন্দেগী ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিকতাসম্পন্ন ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে কেউ কেউ পরিপূর্ণ মুসলমানের জীবনও যাপন করেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা নিজেদেরকে দেশের ও জনগণের যথার্থ মালিক মনে করেছিলেন এবং জনগণের মানসম্ভ্রম, ইজ্জত-আবরু ও তাদের শক্তি-সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছেন।

দিল্লীর শাসনকর্তাদের মধ্যে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। তৈমুর বংশের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জাহিলী রাজকীয় ঐতিহ্য সত্ত্বেও আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির ধারণা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এ জন্য তিনি বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শাসক সমাজের যাবতীয় কার্যাবলীর ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন, যাতে জনগণের ইজ্জত-আবরু ও তাদের ধন-সম্পদের উপর কোন প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ না হয়। একবার তাঁর নিযুক্ত বাংলাদেশের সুবাদার শাহজাদা আজিমুশ্শান জনগণের সম্পদকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। চাটগাঁও ও অন্যান্য বন্দরে বিদেশী বণিকরা যেসব পণ্যদ্রব্য আমদানি করতেন শাহজাদার পক্ষ থেকে সেগুলো ক্রয় করে নেয়া হতো। তাকে বলা হতো সওদায়ে খাস। অতঃপর সে সব পণ্যদ্রব্য চড়াদরে দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হতো। তাকে বলা হতো সওদায়ে আম। এভাবে শাহজাদা বিপুল অর্থ উপার্জন করতেন। দিল্লীতে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি শাহজাদার কাছে লিখে পাঠালেন : "জনগণের উপর অত্যাচারকে সওদায়ে খাস বলার যথার্থতা কি ? এবং সওদায়ে খাসের সাথে সওদায়ে আমের সম্পর্ক কি ? যারা ক্রয় করে তারা বিক্রি করে। আমরা ক্রয় করি না, বিক্রিও করি না।" এর সাথে তিরস্কার করে ভবিষ্যতে এরূপ না করার নির্দেশ দেন এবং শাস্তি-স্বরূপ তাঁর মনসবের নির্ধারিত সৈন্য সংখ্যা ৫০০ কমিয়ে দেন।[১৩] এতদসত্ত্বেও মোগল শাহজাদা ভবিষ্যতে সিংহাসনের লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করতেন। মুর্শিদ কুলী খান দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ায় শাহজাদার এ অবৈধ অর্থ সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়।[১৪]

খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র পৃথিবীতে তাঁর মনোনীত সৎকর্ম ও সৎবৃত্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত করা এবং অসৎবৃত্তি ও অসৎকর্মসমূহের বিলোপ সাধনা করা। কিন্তু বাংলাদেশে মানবীয় কর্তৃত্ব ভিত্তিক যে

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার উদ্দেশ্য নিছক রাজ্য জয়, মানুষের উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তার, প্রজা নিপীড়নের মাধ্যমে কর আদায় এবং ঐ অর্থে রাজকীয় জাঁক-জমক দেখানো ও বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাংলার সাড়ে পাঁচ'শ বছরের মুসলিম শাসনামলে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন শাসনকর্তাকে ক্ষমতার মসনদে বসতে দেখা যায়নি। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন শাসনকর্তা ইসলাম প্রচারে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অনেকেই আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণের ইসলাম প্রচার প্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের, তাঁদের পারিষদবর্গ ও প্রশাসকমণ্ডলীর সাহায্যে অসৎ কাজের প্রসার ঘটেছে ও সৎ কাজের গতি মন্দীভূত ও তার সীমানা সংকুচিত হয়েছে। সংখ্যাগুরু অমুসলিম সমাজ ও বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরিত এ দেশীয় মুসলমান সমাজের নৈতিক জীবন-গঠনের কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সুলতান, নবাব ও উচ্চ পদস্থ শাসক সমাজের অনভিপ্রেত জীবনধারা ও ইসলামী অনুশাসন বিরোধী নীতি-প্রকৃতির প্রভাবে সাধারণ মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে। সুলতান ও নবাবদের বিলাসিতার কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, তাঁদের অধীনস্থ জমিদারগণও কম বিলাসী ছিলেন না। ষোল শতকের কবি বিপ্রদাসের বর্ণনা মতে, হাসান নামক জনৈক মুসলিম জমিদারের ১০০টি উপপত্নী সর্বক্ষণ তাঁর হারেম অলংকৃত করে থাকতো।[১৫] ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পর্তুগীজ বারবোসা বাংলাদেশের একটি প্রধান বন্দরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "................... তারা খুব বিলাসী, মেয়ে-পুরুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্যপানে অভ্যস্ত। প্রত্যেকের ৩/৪ বা ততোধিক স্ত্রী। .... নৃত্য-গীত তাদের খুব প্রিয়"।[১৬]

কোন কোন ক্ষেত্রে শাসক সমাজের অসৎ কাজে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খান সুবাদার শাহজাদা আজিমুশ্শানের অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি দেওয়ানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি থেকেও মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী প্রতিষ্ঠিত এ মুসলিম রাষ্ট্রটি ছিল বহুদূরে অবস্থিত। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি ছিল তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি। এ অলংকারে রাষ্ট্রপ্রধানগণ সর্বাধিক সুসজ্জিত হতেন। রাষ্ট্রের কর্মচারীবৃন্দ, বিচারপতি ও সেনাপতিগণও এ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হতেন। অতঃপর সমগ্র সমাজ ক্ষেত্রে এর ধারা প্রবাহিত হতো ব্যাপকভাবে। কিন্তু রাজতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠিত বখতিয়ার খলজীর মুসলিম রাষ্ট্রটি এ

প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল না। সাড়ে পাঁচ'শ বছরের শাসনামলে ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে এ গুণের আংশিক বিকাশ দেখা গেলেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রে এ গুণটির কোন গুরুত্ব ও কদর ছিল না। সেখানে ছিল জাহেলী রাজতন্ত্র ও ব্যক্তি একনায়কত্বের অবাধ বিচরণ ও প্রতিপত্তি। শাসক সমাজ আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বক্ষণ ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকার পরিবর্তে জনসাধারণ সর্বদা শাসকবৃন্দের ভয়ে আতঙ্কিত থাকতো। শাসক সমাজের জুলুম ও অত্যাচার কোন্ সময় কোন্ দিক দিয়ে হানা দেবে এ আশঙ্কায় প্রজাসাধারণের চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করতো। হোসেন শাহ লাখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজের সিংহাস লাভের বিনিময়ে তাঁর সমর্থকবৃন্দকে ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত লাখনৌতি নগরী লুণ্ঠন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনদিন পর্যন্ত এ লুণ্ঠন চলেছিল। এমনকি অবশেষে সুলতান নিজেও এ লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করে তের'শ সোনার বাসনসহ বহু লুকানো সম্পদ হস্তগত করেন।[১৮]

আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও প্রাণশক্তির দিক দিয়ে অনেক নিম্নস্তরের ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ঐ মানদণ্ডের ধারেকাছেও পৌঁছেনি। অতঃপর এ মুসলিম রাষ্ট্রটির শাসনতান্ত্রিক ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে সেখানে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুশীলিত বহু গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ধারা কেবল অবহেলিতই নয় অবদমিতও হয়েছে। যেমন একটি ইসলামী ও মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে, জনসাধারণকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করা। সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের বিলোপ সাধনকে ইসলাম কেবল প্রত্যেক মুসলমানের অধিকারই নয়, তার কর্তব্য বলেও গণ্য করেছে। ইসলাম দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেকটি ত্রুটির বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার দান করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ অধিকারের কোন স্বীকৃতিই ছিল না। সুলতান ও নবাবদের দরবারে সত্যভাষীদের পরিবর্তে চাটুকারদের প্রতিপত্তিই ছিল বেশি।

খোলাফায়ে রাশেদীন অনুশীলিত ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল এই যে, বায়তুলমাল (ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার) আল্লাহ্‌র সম্পত্তি ও মুসলমানদের আমানত। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ ছাড়া অন্য পথে কোন জিনিস তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌র পথ ছাড়া অন্য পথে তা ব্যয়িত হওয়াও উচিত নয়। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালকগণও তা থেকে নিজেদের ভরণ-পোষণের অধিক অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। বাংলার সাড়ে পাঁচ'শ বছরের মুসলিম শাসনামলে এ ধারাটিকে

এমনভাবে বিস্মৃত করা হয়েছিল যেন মনে হয়েছিল কোন মুসলিম দেশের সরকারের এ ধরনের কোন নীতি আদৌ কোন দিন ছিলই না। এখানে জনগণের অর্থ-সম্পদকে এমনভাবে নিজের মনে করা হয়েছে এবং এমন নির্দয়ভাবে তা খরচ করা হয়েছে যে, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ন্যায় একজন উচ্চ পর্যায়ের ইসলাম জ্ঞানসম্পন্ন শাসক শুধুমাত্র তাঁর লিখিত ফার্সী কবিতার একটি চরণ মিলাবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে ইরানের কবি হাফিজ শিরাজীর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, মুসলিম শাসনামলে কিভাবে জনগণের অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত একটি মাত্র শাসনতান্ত্রিক ধারাকে কিছুটা কার্যকর করা হয়েছিল। তা হচ্ছে, কারো সত্তা আইনের (আল্লাহ্ ও রাসূলের) উর্ধ্বে বিরাজ করবে না। দেশের একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে রষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার ওপর আইনের অবাধ রাজত্ব চলবে। ইনসাফের ব্যাপারে কারোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। এ ব্যাপারে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ও নবাব মুর্শিদ কুলী খান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দেশে দীর্ঘকাল ন্যায় বিচার ও আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলাদেশের মানুষ ইসলামী শাসনতন্ত্রের এ একটিমাত্র ধারার কিছুটা সুফল ভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাতেই তাদের জীবন দীর্ঘকালীন শান্তি, শৃংখলা ও প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়

বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ না করলে সম্ভবত এ ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করবে না। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের এ বিপর্যয়ের কাহিনী অত্যন্ত করুণ। তবে ইতিহাস পাঠ ও ইতিহাস আলোচনা প্রকৃতপক্ষে জীবন গঠনের একটি উপাদান। এ উপাদান পরিবেশনের জন্যই আমাদের এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম এবং মুসলমানদের সমাজ দুনিয়াজোড়া। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আবহাওয়া, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় এ সমাজ গড়ে উঠেছে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজগুলোর মধ্যে একটি সুগভীর ঐক্য ও মিল দেখা যায়। এর কারণ, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে এ সমাজ গড়ে উঠেছে। অন্ততপক্ষে ইসলামের মূল ভিত্তিগুলো এ সব সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ মূলগত অভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠতার পার্থক্য হেতু বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম সমাজের এ প্রাণশক্তি ও লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠতার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার

করেছে সংশ্লিষ্ট দেশের জাহেলী সমাজ-পরিবেশ ও ভাবধারা। এভাবে জাহেলিয়াতের আক্রমণে দেশে দেশে মুসলিম সমাজ বিপর্যস্ত হয়েছে।

আমাদের এ দেশে মুসলিম সমাজের উপর জাহেলিয়াতের আক্রমণ যে সময় সংঘটিত হয়েছে তার অনুপ্রবেশ হয়েছে তারও কয়েক'শ বছর আগে। এ জাজ্বল্যমান সত্যটি উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট করে নিতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, এদেশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী হিন্দু জাতি ও বৃহত্তম ধর্ম হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সূফীবাদের গঠনাকৃতি। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, তুর্কী ও মোগল শাসকদের কার্যকলাপ।

এ গ্রন্থের প্রথম দিকে প্রাক-ইসলাম যুগে এ দেশে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর কিছুটা প্রাথমিক আলোকপাত করেছি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর ব্রাহ্মণ্য ধর্মও এক ব্যাপক পৌত্তলিক ধর্মের রূপ লাভ করেছিল। বিশাল ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম এ পৌত্তলিক ধর্মের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ-কলুষিত পরিবেশকে নির্মল করার জন্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে বৃহত্তম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। তাও একদিন ধীরে ধীর ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক ধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের এই বিলুপ্তির কারণও আমরা এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছি। এ সব আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বৈদিক আর্য ধর্ম, যার পরবর্তী রূপ ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক ধর্ম, মূলত প্রচণ্ড রক্ষণশীল শক্তির অধিকারী। হিন্দুস্তানে প্রবেশের পর আর্য জাতি একদিকে উন্নততর সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড়দের নগর ও সভ্যতার বিলোপ সাধান করে এবং অন্যদিকে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করে রাখে। আর্য ও দ্রাবিড়দের এ সংঘাত হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকে। আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এ সংঘাতের সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। আর্যদের আগমনের পর এ উপমহাদেশে যতগুলো জাতির আগমন হয়েছে তারা কেউ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। আর্য ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। তবে দ্রাবিড় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট পড়ে। যার ফলে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ লাভ করে।

ইসলামের আগমনকালে এ পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতিই ছিল ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। ভারতবর্ষীয় এ পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক খণ্ড নিজের সমর্থনে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মতবাদ দাঁড় করিয়ে

রেখেছিল। এ দার্শনিক মতবাদগুলোর চর্চাও নেহায়েত কম হয়নি। মুসলমানরা এ সমস্ত ধর্ম ও দর্শনকে এক কথায় হিন্দু ধর্ম আখ্যা দিয়েছিল। ইসলামের আগমনের পর এ হিন্দু ধর্মের সাথে তার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। কারণ দুনিয়ার বুক থেকে যাবতীয় শির্‌ক, কুফরী, অন্যায়, অসত্য ও জুলুম নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যই ইসলামের আগমন। কাজেই ইসলাম কোন ক্রমেই শির্‌ক ও অন্যায়ের সাথে আপোস করতে পারে না। কিন্তু উপমহাদেশে ইসলাম তার এ সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ অতি অল্পই পেয়েছে। এর ফলে হিন্দু ধর্ম ও দর্শন তার পুরাতন আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করার সুযোগ পেয়েছে এবং পৌত্তলিকতাবাদী দর্শন ও সংস্কৃতির বেড়াজালে মুসলিম সমাজও আক্রান্ত হয়েছে।

মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় জানার জন্য দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা প্রয়োজন তা হচ্ছে, সূফীবাদের গঠন-প্রকৃতি। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফী ও দরবেশগণই বৃহত্তম ভূমিকা পালন করেছেন। কাজেই সূফীদের ধর্ম-চিন্তা ও ধর্ম-পালন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। সূফীবাদের উৎপত্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক পরে, এতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। এমনকি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কেউই এ নামে চিহ্নিত হননি।

ইসলামের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য কুরআন ও হাদীসে দীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় দীন অর্থ জীবন বিধান বা জীবন পদ্ধতি। ইসলাম জীবন বিধান ও জীবন পদ্ধতি হবার কারণে ব্যবহারিক জীবনের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বস্তুত রাসূলে করীম (সা) তাঁর সমগ্র ব্যবহারিক জীবনেই এ দীন ইসলাম পালন করে গেছেন। কাজেই পরিপূর্ণ ইসলাম পালনের জন্য সংসার জীবন যাপন অপরিহার্য। সংসার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার একটি চূড়ান্ত পর্যায় ইসলাম নির্দিষ্ট করেছে। রাসূলে করীম (সা) এ পর্যায়কে 'ইহ্‌সান' নামে অভিহিত করেছেন।[১১] এর সাথে সাহাবাগণকে তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। 'লা রাহবানীয়্যাতা ফিল ইসলাম'—ঘোষণার মাধ্যম তিনি সংসার বৈরাগ্য ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য অন্যান্য ধর্ম আচরিত কৃচ্ছ্রসাধনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে সংসার বৈরাগ্য ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে কৃচ্ছ্রসাধকদের আবির্ভাব দেখা যায় এবং কালক্রমে তাঁরা সূফী নামে অভিহিত হন। খৃস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবূ হাশিম শামীই সর্ব প্রথম সূফী নামে পরিচিত হন। সূফী শব্দের অর্থ সম্পর্কে বহু মতের অবকাশ থাকলেও

মূলত সূফী বলতে পশমী বস্ত্রধারী আল্লাহপ্রেমিক ভাবুক ওলী-দরবেশই বোঝানো হয়েছে। খৃস্টীয় অষ্টম শতকে তুর্কীস্তান অতিক্রম করে চীন পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় অভিযান চলে। অচিরেই বুখারা, সমরকন্দ, তুর্কীস্তান ও আফগানিস্তান ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। খৃস্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ সম্রাট কনিষ্কের সাম্রাজ্য এ সমস্ত ধর্ম এলাকায়ও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কাজেই বৌদ্ধ ধর্ম এ সব এলাকায় দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। সেকালে বল্‌খ শহর বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ জন্য পরবর্তীকালেও এখানে বহু সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধ মঠের কথা শোনা গেছে।[২০] মুসলিম আমলে এ বল্‌খ শহর মুসলিম সূফীদেরও একটি অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সম্রাট কনিষ্কের আমলে বৌদ্ধদের যে চতুর্থ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় তাতে বৌদ্ধধর্ম মহাযান ও হীনযান এ দু'ভাগে বিভক্ত হয় এবং গৌতম বুদ্ধের আসল শিক্ষা হীনযানীরা গ্রহণ করে। এ শাখায় নামান্তর থেরবাদ বা স্থবিরবাদ। হীনযানী বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা সিংহল, বর্মা ও শ্যামদেশে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানের আশ্রয়ে লালিত হয়।[২১] কাজেই সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মই সম্রাট কনিষ্কের আমলে আফগানিস্তান, ইরান, তুর্কীস্তান, সমরকন্দ, বুখারা ও বল্‌খ প্রভৃতি এলাকায় ও শহরে বিস্তার লাভ করেছিল। এ জন্য মুসলিম সূফী-সাধকগণ যে সংশ্লিষ্ট এলাকার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ইরানের জরথুস্ত্রবাদী যোগী-সন্ন্যাসীদের সাধন পদ্ধতি দ্বারা বেশ কিছু প্রভাবিত হয়েছেন, সঙ্গত কারণেই তা বলা চলে। যেমন মওলানা রুমী (১২০৭–১২৭৩ খৃ.) মওলবী দরবেশ মণ্ডলী ও নৃত্যশীল দরবেশ দল নামে অভিহিত একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এ দরবেশ দল বিশেষ পোশাক পরিধান করে ঢোল, তাম্বুরা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান, ভজন নৃত্য করতেন। মওলানা জালালুদ্দীন রুমী এভাবে কোলাহল ও সঙ্গীতের দ্বারা আকর্ষণ সৃষ্টি করে পৌত্তলিকদেরকে তন্দ্রালুতা থেকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন।[২২] ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব বাংলাদেশে এ পদ্ধতিরই অনুবর্তন করেছিলেন। মওলানা রুমী আবিষ্কৃত এ 'তাসাউফের' কোন সূত্রই ইসলামী 'ইহ্‌সান'-এ পাওয়া যাবে না। বলাবাহুল্য, ইসলামের বাইরের তৎকালীন অন্য কোন সাধন পদ্ধতির সাথে হয়তো এর কোন সামঞ্জস্য থাকতে পারে।

এর দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছেন কাযী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী। তিনি ৬১৫ হিজরীর ৯ জমাদিউস-সানীতে (১২১৮ খৃ.) বুখারায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাংলাদেশে আসেন। কথিত আছে, সুলতান আলী মর্দান খলজী (১২১০–১২১৩ খৃ.) তাঁকে লাখনৌতির কাযীর পদে নিয়োগ করেন। এ সময় উপমহাদেশে দ্রুত ইসলাম

বিস্তারের কথা শুনে কামরূপ থেকে ভোজর ব্রাহ্মণ নামক জনৈক যোগী ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে আসেন। ক্রমে ভোজর ব্রাহ্মণ লাখনৌতিতে এসে পৌছেন এবং এক শুক্রবারে লাখনৌতির জামে মসজিদে হাজির হয়ে মুসলমান আলেম ও সাধু পুরুষদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। লোকেরা তাঁকে কাযী রুকনুদ্দীন সমরকন্দীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। কাযী ও যোগীর মধ্যে ধর্ম বিষয়ে বহু আলাপ-আলোচনা চলে। ফলে ভোজর ব্রাহ্মণ ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে এতই পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে, মুসলিম আলেম সমাজ তাঁকে বিতর্কিত বিষয়ে 'ফতওয়া' দানের অধিকারও প্রদান করেন। এ ভোজর ব্রাহ্মণ কাযী রুকনুদ্দীনকে 'অমৃত কুণ্ড' নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থ উপহার দেন। কাযী সাহেব আরবী ও ফার্সী ভাষায় তার অনুবাদ করেন। বলাবাহুল্য, শুধু অনুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং নিজেই ঐ গ্রন্থের শিক্ষা অনুসারে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ফলে ঐ সাধনায় সাফল্য লাভ করে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই যোগীদের মর্যাদায় উন্নীত হন।[২৩] মুসলিম সূফীদের কাছে গ্রন্থটি এতই আদৃত হয়েছিল যে, কাযী রুকনুদ্দীন সমরকন্দীর পর আরো কেউ কেউ এর আরবী ও ফার্সী অনুবাদ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন পরে কামরূপের অধিবাসী অমভবনাথের সাহায্যে এর একটি আরবী অনুবাদ হয়েছিল। অমভবনাথও ভোজর ব্রাহ্মণের ন্যায় যোগী ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অনুবাদকের নাম না পাওয়া গেলেও বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ব্রকেলম্যানের মতে, দামিশকের বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে আরাবী কর্তৃক গ্রন্থখানি আরবীতে অনূদিত হয়। গোয়ালিয়রের বিখ্যাত সাত্তারী সূফী গওসীও এর ফার্সী অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত মিসরীয় সূফী আল মিসরীও (যুন্নুন মিসরী) অমৃত কুণ্ডের সাথে পরিচিত ছিলেন। অমৃত কুণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এর আরবী ও ফার্সী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দৃষ্টিগোচর হয়। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এর পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।[২৪] অমৃত কুণ্ডের একটি আরবী অনুবাদ 'হাওযুল হায়াত' শীর্ষক Journal Asiatique-এর ২৯৩ শ' খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সূফী গওসীর ফার্সী অনুবাদটির নাম ছিল 'বাহরুল হায়াত'। এর আরবী অনুবাদটিতে ক্ষুদ্র সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সাররূপী মানুষ ও তাদের মনের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যোগচর্চা ও রিপু দমনের উপায়ও বর্ণিত হয়েছে এবং জীবন-মরণের বিভিন্ন রূপ এবং সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে। 'দাবিস্তানূল মাযাহিব'—এর লেখক মুহসিন ফানী নাথ ধর্ম ও যোগ সাধনা আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, অমৃত কুণ্ড গুরু গোরক্ষনাথের

অনুসারীদের ধর্মীয় গ্রন্থ।[২৫] উল্লেখ্যযোগ্য যে, গুরু গোরক্ষনাথ ছিলেন নাথ পন্থীদের ধর্মীয় নেতা মীননাথের শিষ্য। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হবার পর বাংলায় যে সহজিয়া ধর্মমতের উদ্ভব হয় তার সাথে হিন্দু যোগবাদের মিশ্রণের ফলে এ নাথ ধর্মের সৃষ্টি।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সূফী সমাজে অমৃত কুণ্ডের বিপুল জনপ্রিয়তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সূফীদের চিন্তা ও সাধন পদ্ধতির মধ্যে ভারতীয় দর্শন কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। ত্রয়োদশ শতকের পর এ অনুপ্রবেশ আরো ব্যাপক হয়। অথচ এগার শতকের সূফীকুল চূড়ামণি হযরত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী আলহিজবিরী (র)[২৬] তাঁর 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে শরীয়তের সাথে সূফীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি ঘটনার অবতারণা করে বলেছেন ঃ 'একদিন হযরত আবূ হামযা বাগদাদী (র) হযরত মুহসেবী (র)-এর কাছে আসেন। সেখানে আল্লাহপ্রেমে আত্মহারা অবস্থায় তিনি এমন একটি অঙ্গভঙ্গী করে বসেন যার সাথে হুলুলীদের (মুশরিকদের কোন সম্প্রদায় বিশেষ) কার্যকলাপের সাদৃশ্য ছিল। হযরত মুহসেবী বিনম' ক্রুদ্ধ হয়ে ছড়ি নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বেদম প্রহার করতে করতে তিনি তাঁকে একবারে মেরে ফেলারই পরিকল্পনা করেন। ছড়ির আঘাত করতে করতে তিনি বলতে থাকেন اَسْلِمْ يَامَطْرُوْدُ كَفَرْتَ (অর্থাৎ—হে ইসলাম দ্রোহী, তুমি কাফির হয়ে গেছ, আবার ইসলাম গ্রহণ কর।) উপস্থিত মুরীদগণ তাঁর পা জড়িয়ে ধরেন এবং কাকুতি-মিনতি করে আবূ হামযাকে তাঁর হাত থেকে রক্ষা করেন। মুরীদগণ বললেন, আমরা সবাই তাঁকে আল্লাহ্র বিশিষ্ট ওলীগণের মধ্যে গণ্য করি এবং তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান তৌহীদপন্থী মনে করি। জবাবে তিনি বললেন, এতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এমন কাজ করছেন যার সাথে হুলুলীদের সাদৃশ্য রয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ مَنْ تَشَابَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(অর্থাৎ—যে ব্যক্তি অন্য জাতির সদৃশ কাজ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে)। এ ছাড়াও তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التُّهَمِ

(অর্থাৎ—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতকে মানে তার নিজেকে কোন সন্দেহপূর্ণ স্থানে গমন থেকে রক্ষা করতে হবে)। এ কথা শুনে হযরত আবূ হামযা বললেন, হে শায়খ, যদিও নিগূঢ় সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কোন অন্যায় করিনি কিন্তু বাহ্যত আমার কাজ যেহেতু একটি পথভ্রষ্ট জাতির সদৃশ ছিল তাই

আমি তওবা করছি এবং আমি যা করেছিলাম তা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনছি।[২৭] হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) বলেছেন ঃ "শরীয়তের আকীদা-বিশ্বাসের উপর অবিচল প্রত্যয় এবং ফিক্‌হের বিধানসমূহ সহজভাবে মেনে চলার মতো মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাসাউফের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তাসাউফের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।"[২৮]

এডওয়ার্ড ফেন্ডিক নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁর 'ইকতিফা উল কুনু বিমা হুয়া মাতবু' নামক গ্রন্থে সূফীদের দীর্ঘ তালিকা দেবার পর বলেছেন ঃ বর্তমান যুগে যাদেরকে সূফী নাম দেয়া হয় তাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী যুগের সূফীদের পদ্ধতি অনুসরণ করেন না—বরং তাঁরা ইসলামের কোন নিয়ম-নীতিরই অনুসরণ করেন না। (১৮১ পৃষ্ঠা)

মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী তাঁর 'তারিখে তাসাউফকে চান্দ আওরাক' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "প্রথম যুগের সূফীদের গ্রন্থাদি পাঠ করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, পূর্ববর্তী সূফীদের কর্মপদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে যেসব বিদ'আতকে তাসাউফের নিদর্শন বলে ধরে নেয়া হয়েছে তরিকতের প্রধান আলেমগণ তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"[২৯]

এ থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সূফীদের মধ্যে একদল শরীয়তের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং অন্য একদল ছিলেন যারা শরীয়তের বাইরের কোন পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে ইতস্তত করেননি। বাংলাদেশে সূফীদের এ দ্বিতীয় দলটির সংখ্যাই অধিক এবং এর আধিক্য ঘটে আমাদের কল্পিত ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়ে। এটিই ছিল পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের মূলে আর একটি শক্তি কাজ করেছে, সেটি হচ্ছে তুর্কী ও মোগল শাসকদের কার্যকলাপ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামের মধ্যে তুর্কীদের আগমন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। এ কারণে তারা রাজতন্ত্রে যেমন পাকা-পোক্ত ছিলেন, ইসলামে তেমনটি ছিলেন না। দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের কৃতিত্ব। সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে সঠিক নেতৃত্ব দান করার যোগ্যতা তাদের ছিল না। মোগল শাসকদের ক্ষেত্রে এ কথাটিতো আরো ভয়াবহরূপে সত্য। মোগল শাসনামলের শুরুতেই ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলে। মোগল বাদশাহ আকবরের বিভ্রান্ত চিন্তাও বাংলায় পৌঁছে যায়। মোগল বাদশাহদের মধ্যে

আকবর ছিলেন সবাইতে অশিক্ষিত। আকবরের প্রথম জীবনটি অত্যন্ত দুর্যোগময়। শের শাহের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিংহাসনহারা হয়ে হুমায়ূন যখন পলায়নে তৎপর ছিলেন তখন পথে আকবরের জন্ম। এ ভাগ্য-বিপর্যয়কালে দেশ থেকে দেশান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করার কারণে পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হুমায়ূনের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। অতঃপর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পরপরই হুমায়ূনের মৃত্যুতে অল্প বয়সে আকবরকে রাজ্যশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। একদিকে তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং অন্যদিকে শূন্য জ্ঞানভাণ্ডার আর এই সাথে বিপুল ক্ষমতা—একটি মানুষের চরম গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট। তিনি দেখলেন, তিনি বিপুল সংখ্যাগুরু বিধর্মীর বাদশাহ। সংখ্যালঘু মুসলমানদের সামরিক মেরুদণ্ডরূপী তুর্কী ও পাঠানরা তাঁর বিরোধী। কাজেই এ অবস্থায় সংখ্যাগুরুদের মনতুষ্টির মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক সাফল্য নিহিত। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত সভাসদগণ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলেন। তাঁরা বোঝালেন, সহস্র বছর পরে ইসলাম পুরাতন ও অকেজো হয়ে গেছে, কাজেই নতুন ধর্মমতের প্রয়োজন। আর এ ধর্মের পয়গম্বর হবার যোগ্যতা ও অধিকার দিল্লীশ্বর ছাড়া আর কার বেশি আছে? কাজেই হিন্দুস্তানের সমস্ত জাতিকে গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো একাকার করে দেবার জন্য তৈরী হল 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম। সব ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো এর মধ্যে গৃহীত হলো, বাদ দেওয়া হলো শুধু ইসলামকে।* কারণ তিনি সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বন্ধুত্ব চান। নিজেও ইসলামের বহু বিধি-নিষেধ অমান্য করতে লাগলেন। তিনি কপালে চন্দন লাগাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতে লাগলেন। সকাল-সাঁঝে সূর্য বন্দনাও শুরু করে দিলেন। হিন্দুরা দেশে মূর্তি পূজার অবাধ অধিকার লাভ করলো। আর অন্যদিকে মুসলমানেরা বহু ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হতে বঞ্চিত হলো। বাদশাহর হারেমে নিয়মিত অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজা চলতে লাগলো। বাদশাহ নিজে হিন্দু ললনার পাণি গ্রহণ করলেন। দরবারে হিন্দুরা বাদশাহকে ভগবানের আসনে বসালো এবং 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো' ধ্বনি উঠালো। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। হিন্দুস্তানে ইসলামের এ দুর্দিনে ইরান থেকে বিতাড়িত ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন 'মুলহিদ' বা 'মালাহিদা' সম্প্রদায় দলে দলে এসে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে। মালাহিদাদের ইসলাম বিরোধী শিক্ষা আকবরের গৃহীত মতবাদের সাথে মিলে যাওয়ায় তিনি তাদেরকে সাদরে দরবারে স্থান দেন। তাদের নেতারা ধর্মীয় ব্যাপারে বাদশাহর গোপন উপদেষ্টায় পরিণত হয়।[৩০] আকবরের এ ধর্মদ্রোহিতার

---

* আজকের যুগের মুসলিম সমাজের সেক্যুলার ও নাস্তিকদের সাথে এর বেশ মিল আছে। তারা অন্য সব ধর্মকে তবু কিছুটা বরদাশ্ত করতে পারে কিন্তু ইসলামকে মোটেই নয়।

ঢেউ বাংলার অভ্যন্তরেও পৌঁছেছিল। আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' ব্যর্থ হলেও তাঁর ইসলাম বিরোধী চিন্তার অনিষ্টকর প্রভাব সারা দেশের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এ চিন্তার প্রভাবকে বহুলাংশে দূরীভূত করে।

আকবর ও তাঁর পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজ দুর্দশার কোন্ স্তরে উপনীত হয়েছিল নিম্নোক্ত তথ্যগুলো থেকে জানা যাবে। এক. যেখানে মানসিংহ ও রাজা টোডরমলের ন্যায় আকবরের ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ হিন্দু সহচরগণ তাঁর দীন-ই-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হননি, সেখানে শায়খ আবদুন নবী ও মওলানা মখদুমুল মুলকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতাগণসহ দরবারের প্রায় সকল মুসলিম সভাসদই তাঁর রচিত 'রায়েত নামায়' স্বাক্ষর দেন। দুই. নওরোজ উৎসবের সময়ে শাহী মহলে আমন্ত্রিত মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ধর্মীয় নেতাগণকে বাদশাহ সুরা পানের আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁরা কৃতজ্ঞচিত্তে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাদাউনী আলেম সমাজের এ মর্মন্তুদ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিন. জাহাঙ্গীর রাতে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর জমিয়ে তুলতেন। শাহীমহলে সর্বপ্রকার ইউরোপীয়ের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং জাহাঙ্গীর এ সব ইউরোপীয়ের সাথে ভোর রাত পর্যন্ত সুরা পানে মত্ত থাকতেন। চার. আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে সালাম প্রথা রহিত করা হয় এবং মুসলমানদেরকে নতজানু হয়ে বাদশাহকে সিজ্‌দা করতে বাধ্য করা হতো। পাঁচ. এ সময় আইন করে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয় এবং মুসলমানদেরকে বহু অনৈসলামী আইন ও ফরমান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। ছয়. মসজিদগুলো মেরামত করার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হতো না। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও মেরামতের অভাবে বহু মসজিদ ভেঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অনেক মসজিদ হিন্দুরা ধ্বংস করে দেয় অথবা মন্দির ও নাট্যশালায় রূপান্তরিত হয়। জাহাঙ্গীরের সমকালীন বিজাপুরের মসজিদগুলো সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন ঃ "হিন্দুরা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তিপূজা করতো এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে দেবদেবীর বন্দনা গীত গাইতো।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় এভাবে ইসলামকে ধ্বংস করার দেশব্যাপী চক্রান্ত চলে। যথাসময়ে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর (১৫৬৩–১৬৩৪ খৃ.) বলিষ্ঠ কণ্ঠ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে সতর্ক করে দিতে সক্ষম হয়। আলফেসানীর নিম্নোক্ত দাবিগুলো বাদশাহ মেনে নেন।

১. বাদশাহকে সিজদা করার রীতি সম্পূর্ণরূপে রহিত করতে হবে।

২. মুসলমানদেরকে গরু জবেহ করার অনুমতি দিতে হবে।

৩. বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদেরকে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে হবে।

৪. কাযীর পদ ও শরীয়ত বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫. সমস্ত বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী অনাচারকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

৬. ইসলাম বিরোধী আইনগুলো রহিত করতে হবে।

৭. ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদগুলো আবাদ করতে হবে।[৩১]

এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো ছাড়াও সে সময় বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার ধর্মের ছদ্মাবরণে উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিকড় গেড়ে বসেছিল মুজাদ্দিদে আলফেসানী সেগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। সূফী সাহেবানদের মাধ্যমে তখন সারা দেশে এক মিশ্র তাসাউফ জন্মলাভ করেছিল। ইসলামী 'ইহ্সানের' সাথে মিশ্রিত হয়েছিল নয়া প্লেটোবাদ, বৈরাগ্যবাদ, বেদান্তবাদ ও মহানির্বাণবাদ প্রভৃতি অনৈসলামী ভাবধারা ও পদ্ধতি এবং তা থেকে নতুন ধরনের তাসাউফ জন্ম নিয়েছিল। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ব্যবস্থায় এ তাসাউফকে পুরোপুরি সংযুক্ত করে নেয়া হয়েছিল। তরিকত ও হাকীকতকে ইসলামী শরীয়ত থেকে আলাদা করে তাদেরকে শরীয়তের অমুখাপেক্ষী করা হয়েছিল। বাতেনের এলাকা জাহের থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। এ এলাকায় হালাল ও হারামের কোন সীমানা ছিল না। ইসলামী বিধানের কার্যকারিতা ছিল সেখানে অচল। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ইন্দ্রিয় লিপ্সারই রাজত্ব চলছিল। এ সব সূফীদের মধ্যে যাদের অবস্থা একটু ভালো ছিল তারাও অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী (অহ্দাতুল ওজুদ ও হামাউস্ত) দর্শনে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী এ মিশ্র তাসাউফকে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত করে ইসলামের নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ তাসাউফ পেশ করেন। এ ছাড়াও জনগণের মধ্যে যেসব জাহেলী রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান বিরাজ করছিল তিনি সেগুলোরও কঠোর বিরোধিতা করেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সুদক্ষ কর্মীদল প্রেরিত হয়। তাঁরা সর্বত্র জনগণের আকীদা ও চরিত্রের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালান। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলায় তখন চলছিল অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের দুর্দান্ত দাপাদাপি। রাজশক্তির সহায়তায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথ বেয়ে অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের সন্তর্পণে এগিয়ে চলার অভিযান চলছিল। তখন ইসলামের ও বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোকোজ্জ্বল যুগের অবসানে নেমে এসেছিল অন্ধকার যুগ। আর অন্য দিকে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির দেড় দু'শ বছরের অন্ধকার কেটে গিয়েছিল। মুসলিম সুলতানদের সহায়তায় বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের

মাধ্যমে তারা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের স্বপ্ন সফল করার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

বাংলার মুসলমান সমাজের বিপর্যয়ে যেসব উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি যুগিয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের পর এবার আম। মূল আলোচনায় আসছি। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম দু'শ বছর ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বিঘ্ন ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, পরবর্তী বিপর্যয়ের বীজ এ সময়ই উপ্ত হয় এবং ইসলামী সমাজ মানসে জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ এ সময় থেকেই শুরু হয়।

একদিকে ছিল প্রথম মুসলিম সমাজ গঠনকারীদের নিজস্ব দুর্বলতা এবং অন্যদিকে ছিল মুসলিম সমাজের নবাগত স্থানীয় সদস্যদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবধারা ও কর্ম-চরিত্র গঠনে সতর্কতার অভাব। প্রথম দিকে আগত তুর্কী, আফগান, পাঠান, ইরানী মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত ছিল না। তাদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ সমাজের অন্তর্গত। মূলত ভাগ্যান্বেষণেই উপমহাদেশের এ অঞ্চলে তাদের আগমন। তাই তাদের কাছে থেকে উচ্চ ইসলামী জ্ঞান ও উন্নত ইসলামী চরিত্র আশা করাও বৃথা। এর সাথে আগমন হয় একদল সূফীর। সূফীদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম। তাদের সাথে দু'চারজন উচ্চ শ্রেণীর আলেমেরও আগমন হয়। ইতিপূর্বে কাযী রুকনুদ্দীন সমরকন্দীর কথা আমরা আলোচনা করেছি। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীও এ সময় লাখনৌতিতে আগমন করেন। মওলানা জালালুদ্দীন গজনবীর ন্যায় উচ্চ পর্যায়ের আলেমেরও আগমন হয়। মিনহাজ তাঁর 'তবকাতে নাসিরী'তে বলেছেন, সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ খলজীর রাজত্বকালে (১২১৩–১২২৬ খৃ.) মওলানা জালালুদ্দীন গজনবী তাঁর বাসস্থান ফিরোজ কোহ থেকে লাখনৌতি সফর করেন। সুলতান তাঁকে দরবারে আমন্ত্রণ করেন এবং তিনি সুলতানের প্রসাদের সভাকক্ষে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডক্টর কালিকা রঞ্জন কানুনগোর বক্তব্য মতে ইউয়জ খলজীর উড়িষ্যা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।[৩২] এর পর মওলানা জালালুদ্দীন আবার ফিরোজ কোহে ফিরে যান। কিন্তু একটি নূতন ও শক্তিশালী সমাজ গঠনে এ সাময়িক অনুপ্রেরণা কতটুকু কাজে লাগতে পারে তা বিচার্য বিষয়। অন্যদিকে বাংলার কাযী রুকনুদ্দীন সমরকন্দীর ন্যায় উঁচুদরের আলেমের যোগ সাধানাও সামনে রাখতে হবে। কাযী হবার কারণে সর্বস্তরের মানুষের সাথে ছিল তাঁর সম্পর্ক। কাজেই তাঁর চিন্তা-ভাবনা সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। আমরা জ্ঞানচর্চার বিরোধিতা করছি না। কিন্তু প্রথম মুসলিম সমাজ গঠনের

ব্যাপারে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল তা অবশ্যই করা হয়নি। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের কথা বাদ দিলে ইসলাম আল্লাহ্র ওহীকে একমাত্র সত্য ও নির্ভুল জ্ঞান মনে করে। এছাড়া অন্য সমস্ত জ্ঞানই সংশয় মিশ্রিত। কাজেই অন্য যে কোন জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনের আলোকে তার বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অন্যদিকে নতুন মুসলমান যারা হচ্ছিল তারা সবাই স্থানীয়। তাদের কিছু অংশ ছিল পৌত্তলিক হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং অধিকাংশই ছিল হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মগোপনকারী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। মোটামুটি এ সমগ্র শ্রেণীটিই পৌত্তলিক ও মূর্তি পূজারী। এ ছাড়াও তৎকালীন বাংলায় বহুল প্রচলিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নাথ ও তান্ত্রিক ধর্মের অনাচার এবং যোগ ধর্মের অনিষ্টকর প্রভাব থেকে তাদের অতি অল্প সংখ্যকই মুক্ত থাকতে পেরেছিল। এ অবস্থায় দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে গাফলতি ও ইসলামী জ্ঞানের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি নতুন মুসলমানদের মানসিক গঠনে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলিম সমাজ গঠনের পূর্বাহ্নের এ ত্রুটি সামান্য ছিল না। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, মূর্তি ও প্রতিমা ভাঙ্গার কারণে বড় রকমের শির্ক অর্থাৎ সরাসরি মূর্তিপূজা হারাম হবার ব্যাপারে নতুন মুসলমানদের মনে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু মূর্তিপূজা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট শির্কের সাথে আপোস করার মনোবৃত্তি এখান থেকেই গড়ে উঠেছিল।

মদীনায় নতুন ইসলামী সমাজ গঠনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) পুরাতন মুশরিক সমাজের রীতিনীতিগুলোকেও অবিকৃত রাখেননি বা সেগুলোকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেননি। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষশীল প্রত্যেকটি পূর্বতন রেওয়াজের পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এমন কি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য ইহুদীরা খালি মাথায় পাগড়ি বাঁধতো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে পাগড়ির নিচে টুপী পরার নির্দেশ দিলেন। তিনি চিন্তা-ভাবনা, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য মুশরিক জাতির সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অথচ বাংলার মুসলিম সমাজ গঠনের সূচনালগ্নেই আমরা দেখি ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও মুশরিকী পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ। অতঃপর সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার গুরুত্ব কতখানি থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

এভাবেই বাংলার মুসলমান সমাজের প্রথম দু'শ বছর অতিবাহিত হয়। এ সময়ের মধ্যে এ দেশীয় বিপুল সংখ্যক অধিবাসী মুসলমান হয়। ইসলাম এ দেশেরই

একটি ধর্মে পরিণত হয় এবং মুসলমান সমাজ এ দেশের একটি স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজে রূপলাভ করে। এ সময়ের মধ্যে এ দেশে আরো দু'টি বড় পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে, মুসলিম শাসকগণ দিল্লীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে পরিপূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলার মুসলমানরা দিল্লীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দিল্লী কেন্দ্র থেকেও এ বিচ্ছিন্নতা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাংলার মুসলমানদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ উপমহাদেশের বাইরে মক্কা-মদীনা, বাগদাদ প্রভৃতি ইসলামী কেন্দ্র ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সাময়িক ও বিক্ষিপ্ত যোগাযোগ দিল্লী কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে উদ্ভূত মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি পূরণ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, এ সময় হিন্দুদের মধ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় জাগরণ দেখা দেয়। এ জাগরণের পেছনে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতার অবদান কম নয়। দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে সুলতানদের বাংলার উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয়। দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বাংলা থেকেও লোক নিযুক্তি শুরু হয় এবং বাংলার অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সাথেও সুলতানগণ একাত্ম হয়ে যান। এ ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাই ছিলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কারণ পাল ও সেন আমল থেকে মূলত তারাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বে অংশীদার ছিলেন। এবারেও তাদের ডাক পড়লো। এর ফলে এতদিন পরে তাদের মধ্যে কিছুটা আত্মপ্রত্যয় ফিরে এলো। তারা আবার তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতে লাগলো। মুসলমান শাসন ও মুসলমান সমাজ উভয়কেই গ্রাস করার স্বপ্নে তারা বিভোর হলো। এ জন্য একদিকে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটানো এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ইতিপূর্বেকার বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম ও জাতির ন্যায় মুসলমানদেরকেও হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির মধ্যে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা চললো।

মুসলমানদের অনেকেই হিন্দুদের এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁরা সুলতানদেরকে যথাসময়ে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। হযরত মুজফফর শামস বল্খী ১৩৯৭ খৃস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে লিখেছিলেন যে, মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নয়।[৩৩] গিয়াসুদ্দীনের সতীর্থ হযরত শায়খ নূর কুতবুল আলমও এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত সুলতান তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি। যার ফলে তিনি হিন্দু অভ্যুত্থানের নেতা দরবারের প্রভাবশালী আমীর ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, গিয়াসুদ্দীন

বল্‌খীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, যার ফলে গণেশ প্রমুখ হিন্দু আমীরগণ তাঁর শত্রু হয়ে পড়েন।[৩৪] কিন্তু গণেশ ও হিন্দু আমীরগণকে পদচ্যুত করার পরও দরবারে তাঁদের ক্ষমতা কেমন করে এত বৃদ্ধি পেলো, যার ফলে পরবর্তী তিনজন সুলতান প্রকৃতপক্ষে গণেশের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন, এ কথা আমরা বুঝতে অক্ষম। যাই হোক, গণেশ এক রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন। চার বছরের হিন্দু রাজত্ব মুসলিম নিধন-যজ্ঞের মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয়। গণেশ বাংলাদেশে আবার হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।[৩৫] গৌড়ে ও সারা বাংলাদেশে আবার মৃত সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা চলছিল।[৩৬] অথচ ইতিপূর্বে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় 'ইউসুফ ও জুলেখা' কাব্য রচনা করেছিলেন।[৩৭]

রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় হিন্দুগণ এবার সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালালো। অন্তত নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষার স্বার্থে এটাকে তারা অপরিহার্য মনে করলো। মুসলমান সুলতান, উমরাহ ও মুসলিম জনগণের অজ্ঞতার কারণে এ পথে তারা সাফল্যের সাথে অগ্রসর হলো। বিদ্যোৎসাহী মুসলিম সুলতানগণ কুরআন, হাদীস প্রভৃতি ইসলামী গ্রন্থাদির চর্চা ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করার এবং এ কাজে হিন্দু কবিদেরকে উৎসাহ দেবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। হিন্দু কবিদেরকে দরবারে ফুল-চন্দন দিয়ে বরণ করা হলো। কবি কৃত্তিবাস তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় আত্মজীবনীতে বলেছেন ঃ

নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুশি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥
....
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি লইলাম সত্বরে।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥[৩৮]

বাংলায় রামায়ণ রচনার খবর শুনে মনে হয় হিন্দুদের মধ্যে এক ধর্মীয় জাগরণের সঞ্চার হয়েছিল। লোকেরা দলে দলে কৃত্তিবাসকে অভিনন্দন জানাতে দৌড়াচ্ছিল। তেজস্বী পণ্ডিত কৃত্তিবাসও এমন নিষ্ঠা সহকারে রামায়ণ রচনা করলেন যে, তাতে সুলতানের দরবারের সমস্ত হিন্দু অমাত্যের নাম দিলেন কিন্তু রামায়ণে 'যবন চিহ্ন' রাখবেন না বলে মুসলমান অমাত্য এবং সুলতানের নাম উচ্চারণ করলেন না।[৩৯] এরপর সুলতানদের দরবারে রামায়ণ-মহাভারত পাঠের আসর বসতে লাগলো। কবি শ্রীকর নন্দী তাঁর মহাভারতের অশ্বমেধ সর্গে লিখেছেন ঃ

পণ্ডিত মণ্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনীর রচিত সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥[৪০]

শুধু সুলতানদের দরবারই নয়, সুলতানদের অন্তঃপুরে বেগমরাও দরবার করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র শুনতে লাগলেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুনতে গিয়ে এক হেরেম মহিষী পদকর্তা চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হয়েও পড়েন। এ ঘটনা উল্লেখ করে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেছেন ঃ "চণ্ডীদাস রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে রাণীর সহিত গান করিতে গিয়াছিলেন। গান শুনিয়া বাদশাহের বেগম তাহার প্রতি অনুরাগিণী হন এবং রাজাকে মনের কথা বলিয়া ফেলেন। ইহাতে রাজা রাণী ও চণ্ডীদাসকে বধদণ্ড দান করেন। দণ্ডটি ছিল অদ্ভুত রকমের। তাঁহাকে হাতীর পিঠে অধোমুখে বাঁধিয়া শিকারী বাজপাখি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।"[৪১]

এ সময় সুলতান, বেগম ও তাঁদের সভাসদগণ হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু ধর্ম-তত্ত্বের মধ্যে ডুবে গিয়ে রসাস্বাদন করছিলেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা কি হতে পারে ! তাঁদের সামনে কুরআন-হাদীসের বাণী বাংলা ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছিল না। দরবারের ভাষা ছিল ফার্সী। সুলতানগণ দেশে আরবী বা ফার্সী ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। দু'একখানা অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া এর তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণী ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতো। মাদ্রাসাগুলোতে আরবী ও ফার্সী ভাষা পড়ানো হতো। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারতো না। তাদের বাংলা ভাষার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হতো। কাজেই হিন্দু শাস্ত্র পাঠ ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। কবি সৈয়দ সুলতান বলেছেন ঃ

এ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমুক্ত হবার জন্য সুলতান হোসেন শাহ প্রথমদিকে চৈতন্য দেবের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকবেন এবং এ জন্যই কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের মুখবন্ধে তাঁকে কৃষ্ণ অবতার রূপে গণ্য করেছেন ঃ

নৃপতি হুসেন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্রেশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার ॥[৪৫]

বৈষ্ণব আন্দোলন ও মুসলমানদের ওপর তার প্রভাব

শ্রী চৈতন্য ১৫০৬ খৃস্টাব্দ থেকে নদীয়ায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত' প্রচার করতে থাকেন। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য ব্যাপরে শ্রী চৈতন্য ছিলেন বাংলার প্রাচীন কালের বৈষ্ণবদের অনুসারী। যুগ-ধর্মের তাগিদে তিনি সংকীর্তন ও নগর কীর্তনের প্রচলন করেন। বৈষ্ণবেরা সংকীর্তনে ভাবাবেগে আপ্লুত হলে ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং পতাকা উড়িয়ে নগর-কীর্তনে বের হতো এবং আনন্দে উদ্বেল হয়ে নৃত্য-গীত করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে এমনভাবে রাজপথসমূহ প্রদক্ষিণ করতো যে, সারা শহর মুখরিত হয়ে উঠতো। এভাবে তারা সারা শহরবাসীকে কীর্তনের প্রভাবাধীনে আনার চেষ্টা করতো। ত্রয়োদশ শতকে পারস্যের বিখ্যাত সূফী মসনবীর কবি মওলানা জালালুদ্দীন রুমী এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। মসনবী তৎকালে বাংলার মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজে সাগ্রহে পঠিত হতো। কাজেই শিক্ষিত সমাজে তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি অনালোচিত থাকার কথা নয়। সূফীদের 'হাল', 'যিকির' ও 'সামা'-র ন্যায় বৈষ্ণবদের মধ্যে 'দশা', 'কৃষ্ণনাম' ও 'কীর্তন'-এর প্রচলন ছিল। সূফীদের 'ইশ্‌কের' ন্যায় বৈষ্ণবদের প্রেম এবং সূফীদের 'সাকী ও বুত' বা 'শামা ও পরওয়ানার' ন্যায় বৈষ্ণবদের 'রাধাকৃষ্ণ' একই কথা। আর সূফীদের 'অহদাতুল অজুদ' ও বৈষ্ণবদের 'অদ্বৈতবাদ' যে একই বস্তু তা সবার জানা। বৈষ্ণবদের এ পদ্ধতি ও ভাবধারা সূফীদের থেকে ধার করা না উপনিষদ ও ভাগবত থেকে গৃহীত—এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিষম বিতর্ক। আমরা এ বিতর্ককে অর্থহীন মনে করি। আমাদের মতে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে সূফীদের ওপর বেদান্ত, জরথুষ্ট্র ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি। কাজেই সূফীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বৈষ্ণবদের এ পদ্ধতি ও ভাবধারার উৎস উপনিষদ ও ভাগবত হওয়া মোটেই বিচিত্র

নয়। সম্ভবত সূফীগণ তাঁদের ধার করা পদ্ধতি ও ভাবধারার ওপর ইসলামী আদর্শের ছোপ লাগিয়েছিলেন বা গ্রহণ করার সময় বৈষ্ণবরা তার উপর উপনিষদ ও ভাগবতের প্রলেপ লাগিয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় ঃ ফার্সী তখন ছিল রাজভাষা। কাজেই সর্বত্র তা পঠিত ও ব্যবহৃত হতো। সূফীদের বইপত্র অধিকাংশই ফার্সী ভাষায় লিখিত। এ ছাড়া মসনবী তৎকালে এ দেশে একটি বহুল পঠিত ও আলোচিত গ্রন্থ ছিল। ব্রাহ্মণগণও এ গ্রন্থ সাগ্রহে পাঠ করতেন। নদীয়ার দুই দোর্দণ্ড প্রতাপ কোতোয়াল শ্রী জগন্নাথ রায় ও শ্রী মাধব রায় সম্বন্ধে জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্য-মঙ্গলে বলেছেন ঃ

মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে ॥

শ্রী চৈতন্য নিজে একজন উঁচুদরের পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রাদিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, চৈতন্য চরিত গ্রন্থাবলী থেকে এ কথা জানা যায়। কাজেই ইসলাম ও মুসলিম সূফীদের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও যে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের উপর ইসলামের সবচাইতে বেশি প্রভাব ছিল এবং যাদেরকে তিনি হিন্দু ধর্মের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে বা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিলেন তারা কিভাবে এবং কিসের প্রভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। অন্যদিকে সূফীদের এ পদ্ধতি ও ভাবধারার ওপর উপনিষদ ও ভাগবতের রঙ চড়ানো তাঁর মতো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

শ্রী চৈতন্যের ধর্মকে ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম বলা হয়। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাই হচ্ছে তাদের ঈশ্বর প্রেমের প্রতীক। তবে এ কৃষ্ণ ও গীতার কৃষ্ণের মধ্যে অনেক ফারাক। একে পৌরাণিক রাধা ও কৃষ্ণের মার্জিত রূপ বলা যায়। চৈতন্যদেব স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যাকে বর্তমান যুগের ভাষায় বলা যায় অবৈধ প্রেম। কারণ এর ঝাঁঝ অনেক বেশি। বৃন্দাবনের গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সাথে রাধার লাস্য ও মাধুর্যপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে ভগবদ ভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ—এ ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এ প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রী চৈতন্য কখনও কখনও উন্মাদ ও সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়তেন এবং এ প্রেমরস আস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ তিনি হরিণাম সংকীর্তনের প্রচলন করেন। রাধাকৃষ্ণের আদর্শ চৈতন্যের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও চণ্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন কাব্য এ দেশে ইতিপূর্বে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করেছিল। তবে চৈতন্যদেব তার সাথে ভক্তি সংযোগ করেন।

এ গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের কামকেলির যে বর্ণনা আছে বর্তমানকালের কোন গ্রন্থে তা থাকলে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে গ্রন্থকার দূর্নীতির অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হতেন।[৪৬] আর চণ্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের জনৈক দিকপাল লিখেছেন যে, আদি রসের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যখানি প্রায় পর্ণোগ্রাফির পর্যায়ে পড়েছে।[৪৭] এ রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে অশরীরী করে তার ওপর ভক্তির প্রলেপ মাখিয়ে যতই 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়' বলে ঘোষণা করা হোক না কেন সাধারণ মানুষ যে 'রজকিনী প্রেমের' উপর যতটা জোর দেবে 'কামগন্ধ হীন প্রেমের' উপর ততটা দেবে না—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং বেশি দিন নয় মাত্র এক'শ বছরের মধ্যে শ্রী চৈতন্যের এ পুরাতন বৈষ্ণব ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের ধর্ম রাজ্যে কি বীভৎসতার সৃষ্টি করেছিল এবং হিন্দুর সাথে সাথে মুসলমানেরও তাতে যথেষ্ট সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল সেকথা বিবৃত করার আগে আমরা এখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করবো।

শ্রী চৈতন্য প্রেম ও ভক্তির ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেমের পথ অবলম্বন করেননি। তিনি হিংসার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলিতে ব্যাপক মুসলিম বিদ্বেষ এর প্রমাণ। মুসলমান সুলতান ও প্রশাসক গোষ্ঠী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে পারেন কিন্তু এ জন্য মুসলমান শাস্ত্র ও সাধারণ মুসলমানরা দায়ী নয়। ইসলামী শাস্ত্র ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মুসলমান শাসকগণ যদি ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করতেন এবং হিংসার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে সাড়ে পাঁচ'শ বছরের শাসনে বাংলায় একটি হিন্দুরও অস্তিত্ব থাকতো না। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা নিশ্চয়ই ধর্মীয় কারণে জুলুম-অত্যাচার করেননি। তাদের অত্যাচারের সাথে পার্থিব স্বার্থের সংযোগ ছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে ইসলাম সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি ঃ "গো-হত্যাকারীরা তাদের এই পাপকর্মের কারণে চিরন্তন নরকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হবে। তোমাদের (মুসলমান) শাস্ত্র প্রণয়নকারী পথভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ সে এই নীতিগুলির (গো-হত্যা ও অন্যান্য) সারবত্তা না জেনেই এগুলো ঘোষণা করে দিয়েছে। .... যেহেতু এই শাস্ত্র আধুনিক কাজেই ন্যায় শাস্ত্রের মানদণ্ডে তা টিকতে পারে না।[৪৮] চৈতন্য পরবর্তীকালে লিখিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরো বহু বিদ্বেষমূলক উক্তি ও আলোচনা দেখা যাবে। চৈতন্যের জীবদ্দশায় তিনি নিজেই ছিলেন এর উদ্‌গাতা। সমসাময়িক মুসলমান সমাজ ও ইসলাম সম্পর্কে তিনি চিরদিনই বিদ্বেষভাব পোষণ করে এসেছেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে মওলানা সাহেবের মত হচ্ছে এই যে, "ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধেই শ্রী চৈতন্যের অভিযাত্রা।"[৪৯]

শ্রী চৈতন্যের হিংসা নীতির বৃহত্তম শিকার হয়েছেন নবদ্বীপের কাযী এবং এতে শ্রী চৈতন্য নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সম্ভবত উপমহাদেশের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা এখান থেকেই হয়। অবশ্য বিকৃত ইতিহাসের অন্তরালে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ একযোগে কাযী ও মুসলিম শাসনকে দায়ী করে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কিত ঘটনাটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্যের কীর্তনীয়াদের সংকীর্তন করার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। 'সপরিকর চৈতন্য বহু লোকজন সমভিব্যাহারে খোল করতালের বাদ্য সহকারে গৃহে বা রাজপথে নাম কীর্তন করে বেড়াতেন এবং অনেক সময় ভাবাবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন।' প্রথম দিকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ এ সংকীর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা এ কীর্তন বন্ধ করাবার জন্য কাযীকে অনুরোধ জানালেন।[৫০] তাঁরা বললেন ঃ

নগরিয়া পাগল হৈল সদা সংকীর্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলয় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি ॥
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বারবার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

....

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাঞা তার করহ বর্জন ॥[৫১]

ব্রাহ্মণদের পূর্বে শহরের মুসলমানরাও এসে কীর্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাযী তখন তাদের কথায় আমল দেননি। এবার ব্রাহ্মণদের অভিযোগের পর কেবল তাদের খুশি করার উদ্দেশ্যেই নয় বরং নগরের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার খাতিরে কাযী তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য হলেন। কাযী সন্ধ্যাবেলা কীর্তনীয়াদের মিছিল ভেঙ্গে দিয়ে বললেন ঃ এতকাল কেউ এ রকম প্রকাশ্যে হিন্দুয়ানী করেনি। এবার কিসের জোরে তোমরা এ সব চালিয়ে যাচ্ছো ? নগর কীর্তন আর কেউ করতে পারবে না। আজ তোমাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম।[৫২] কীর্তনে বাধা দেয়া হয়েছে শুনে শ্রী চৈতন্য ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি কাযীর এ নির্দেশ অমান্য করার নির্দেশ দিলেন। তিনি নবদ্বীপের সব

বৈষ্ণবকে একত্র করে দলবদ্ধভাবে শিমুলিয়া গ্রামে গিয়ে কাযীর বাড়ী আক্রমণ করার হুকুম দিলেন। কাযীর ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে তার মধ্যে কীর্তন করার কথা ঘোষণা করলেন।[৫৩] কাজেই কীর্তন করতে করতে দলবল নিয়ে শ্রী চৈতন্য নদীয়ার একান্তে শিমুলিয়ায় এসে পৌছলেন। কাযী বাড়ির সামনে এসে ঃ

ক্রোধে বলে প্রভু, আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া, কাটিয়া ফেল মাথা ॥
নির্যবন করো আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কাল যবন ॥[৫৪]

নর রক্ত লোলুপ কীর্তনীয়াদের ভয়ে কাযী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। চৈতন্য প্রভুর আদেশে 'মহামত্ত' হয়ে সবাই কাযীর ঘরে উঠে পড়লো। কেউ ঘর ভাঙ্গছে, কেউ দুয়ার ভাঙ্গছে, আর কেউ লাথি মেরে হুংকার ছাড়ছে। এ যেন বিংশ শতকের মধ্যভাগে কোন আধুনিক শহরের দাঙ্গা উন্মত্ত জনতা।

ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে, অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সঁহিতে।
সব বাড়ী বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে ॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি ॥
সংকীর্তন আরম্ভে মোহ্যের অবতার।
কীর্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব সব যদি না করে কীর্তন।
অগ্নি দেহ তোরা ঘরে না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥
কাজিকে করিয়া দণ্ড সর্ব লোক রায়।
সংকীর্তন রসে সর্ব্ব গণে নাচি যায় ॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহাসঙ্গে হরি বলি যায়েন নাচিয়া ॥[৫৫]

কাযী ছিলেন সুলতানের কর্মচারী। নগরের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের অভিযোগের কারণে তিনি নগর কীর্তন বন্ধ

করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব বিরোধী ছিলেন না। ধর্মীয় উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে তিনি এ কাজ করেননি। কিন্তু এর জবাবে প্রেম ও ভক্তি ধর্মের প্রচারক চৈতন্য মহাপ্রভু কোন উন্নত আদর্শ স্থাপন করতে পারেননি। কাযীর নির্দেশ অন্যায় হলে তিনি বড় জোর আইন অমান্য করে নগর কীর্তনে বের হতে পারতেন। কিন্তু সরকারী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি রাজ কর্মচারীর গৃহ জ্বালিয়ে দিলেন। শুধু এ পর্যন্তই ক্ষান্ত হলেন না। বরং আরো অগ্রসর হয়ে শিমুলিয়া গ্রামের মুসলমানদের বাড়ী আক্রমণ করলেন। উন্মত্ত বৈষ্ণব বাহিনী সব মুসলমানকে ভিটেমাটি ছাড়া করলো ঃ

সিম্বলিয়া গ্রামেতে কাজীর ঘর ভাঙ্গি।
সাত প্রহরিরা ভাবে হৈলা বড় রঙ্গী ॥
সিম্বলিয়া গ্রাম ছাড়ি পলাইল যবন।[৫৬]

শ্রী চৈতন্যের এ কার্যকে 'সাম্প্রদায়িক' ছাড়া আর কোন শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ কাযী কোন হিন্দু হলে তিনি অবশ্যই তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে গ্রামের সব হিন্দুকে ভিটেমাটি ছাড়া করতেন না। ইতিপূর্বে নদীয়ার প্রতাপশালী কোতোয়াল ব্রাহ্মণ তনয় শ্রী জগন্নাথ রায় ও শ্রী মাধব রায় শ্রী চৈতন্যকে দলবলসহ কীর্তন করতে দেখে 'ক্রোধে দণ্ড হাতে' তেড়ে আসলেও বৈষ্ণবদের নিয়ে তিনি তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালাতে যাননি। মুসলমানদের জন্য ঘৃণাসূচক 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' ছাড়া অন্য কোন শব্দ তাঁর মুখে ছিল না। তাঁর এ হিংসার বাণী তাঁর শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের মতে ধর্মীয় উন্মত্ততার সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি ও বিরোধ তখন থেকেই একটি বিধিবদ্ধ রূপ লাভ করেছিল।

ইতিহাস আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রী চৈতন্যের এ সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপকে মুসলমানদের তিন'শ বছরের হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক প্রতিশোধ গ্রহণ রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "তিনশত বৎসরের মধ্যে বাঙালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।"[৫৭] সত্যই যদি যে মুসলমান সুলতানগণ হিন্দুর ধর্ম শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করছিলেন এবং হিন্দুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ করে দেশে সম্প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে চাচ্ছিলেন তাঁদের কল্পিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রী চৈতন্যের অভিযান চালাবার উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে তিনি বাংলাদেশের সমগ্র হিন্দু সমাজকে তাঁর কল্পিত শত্রুর তলোয়ারের মুখে ঠেলে দিয়ে পরের বছর সন্ন্যাস নিয়ে উড়িষ্যায় চলে যেতেন না এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ২৪ বছরের জীবনকালে

বাংলার বাইরে বিদেশে অবস্থান করতেন না। আসলে মনে হয় এ সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের জন্য সুলতান হোসেন শাহের সাথে তাঁর চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং রাজরোষে ভীত হয়ে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। অন্যদিকে শ্রী চৈতন্য এবং তাঁর দুই সহচর রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কার্যকলাপে সুলতান হোসাইন শাহও দিব্য জ্ঞান লাভ করেন।

ধর্মক্ষেত্রে অনাচার

শ্রী চৈতন্য প্রেম ও ভক্তির সমন্বয়ে পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের দেহবাদী প্রেমলীলার পরিবর্তে যে দেহাতীত প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা শীঘ্রই দেহবাদী প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। হিন্দুগণ তাঁকে শ্রী কৃষ্ণের 'অবতার' বলে মনে করতেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তের দল তাঁর সত্তা থেকে মানবরূপী চৈতন্যকে বাদ দিয়ে অবতাররূপী কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। এবং শীঘ্রই রাধাকৃষ্ণের লীলায় মত্ত হয়ে উঠলো। বলাবাহুল্য, এ লীলা দেহের অতীত ছিল না। চৈতন্যের বিধান মতে হিন্দু সমাজে কেবলমাত্র এতটুকু বিপ্লব এসেছিল যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য নিম্ন জাতের হিন্দুরা এক সাথে কীর্তন করতে পারতো। ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে পারতো। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই এতে অংশ নেবার অধিকার ছিল। হিন্দু সমাজ মানসে এতটুকু পরিবর্তন কম কথা ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই ধর্মের নামে যখন মারাত্মকভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শুরু হয়ে গেলো তখন সর্বজাতের হিন্দুরা এতে জড়িয়ে পড়লো। ধর্মের নামে নেড়া-নেড়ী ও মুণ্ডিত কেশ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে জঘন্য যৌন অনাচারের স্রোত বয়ে চললো।

সহজিয়া ও তান্ত্রিক দল পূর্বেই এ দেশে ছিল। শীঘ্রই বৈষ্ণবরা তাদের সাথে যোগ দিয়ে দল বৃদ্ধি করলো। এদের ধর্মাচরণের বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ পরস্ত্রীর সাথে প্রেম ও ব্যভিচার। বৈষ্ণবরাও এ পরকীয়া প্রেমের পথে অগ্রসর হলো। শালীনতা বজায় রেখে এদের বিস্তৃত সাধন পদ্ধতি বর্ণনা করা অসম্ভব। সহজিয়া, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও এর প্রভাব বিস্তৃত হলো।[৫৮] বৃহদ্ধর্ম পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, মানবদেহের অঙ্গসূচক অশ্লীল কথা দুর্গা পূজায় উচ্চারণ করবে। কারণ দুর্গা তা উপভোগ করেন। কাল বিবেকে নির্দেশ আছে যে, কাম-মহোৎসবে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করবে। দুর্গা পূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে নর-নারীর যেসব ক্রীড়া ও বাক্য কাল বিবেকে লিখিত আছে তা বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা যায় না বলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন।[৫৯] মহানির্বাণতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলিকালে মদপান শুধু সিদ্ধই নয় বরং

অপরিহার্য কর্তব্য। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যেমন মদপানের রীতি প্রচলিত ছিল, তেমনি এ কলি যুগেও তোমরা বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে তা পান করবে।[৬০] এ গ্রন্থে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাদেব গৌরীকে বলেছেন ঃ পাথরে বীজ বপন করলে তা অঙ্কুরিত হওয়া যেমন অসম্ভব, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা-উপাসনাও তেমনি নিষ্ফল।[৬১] পরবর্তী পর্যায়ে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে মহাদেব নিজেই বলেছেন ঃ শক্তি পূজা পদ্ধতিতে অপরিহার্য করণীয় হিসাবে মদপান, মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা ভক্ষণ এবং নারী সঙ্গমের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।[৬২] নারী সঙ্গমের ব্যাপারে প্রত্যেক পুরুষ নিজেকে শিব ও প্রত্যেক নারী নিজেকে পার্বতী মনে করে ধর্মের নামে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

তন্ত্র শাস্ত্রে তান্ত্রিকদেরকে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোচ্চ পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে কৌলাচারীই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এ দলের বিধানটি দেখুন। কেউ এ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে এ সম্প্রদায়ের একজনের কাছে দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের পর তাকে এ সম্প্রদায়ে প্রবেশের কথা ঘোষণা করতে হয়। রাতে গুরু ও শিষ্য আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ ও আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী, তাঁতির মেয়ে, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা মেয়ে, ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী ও একজন ভূস্বামীর মেয়ে) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্ত্রীলোক বসে। গুরু তখন শিষ্যকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন ঃ আজ থেকে লজ্জা, ঘৃণা, শুচি-অশুচিজ্ঞান, জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করবে। মদ, মাংস, স্ত্রী-সম্ভোগ প্রভৃতির সাহায্যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবে কিন্তু সর্বদা ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ করবে এবং মদ, মাংস প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হবার উপাদান স্বরূপ মনে করবে। এরপর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মদ পান ও মাংস ভক্ষণ করে—গোমাংসও বাদ যায় না। মদ পান করতে করতে চেলা সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তখন সে অবধূত আখ্যা পায় এবং তার নতুন নামকরণ হয়। তারপর গুরু ও অন্য সবাই চলে যায় কেবলমাত্র চেলা ও একটি স্ত্রীলোক থাকে।[৬৩] ....

এ ছাড়া তান্ত্রিকেরা আরো বহু বীভৎস কাণ্ড-কারখানা করে। যেমন মানুষের মৃতদেহের উপর বসে মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ একত্র হয়ে মদ পান করে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে ধর্মের নামে তান্ত্রিকদের যৌন ব্যভিচারের বহু কুৎসিত চিত্র তুলে ধরছেন।[৬৪] এ থেকে অনুমান করা যায়, হিন্দু সমাজ ও ধর্ম তখন কোন্ স্তরে নেমে গিয়েছিল। তৎকালীন হিন্দুদের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তিনটি ধর্মের প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশে মূলত বৈষ্ণব ধর্মই প্রাধান্য লাভ করে। বিষ্ণুর স্থলে তাঁর অবতার শ্রী কৃষ্ণের পূজা

অধিক প্রসার লাভ করে। আর এ পূজা শেষ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের দৈহিক প্রেমলীলায় পর্যবসতি হয়ে সমগ্র সমাজ দেহে মারাত্মক পচন ধরায়।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত ষোল হাজার গোপিনী পরিবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও পরকীয়া প্রেম। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাদের চরম লক্ষ্য। কাজেই প্রথমে নর-নারীর দৈহিক প্রেমের মধ্য দিয়েই এ প্রেমের আস্বাদ পেতে হবে। নিজের স্ত্রীর চাইতে অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্তিই বেশি প্রবল হয়, কাজেই এটিই এ প্রেমের প্রথম সোপান এবং প্রথমে স্থুল দেহজাত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হলেও ক্রমে তা ভগবানের প্রেমে রূপান্তরিত হয়। কেউ কেউ আবার এর সাথে আর একটু যোগ করেন। মানুষের মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তা চরিতার্থ হলেই মন শান্তভাব ধারণ করে এবং তাকে ভগবানের আরাধনায় সমাহিত করা যায়। কাজেই কাম চরিতার্থতাই এ ভগবত প্রেম সাধনার প্রথম ও প্রধান সোপান। সহজিয়ারা আবার অনেক শাখায় বিভক্ত। যেমন—আউল, বাউল, শাহ, দরবেশ, নেড়া, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, কিশোরী, ভজনী, রামবল্লভী, জগথোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাগল নাথি, গেবরাই প্রভৃতি। এ সব শাখার ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও গুরুবাদ, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের বিচরণ সর্বত্রই সমান। কাজেই যৌন ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কোথাও সামান্য হেরফের হবার উপায়ই নেই।

এদের মধ্যে কর্তাভজা সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারো শতকে আউল চাঁদ নামক এক সাধুর সাহায্যে। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দুর সাথে সাথে কিছু মুসলমানও তাঁর শিষ্য হয়। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণজ্ঞানে তার পূজা করতো। এ দলের মধ্যে নিম্ন জাতীয় মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। গোপীরা কৃষ্ণকে যেমন কায়মনো প্রাণে ভজন করতো এরাও তেমনি গুরুকে ভজন করতো। অতঃপর শুরু হয়ে যেতো রাধাকৃষ্ণের অবাধ প্রেমলীলা। ক্রমে এ সম্প্রদায়ের বিপুল প্রসার হয়।

স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায় গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করতো না। এ দলের কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর হাতে। এরা একত্রে মঠে বাস করতো। এরা কৃষ্ণ ও চৈতন্যের স্তুতিমূলক গান গাইতো।

সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তরা মেয়েদের পোশাক পরতো, মেয়েদের নাম ধারণ করতো এবং মেয়েদের ন্যায় কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নামে নৃত্যগীত করতো।

মধ্যযুগে হিন্দু ধর্মের এ দুঃখজনক পরিণতি নতুন নয়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের মধ্যেই এর সূত্র রয়ে গেছে। প্রাচীনকালে ভারতের বন-উপবনে যে ঋষিরা একদা

তাত্ত্বিক উপাধি লাভ করেছিলেন, তাদের জীবন, চিন্তা ও দর্শনে স্রষ্টা, জীবন ও জগত সম্পর্কে যে সংশয়বাদ জন্ম নিয়েছিল, তা থেকেই এ ভোগবাদের উৎপত্তি। তাই হাজার বছর থেকে কাম ও যৌন সম্ভোগ ভারতীয় ধর্মের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সুলতানদের অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে হিন্দু ধর্মের এ সব নোংরা ও গর্হিত আচার অনুষ্ঠান, ঘৃণ্য যৌন অনাচার, পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের অশ্লীল প্রেমলীলা তাদের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন এক ধরনের মরমীবাদ এর পথ প্রশস্ত করে।

মুসলমান সমাজে এর প্রভাব

শ্রী চৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির ধর্ম দু'দিক দিয়ে বাংলার মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রথমত সাম্প্রদায়িক পরিবেশকে উষ্ণ করে তোলে। এভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হয়। ফলে ইসলাম প্রচারের গতিতে মন্থরতা আসে। সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদেরকে নিজেদের শত্রু মনে করতে থাকে। এ অবস্থা একদিকে হিন্দুদের মধ্যে যেমন জাগরণ আনে তেমনি অন্যদিকে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক থেকে তারা নিজেদেরকে অসহায় ও দরিদ্র মনে করতে থাকে। এ পথে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনাশটি প্রবেশ করে। একদিকে একদল সূফীর ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি এবং অন্যদিকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রসারিত করার ব্যাপারে শাসকদের অনীহা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ধর্মীয় কুসংস্কারগুলো দূর করতে সক্ষম হয়নি। হাজার বছরের এ কুসংস্কারগুলোসহ তারা ইসলাম গ্রহণ করে। সূফীগণ মূর্তি ও প্রতিমা ভেঙ্গে বড় শির্‌ক অর্থাৎ মূর্তিপূজা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মনের গহনে লুকানো মূর্তিটি ভাঙ্গার প্রতি বিশেষ নজর দেননি। এ জন্য সুলতান হোসেন শাহের আমলে সত্য নারায়ণকে এক সময় সত্য পীর বানিয়ে মুসলমানদেরকে তার পূজায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হলে এ সুস্পষ্ট শির্‌ক করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু একদিকে সূফীদের আল্লাহকে 'প্রেমাস্পদ' মনে করা এবং অন্যদিকে চৈতন্যের 'কৃষ্ণপ্রেমের' মধ্যে সামঞ্জস্য থাকায় তারা অতি সহজেই এ 'কাম-ধর্মের' প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে আউল, বাউল, কর্তাভজা, তান্ত্রিক, সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা শুরু হয়ে যায়।

ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের ফকীর ও পীর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা মারেফতকে শরীয়ত থেকে আলাদা করে নেয় এবং শরীয়তের বিভিন্ন ব্যাপারের আরেকটি অন্তর্নিহিত বা মারেফতী অর্থ বের করে আনে। যেমন, ১. শরীয়তে নিষিদ্ধ মদ ও গাঁজা সেবন করাকে তারা মারেফতে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উপায় হিসাবে গণ্য করে। ২. হিন্দু বাউল সন্ন্যাসীদের চারিচন্দ্র ভেদের[৬৫] ন্যায় মুসলিম বাউল ফকিররা 'পঞ্চরস সাধন' নামক একটি অনুষ্ঠান পালন করে। এ পঞ্চরস হচ্ছে ঃ কালো, সাদা, লাল, হলুদ ও মুর্শিদ বা গুরুর বাক্য। কালো অর্থ মদ, সাদা অর্থ বীর্য, লাল অর্থ ঋতুবতী নারীর ঋতুস্রাব, হলুদ অর্থ মল। নিজের স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে তারা 'রতি সাধন', 'রস সাধন', 'লাল সাধন' ও 'গুটি সাধন' করে। অত্যন্ত অশ্লীল ও কদর্য পদ্ধতিতে তান্ত্রিকদের অনুকরণে তারা এ সব করে থাকে। ৩. নেড়ার ফকীরের দল কুরআনের শব্দের নিজেদের মন মাফিক একটি কুৎসিত অর্থ গ্রহণ করে। যেমন 'হাউজে কাওসার' অর্থ নারীর ঋতুস্রাব। তারা ঋতুস্রাব ও বীর্য পান করে আল্লাহ্ প্রেমে বিভোর হয়। বীর্য পান করার সময় তারা 'বীজ' মে আল্লাহ্ (অর্থাৎ বীর্যের মধ্যে আল্লাহ্ অবস্থান করেন এ অর্থে) উচ্চারণ করে। শরীয়তীদের ৩০ পারা কুরআন তারা মানে না। নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাদের মনের মদীনায় সব সময় ১০ পারা কুরআন তরতাজা থাকে। ৪. আর একদল ফকীর তাদের মুরীদদের বাড়িতে গিয়ে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করে। গ্রামের কুমারী যুবতীদেরকে মুর্শিদের সাথে এক সাথে জমা করা হয়। মেয়েরা নাচ-গান করে। তারপর সবাই উলঙ্গ হয়ে যায় এবং মুর্শিদ তাদের পোশাকগুলো গৃহের কোন উঁচু স্থানে লুকিয়ে রাখে। অতঃপর যৌন উত্তেজনাময় গানের সাহায্যে যুবতীদেরকে উত্তেজিত করা হয় এবং পীর-মুর্শিদের সাথে যৌন মিলনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ৫. আউল ফকীরেরা তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সীমিত যৌন সম্পর্ককে তাদের নিগূঢ় সাধন পদ্ধতির পথে অন্তরায় মনে করে। এ জন্য তারা সর্বাধিক সংখ্যক পরস্ত্রী বা বারাঙ্গনার সাথে যৌন মিলন করে। এমন কি নিজের স্ত্রীর সাথে তারা অন্য পুরুষের যৌন মিলনে কোনরূপ ঈর্ষা বোধ করে না। বরং এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ঈর্ষা বোধ না করাকে নিজেদের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য অপরিহার্য মনে করে।[৬৬] ৬. এ ফকীরদের একটি দল মারেফত লাভ করার জন্য আর একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে। একে তারা বলে 'ইচ্ছা পূরণ ভজন'। এ জন্য তারা নারী-পুরুষ 'আখড়া' নামক একটি স্থানে মিলিত হয়, নানান ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন করে অতঃপর প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত একজনের সাথে যৌন মিলন করে নিজেদের নিগূঢ় সাধন কার্য চালিয়ে যায়।

চৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির ধর্ম মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল আচরিক জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপরে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সাহিত্যের পথে এ ধর্মানুষ্ঠান মুসলমানদের যে ক্ষতি সাধন করেছিল এবার আমরা সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসতে চাই।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে একদিকে যেমন ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক যুগান্তকারী বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। অসংখ্য হিন্দু লেখক চৈতন্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার প্রাথমিক গঠনের যুগ অতিক্রম করে অগ্রগতির যুগে পদার্পণ করেছিল। এ পর্যন্ত যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাতে কয়েকজন মুসলমান কবির অংশ থাকলেও ভাবধারা, আঙ্গিক ও শব্দ সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে তা ছিল মূলত হিন্দুর সাহিত্য। পৌরাণিক শব্দ সম্ভার এবং হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও দেবদেবীর আলোচনায় মুখরিত সে সাহিত্যকে একটি হিন্দু দেব মন্দিরের সাথে তুলনা করাই সাজে। তার মধ্যে একটি দেবী বা দেবমূর্তি, মূর্তির সামনে পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন পূজারী ব্রাহ্মণ। সেখানে মুসলমানের কি কাজ ? অথচ এ সময়ই বৈষ্ণব চিন্তা ও ভাবধারায় সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গন প্লাবিত হয়ে গেলো। অসংখ্য বৈষ্ণব কবির মিছিলে মুসলমান কবিগণও যোগ দিলেন। কেউ তাদের নাম দিয়েছেন 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি'।[৬৭] আবার কেউ বলেছেন, 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'।[৬৮] তারা বৈষ্ণব মুসলমান হন বা মুসলমান বৈষ্ণব হন আমাদের কাছে দুটোই সমান। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের মতে তাদের সংখ্যা শতাধিক। তাদের পদাবলী নিয়ে আমাদের সাহিত্য মহারথিগণের গর্বের অন্ত নেই। তাদের মত হচ্ছে এই যে, বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পদাবলী রচনা করলেও আসলে তাদের অনেকেই ছিলেন খাঁটি মুসলমান।[৬৯] হয়তো এ কথা সত্য ; সাময়িকভাবে তাদের অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণব চিন্তা ও ভাবধারা মুসলিম কবি-মানসে যে গভীর প্রভাব ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের ন্যায় তারাও যে সাময়িকভাবে হলেও বৈষ্ণব ভাবধারার স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একদিকে বৈষ্ণববাদের সাথে এক শ্রেণীর সূফীবাদের ভাবগত ও আচারণগত মিল এবং অন্যদিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পূর্বপুরুষগত সংস্কার, সর্বোপরি কুরআন-হাদীসের যথার্থ শিক্ষা তাদের সামনে না থাকার কারণে অনেক মুসলমান কবি চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তারা দিশা খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোথায় যাবেন, কি করবেন। ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান নয়, একেবারেই

উবে গিয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। বৈষ্ণবদের সংশ্রবে থেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান ভক্ত কবি লাল মামুদের নিম্নোক্ত গানটি দেখুন ঃ

দয়াল হরি কৈ আমার,—
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার ॥
বড় রিপুর জ্বালা প্রাণে, সহ্য হয় না আর।
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার ॥
আমি কুল ধর্মে পরম ধর্ম বলে, যত করলাম কদাচার।
যদিও তুমি আল্লা-খোদা, তুমি লক্ষী, তুমি সারোদা,
স্বত্ত্ব রজঃ ত্রিগুনের আধার—
তবু হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ বলে ডাকতে প্রাণ কাঁদে আমার ॥
মনের খেদে বলতেছি এবার
হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার ॥[৭০]

আবার দেখুন ঃ

জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবিনা একবার।
এবার লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ মন করেছে সার ॥[৭১]

লাল মামুদের বারবার কেবল মুসলমান ও যবন হয়ে জন্ম নেবার 'পাপটাই' মনে জাগছে। বেচারাকে কেউ এ কথাটা একবার জানিয়েও দেয়নি যে, কেবল মুসলমান কুলে জন্ম নিলেই মুসলমান হওয়া যায় না। আর ইসলামের প্রতি আস্থা না থাকলে মুসলমানও থাকা যায় না। তাছাড়া 'হরি'কে পেতে হলে হরির নির্দেশিত পথেই তাকে পেতে হবে। এখানেই সূফীবাদের সমস্যা। আল্লাহ ও রাসূল নির্দেশিত পথের সাথে অন্য কোন পথের সামান্যতম মিশ্রণও চূড়ান্ত ক্ষতির বার্তাবহ।

সৈয়দ মর্তুজার একটি পদ দেখুন ঃ

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি
কোন্ শুভ দিনে দেখা তোর সনে
পাসরিতে নারি আমি।
যখন দেখি এ ও চান্দ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি
অভাগীর প্রাণ করে আনচান

দণ্ডে শতবার মরি।
মোর কর দয়া দেহ পদ ছায়া
শুনহ পরান কানু
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু।[৭২]

এ পদটি যে কোন বৈষ্ণব কবির অন্তর নিঃসৃত, তাতে সন্দেহ নেই। শতাধিক কবির এমনি আরো বহু পদ দেখা যাবে। এগুলো মুসলমানদের জাতীয় সম্পদরূপে তাদের জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হয়ে আসছে। অবশ্য সতের শতকের পরে বৈষ্ণব চিন্তা ও দর্শনের দাপাদাপি কমেনি। মুসলমানদের পরবর্তীকালের সাহিত্য সাধনার ধারায় এ চিন্তা একটা ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করেছে। এভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু-চিন্তার জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে।

চূড়ান্ত বিপর্যয়

বাংলার মুসলমানদের এ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন মোগল ও নবাবী আমলে ষোলকলায় পূর্ণ হয়। তখন থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের সাংস্কৃতিক বিজয়। আকবরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলার মুসলমানদের উপর 'আকবরী ইসলামের' প্রভাব পড়তে থাকে, যার প্রধান অঙ্গই ছিল শির্ক। মোগল অন্তঃপুরে অমুসলিম বেগমদের প্রবেশের কারণে অমুসলিম সংস্কৃতি বাদশাহদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। এ ছাড়াও এ সময় প্রভাবশালী মুসলমান-দের হেরেমে অমুসলিম মেয়েদের সন্ধানও পাওয়া যায়। মুসলমান সুলতানরা হিন্দু রাজ্য জয় করে বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করে ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করতো। এরা গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত হতো। কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময় উপপত্নীতে পরিণত হতো।[৭৩] ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে।"[৭৪] বিখ্যাত ঐতিহাসিক টিটাস উপমহাদেশে ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কারণগুলো তুলে ধরেছেন। হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ (বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ মুসলমানদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল),

মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, মুসলিম মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব (সম্রাট আকবর ও শাহজাহান পুত্র দারাশিকোহ ছিলেন যার প্রতিভূ) এবং ধর্মান্তর গ্রহণে অসম্পূর্ণতা (ইসলাম গ্রহণের পর যথার্থ ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা না করা)।[৭৫]

হিন্দুদের কায়দায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে মোগল আমল থেকেই উৎকর্ষ লাভ করে। মহররমের উৎসব এর একটা বড় নিদর্শন। মহররমের জাঁক-জমকপূর্ণ উল্লাস হিন্দুর দূর্গাপূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুহাম্মদ আবদুল হাই মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে প্রচলিত দেবদেবী পূজা, পীর পূজা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "তাজিয়া নির্মাণ এবং দশম দিবসে মঞ্জিল মাটি তাও দূর্গা পূজার প্রতিমা গঠন ও দশমীর দিনে বিসর্জনের মতো। হিন্দুদের গুরু পূজা ও মুসলমানদের পীর পূজা, পীরের দরগায় উরুস এবং ওলি-আল্লাহ্‌দের মাযারে অতিরিক্ত যিয়ারত উপলক্ষে শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে হিন্দুদের তীর্থস্থানের মতো করে তোলা, বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মুসলমান সমাজে হিন্দুদের পৌরাণিক সমুদ্র দেবতার মতো খাজা খিজিরকে মেনে চলা, তাকে লক্ষ্য করে ফাতেহা পড়া, হিন্দুদের পূর্বপুরুষদের নামে স্মৃতি তর্পণের ন্যায় নদীতে পয়সা ও মিষ্টান্ন অর্পণ করা, হিংস্র ও বন্য পশুদের উপরেও পীরদের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বীকার করে পীরের সাহায্যে হিংস্র পশুদের শান্ত রাখা এবং তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি রীতি-নীতি ভারতীয় ইসলামে তথা বাঙালী মুসলিম সমাজ জীবনে হিন্দু প্রভাবজাত। বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানদের একরকম পীর ছিল জিন্দাহ্ গাজী বা কালু গাজী। নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের এ কালুগাজী বাঘের দেবতা কালু রায় নামে পরিচিত ছিল। কলেরা ও বসন্তের কুগ্রহ প্রশান্ত করার জন্য নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ওলা ও শীতলা দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তাদের কুগ্রহ ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য এসব হিন্দুকে দেখা যেতো গ্রাম-প্রান্তের ও গ্রামের সবচেয়ে বড় অশ্বথ গাছে ডাবের পানি, লাউ এবং এ ধরনের নাড়ী শান্তকর খাবার দিয়ে আসতে। তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্যে বড়ো রকমের একটা উঁচু বাঁশে ছাগলের চামড়ার মধ্যে ধানের খড় পুরে একটা ছাগলই পুঁতে রাখার ভান করা হতো। মুসলমানরাও এসব বিশ্বাস করতো এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুকরণে বিপদের দিনে এসব কুসংস্কার প্রশ্রয় দিত ! অসুখ-বিসুখে এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে সাদ্‌কা দিত। গৃহপালিত পশু হারিয়ে গেলে সেগুলো পাওয়ার জন্য মানত করতো। নদীতে নৌকা যাত্রার সময় দরিয়ার পাঁচ পীর বদরের নাম করতো।"[৭৬]

হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সিঁথিতে 'সিন্দুর' লাগাবারও প্রচলন ছিল।[৭৭] দৈনন্দিন কাজ কারবারের ক্ষেত্রেও সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের ন্যায় দিনের বাছবিচার করতো।[৭৮] বন্ধ্যা মুসলিম মেয়েরা সন্তান লাভের জন্য নানা অনুষ্ঠান করতো। কুম্ভীরের কৃপায় সন্তান লাভ হলে প্রথম সন্তানটি কুম্ভীরকে দান, মাদারীকে ভোজ্যদান, বৃক্ষের সূত্র বন্ধন ইত্যাদি হিন্দুদের কুসংস্কার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। এ জন্য সত্য পীর, মানিক পীর, কুম্ভীর পীর, ঘোড়া পীর, মাদারী (মাছ ও কচ্ছপ) পীর প্রভৃতি পীর পূজা শুরু হয়।[৭৯]

নবাবী আমলে মুসলিম সমাজে আরো নানাবিধ হিন্দু প্রথার প্রচলন দেখা যায়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীর জাফর 'হোলি' উৎসব পালন করতেন। মীর জাফর মৃত্যুর পূর্বে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির থেকে দেবীর পদোদক আনিয়ে পান করেছিলেন।[৮০]

আওরঙ্গজেবের সংস্কার

ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলাদেশে মোগলদের প্রভাব পড়তে থাকে। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ প্রভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মোগল শাসকদের অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলাম বিরোধী চরিত্র বাংলার বিভ্রান্ত মুসলমান শ্রেণীকে চরম বিভ্রান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় হিন্দুরা তাদের চিন্তা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যায়। ধীরে ধীরে তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। এ আমলেই মুসলমানদের একটি অংশ বৈষ্ণব চিন্তাস্রোতে ভেসে যায়। মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সতের শতকের শেষার্ধে বাদশাহ আওরঙ্গজেব যে সংস্কারমূলক কাজগুলো করেন তার ফলে ইসলাম ও মুসলমান সমাজ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। নিচে তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

১. বাদশাহ শাহজাহানের আমলে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। বাদশাহর রাজত্বের শেষের দিকে শাহজাদা দারা শেকোহর পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের পাঠশালায় মুসলমান ছেলেদেরকে নিজেদের ধর্মপুস্তক পড়াতে আরম্ভ করে। মুসলমান ছেলেদেরকে এ ব্যাপারে তারা বেশ উৎসাহ দিতে থাকে। ফলে হিন্দু ধর্ম শিক্ষার জন্য মুসলমান ছেলেরা বহু দূর-দূরান্ত থেকে আসতে থাকে। এভাবে হিন্দুদের কবলে পড়ে মুসলিম সন্তানরা তাদের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছিল। শাহজাহানের পর বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর শাসনামলে এ সমস্ত পাঠশালা বন্ধ করে দেন।

২. সেকালে নিয়ম হয়ে গিয়েছিল যে, এক ব্যক্তি অন্যকে সালাম করতে চাইলে মাথায় হাত রাখতো, মুখে কিছু বলতো না। আওরঙ্গজেব এই প্রথা তুলে দিয়ে সালামের প্রবর্তন করেন। মুসলমানরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে আবার 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা শুরু করে।

৩. নিজের খরচের জন্য আওরঙ্গজেব মাত্র কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে নেন। বাকী সমস্ত বাদশাহী সম্পত্তি সরকারী তহবিলভুক্ত করে দেন। তাঁর জীবন যাপন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তিনি নিজ হাতে যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে নিজের খরচ যোগাতেন। প্রজাগণ রাজাদেরকে যে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছিল তা থেকে তাদেরকে নিশ্চেষ্ট করার জন্য তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

৪. দরবারে সিজ্‌দা ও ভূমি চুম্বন করার রীতি তিনি বন্ধ করে দেন।

৫. আওরঙ্গজেবের সময় ইসলামী শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছিল ভারতবর্ষে তা আর কোন কালে হয়নি। তিনি প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে আলেমদেরকে মাদ্রাসায় নিযুক্ত করে তাদের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করে দেন, যাতে তারা নিরুদ্বেগচিত্তে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেন। রাজ কোষাগার থেকে তাদেরকে বেতন দেয়া হতো। এর সাথে ছাত্রদের জন্যও পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন (মাআসিরে আলমগিরী—১৫২৮ খৃ. দ্রষ্টব্য)। বেনারসে নদওয়াতুল ওলামার যে প্রদর্শনী হয় তাতে তাইমুরীয় বাদশাহগণের বহু ফরমান সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে একমাত্র বাদশাহ আওরঙ্গজেবেরই ছিল দুই-তৃতীয়াংশ। এ সমস্ত ফরমানই কোনো আলেম বা দরবেশকে প্রদত্ত জায়গীর বিষয়ক অথবা কোন বিদ্বান ব্যক্তির জীবিকার জন্য সাহায্য স্বরূপ ছিল।

৬. আকবর নিজ রাজত্ব যেভাবে রাঙাতে আরম্ভ করেছিলেন এবং যার চিহ্ন শাহজাহানের কাল পর্যন্ত চলে আসছিল তা যদি অব্যাহত থাকতো তাহলে মোগল হিন্দুস্তান ইসলামী রাজ্য না হয়ে হিন্দুরাজ্যে পরিণত হতো। দেশ থেকে ইসলামী চিহ্নসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল। রাজদরবারের পোশাক-পরিচ্ছদ হিন্দু ভাবাপন্ন, হিন্দুয়ানী পাগড়ি এবং হিন্দুরাজাদের ন্যায় বাদশাহগণ অলঙ্কারও পরিধান করতেন। দরবারে সালামের পরিবর্তে সিজদা বা ভূমি চুম্বন প্রথা প্রচলিত ছিল। মাথায় টিকি রাখা পর্যন্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ আত্মহনন এতদূর পর্যন্ত পৌছেছিল যে, অনেক আত্মমর্যাদাহীন মুসলমান হিন্দুদের সাথে নিজেদের কন্যার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত শুরু করেছিল। আওরঙ্গজেব শাসনভার গ্রহণ করে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে এগুলো পরিবর্তন করেন এবং এদেশে ইসলামী রসম-রেওয়াজ ও আইন-কানুন প্রবর্তন করেন।

৭. তিনি ইহ্‌তিসাব বিভাগের প্রবর্তন করেন। এ বিভাগে যারা কাজ করেন, তাদেরকে মুহতাসিব বলা হতো। প্রত্যেক জেলায় এ বিভাগে লোক নিযুক্ত করেন। তাদের কর্তব্য ছিল সাধারণের মধ্যে সৎ কাজের প্রচলন করা এবং সর্বপ্রকার অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। মোল্লা অজীহ্ উদ্দীন ছিলেন এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

৮. সমস্ত রাজ্যে যতগুলো মসজিদ ছিল সবগুলোতে ইমাম, মুয়ায্‌যিন ও খতীব বা বক্তা নিযুক্ত করেছিলেন। রাজকোষ থেকে তাদেরকে বেতন দেওয়া হতো।

৯. ইসলামের জন্য তিনি সপ্তদশ শতকের যে সব চাইতে বড় কাজ করেন তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ফিক্‌হ্ বা মুসলিম জীবন-বিধানের ব্যাপারে যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মীমাংসা করে দেন। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের সংখ্যা সে সময় কম ছিল না। বাদশাহ বিভিন্ন দেশের তৎকালীন বড় বড় আলেম, ফকীহ্ ও মুফতীগণকে দরবারে ডেকে নেন এবং যাতে সর্বসাধারণ বুঝতে পারে এরূপ একটি ফতোয়ার কিতাব লিখতে অনুরোধ করেন। অতঃপর এ বিষয়টি সম্পাদনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। মোল্লা নিজাম এ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ কার্য সম্পাদনের জন্য শাহী গ্রন্থালয়, যাতে অসংখ্য গ্রন্থ ছিল, উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ক্রমাগত কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ হয়। 'ফতোয়া-ই-আলমগিরী' নামে গ্রন্থটি বিশ্ব জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। আরব ও তুর্কীরা একে 'ফতোয়া-ই-হিন্দিয়া' বলে থাকে। মাআসিরে আলমগিরীর বর্ণনা মতে, এ গ্রন্থ প্রণয়নে দু'লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য ফিক্‌হ্ গ্রন্থে যে সব মাসআলা অত্যন্ত জটিলভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা এতে নিতান্ত সহজ-সরল শব্দের মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ সাথে নতুন সমস্যাগুলোর যুগোপযোগী ও সহজ সমাধান দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্তানের তৎকালীন কাযীগণের আদালতের এটিই ছিল প্রধান আইন গ্রন্থ।

১০. শাহী দরবারে এমনভাবে গান-বাজনা হতো, যা কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্য অসহনীয় ছিল। গান-বাজনা দরবারের একান্ত করণীয় কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল। শাহী দরবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাট্যশালায় পরিণত হয়ে যেতো।[৪১] ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের ব্যবস্থা কোন দিন অনুমোদন করেনি। আওরঙ্গজেব এ প্রথা বন্ধ করে দেন। লোকেরা সঙ্গীতের কৃত্রিম শব বানিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। বাদশাহ দেখে বলেন, "হ্যাঁ, ভালই করেছো। তবে এমনভাবে দাফন করবে যেন আবার কখনও বেঁচে না ওঠে।"

১১. দরবারের সমস্ত জাঁক-জমক ও জৌলুস বন্ধ করে দেন। এমন কি রূপোর দোয়াতের পরিবর্তে চীনামাটির দোয়াত ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। উপঢৌকনাদি রূপোর থালার পরিবর্তে সাধারণ পাত্রে আনার হুকুম দেন।

১২. আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সবচেয়ে বড় সংস্কারমূলক কাজ যা ইসলাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা হচ্ছে প্রজাদের 'হক' আদায়। পূর্বকালে কোন প্রজা রাজার বিরুদ্ধে কিছু দাবি করলে তার কথা শোনার কোন লোক থাকতো না। সে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করে উঠতে পারতো না। দুনিয়ার কোথাও এ সম্পর্কিত কোন আইন বা নিয়ম ছিল না। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১০৮২ হিজরীতে এক ফরমান জারি করেন যে, প্রত্যেক জেলায় সরকারী উকিল নিযুক্ত করা হবে এবং সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে যে, বাদশাহ্‌র ওপর যদি কারো কোন দাবি থাকে তবে সরকারী উকিলের কাছে তা পেশ করতে পারবে। তার হক প্রমাণিত হলে সরকারী উকিলের কাছ থেকে তা আদায় করে নিতে পারবে। (দ্রষ্টব্য ঃ খাফী খাঁ—৪৯)[৮২]

আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার মুসলমানরা সম্ভবত এই প্রথমবার যথার্থ ইসলামী শাসনের সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং ইসলামী শাসনের সুফল ভোগ করেছিল। আওরঙ্গজেব দিল্লী থেকে শাসন করলেও এবং বিভিন্ন সময় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে রাজধানী থেকে অনুপস্থিত থাকলেও রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁর কর্ণগোচর হতো। এ জন্য তিনি 'ওয়াকেয়া নিগারী' নামক একটি পৃথক দায়িত্বশীল বিভাগ কায়েম করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও ছোট-বড় সকল প্রশাসকের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকতো। তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ যাতে কোনো প্রকার ইসলাম বিরোধী কাজ এবং এমন কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারে, যাতে মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, বাংলার সুবাদার শাহজাদা আজিমুশ্‌শান হিন্দুদের 'হোলি' উৎসবে জাফরানি রং-এর লাল বস্ত্র পরিধান করেছেন। তিনি বিরক্ত হয়ে শাহজাদাকে পত্র লিখলেন ঃ "তোমার মস্তকে জাফরানি রং-এর শিরস্ত্রাণ, কাঁধে লাল কাপড়—(অথচ) তুমি ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক প্রবীণ—তোমার দাড়ি ও গোঁফের জয় হোক।"[৮৩]

আওরঙ্গজেবের আমলের বাংলার দেওয়ান ও পরবর্তীকালের সুবাদার মুরশিদ কুলি খাঁর শাসনকালের কার্যাবলী আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সেখানে আমরা এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, বাংলার শাসনকর্তাদের মধ্যে একমাত্র তাঁর আমলে মুসলমানরা ইসলামী শাসন ও ইসলামী চরিত্রের সাথে কিছুটা

পরিচিত হতে পেরেছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কঠোর পরিচর্যার কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল।

এতদ্‌সত্ত্বেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মুসলমান সমাজে যে বিপর্যয় এগিয়ে চলছিল যরথুস্ত্রীয়, বৈরাগ্যবাদী ও বেদান্ত দর্শন প্রভাবিত এক শ্রেণীর সূফীদের ভ্রান্ত মতবাদ ও পদ্ধতিই তার জন্য দায়ী। এ সময় উপমহাদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের হৃদয়েও তার কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলাদেশে চলছিল চরম রাজনৈতিক গোলযোগ। নবাব আলীবর্দী একদিকে মারাঠা বর্গীদের সাথে লড়াই করেন আবার অন্যদিকে রোহিলাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। এভাবে মারাঠাদের দমন করতেই তাঁর প্রাণান্ত হলো। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বেশি দিন বাংলার মসনদে টিকে থাকতে পারলেন না। বাণিজ্য ব্যাপদেশে আগত ইউরোপের কতিপয় খৃস্টান জাতি বহুদিন থেকে ভারতের সিংহাসনের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে তারা দিল্লীর দরবারে প্রবেশ করে। অতঃপর বাদশাহ্‌র কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করে পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল এবং সেখান থেকে বাংলার উপকূলে প্রবেশ করে মাত্র এক'শ বছরের মধ্যে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। ইউরোপ থেকে আগত পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ তিনটি খৃস্টান জাতির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই নিজেদেরকে শক্তিশালী প্রমাণ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও তারা এদেশে ব্যাপকভাবে খৃস্টধর্মের প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা বাংলাদেশে পদার্পণ করেই হিন্দুদের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারে। হিন্দুদেরকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে। হিন্দুরা মুসলমান সমাজকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করলেও পাঁচ'শ সাড়ে পাঁচ'শ বছরের মধ্যেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়নি। তারা মুসলমানদের শাসনকে এদেশীয়দের শাসন মনে করছিল না। তাই মুসলিম শাসন থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করছিল। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুসলিম শিবির দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মীর জাফরের নেতৃত্বে নবাব পরিবারের একটি গ্রুপ ক্ষমতার লোভে হিন্দু ও ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। ক্ষমতার মধ্যমণি ইংরেজরা এ সুযোগ হাতছাড়া করলো না। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌলা নিহত ও ইংরেজদের হাতের পুতুল

হিসাবে মীর জাফর ক্ষমতায় আসলো। হিন্দুদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ও ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামীর অন্তহীন সমুদ্রে ডুবে গেলো বাংলার মুসলমান সমাজ।

এ সময় দিল্লীতেও অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় পারস্য থেকে নাদির শাহের আক্রমণে মোগলদের শেষ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে গেলো। দক্ষিণের মারাঠা শক্তি দিল্লীতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করলো। মোগল বাদশাহরা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল। এ সময় সব চাইতে চমকপ্রদ ছিল দরবারের আমীর-উমরাহ ও মুসলিম প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর ভূমিকা। এক্ষেত্রেও মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয় স্থানেই আমীর-উমরাহগণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, ষড়যন্ত্র এবং একজন অন্যজনকে কিভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, এই প্রচেষ্টায় সদা ছিলেন তৎপর। আলেমগণ কুরআন ও হাদীসের চর্চা না করে ফিক্‌হের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তুমুল বিতণ্ডায় মশগুল থাকতেন। সূফীদের একটি বিরাট অংশ মুসলিম জনগণকে ইসলাম অননুমোদিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আর সাধারণ মুসলমানদের দুরবস্থার কথা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। এ অবস্থা বাংলাদেশসহ সমগ্র উপমহাদেশে বিরাজ করছিল।

এ সময় উপমহাদেশের কেন্দ্র ও সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান দিল্লীতে আবির্ভাব হলো শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর (১৭০৩—১৭৬৪ খৃ.)। মুসলিম সমাজের এ চরম অরাজকতার দিনে তাঁর ন্যায় সুসংহত বিপুল ইসলামী জ্ঞান-সম্পন্ন নেতৃত্বেরই প্রয়োজন ছিল। ইসলামী শাস্ত্রসমূহে অগাধ পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের এক অপার বিস্ময়। ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবন-বিধানের ভিত্তিতে মুসলমান সমাজকে পুনর্গঠিত করার জন্য তাঁর ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা। শুধুমাত্র এ উপমহাদেশের নয়, এর বাইরের বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজকে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি জিহাদে অবতীর্ণ হবার সংকল্পও ঘোষণা করেছিলেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজে হাত দেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত এই সর্বপ্রথম মুসলমানদের শাসক, সৈনিক, আলেম, সূফী, ব্যবসায়ী, সাধারণ মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, শিক্ষা, চরিত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মিশ্রিত সকল প্রকার জাহেলিয়াতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইসলামের মূল গ্রন্থ এবং নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে

নিজেদের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির জন্য আহ্বান জানানো হয়। অতঃপর এর দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হন। মুসলমানদের মধ্যে মযহাবী বিরোধ মিটাবার পন্থা নির্দেশ করেন এবং সাথে সাথে ইজতিহাদের ওপরও জোর দেন। এর সাথে তিনি ইসলামের সমগ্র ভাবাদর্শ, নৈতিক, তমদ্দুনিক ও শরীয়ত ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'ইযালাতুল খিফা' তাঁর দু'টি অতি উচ্চ স্তরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি আরো বিভিন্ন গ্রন্থে নিজের চিন্তাধারার প্রকাশ করেন।

দিল্লীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বহু ছাত্রও তাঁর এ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাঁর বইপত্র অধিকাংশই ছিল ফার্সীতে এবং কয়েকটি আরবীতেও লিখিত হয়। এ বইগুলোও বাংলায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) তাঁর জীবদ্দশায় সঠিক ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কোন সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পাননি। তবুও চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যে বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে পরবর্তী মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই দু'টি ইসলামী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এ দু'টি ইসলামী আন্দোলন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর একটি ছিল উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলীর সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) পরিচালিত তরিকা-ই-মোহাম্মদিয়া বা জিহাদ আন্দোলন। এর কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর দ্বিতীয় আন্দোলনটির সৃষ্টি এ বাংলাদেশেই। এটি ফরায়েজী আন্দোলন নামে খ্যাত। ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (র) ও তাঁর পুত্র মোহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া (র) ছিলেন এ আন্দোলনের পরিচালক। বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবন থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদর্শের ভিত্তিতে তাদের চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি এবং জীবন ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এ ইসলামী আন্দোলন দু'টি সফল ভূমিকা পালন করে। যার ফলে কয়েক'শ বছর পর বাংলাদেশের যথার্থ ইসলামী পুনরুজ্জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

---

১ যদুনাথ সরকার–হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, ১২–১৩ পৃষ্ঠা।
২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ৫ পৃষ্ঠা।
৩. Jadunath Sarkar–History of Bengal, Vol–11, পৃষ্ঠা ৫।
৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ৯৮ পৃষ্ঠা।

৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ৩ পৃষ্ঠা।
৬. আন-নিসা ঃ ৪৮
৭. পাঁচ বার।
৮. দামামা।
৯. দানিশমন্দ ফার্সী দানিশমন্দ অর্থে। অর্থাৎ জ্ঞানী, পণ্ডিত।
১০. তুর্কী টুপি, বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও এর ব্যাপক প্রচলন ছিল।
১১. আহার করে।
১২. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়াযুস সালাতীন ঃ অনুবাদ বাংলা একাডেমী, ৫০ পৃষ্ঠা।
১৩. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়াযুস সালাতীন ঃ অনুবাদ বাংলা একাডেমী, ১৯০—১৯১ পৃষ্ঠা।
১৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৪৫ পৃষ্ঠা
১৫. বিপ্রদাস—মনসামঙ্গল, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৫৬ খৃ., পৃষ্ঠা ৬৬—৬৭।
১৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৩৮ পৃষ্ঠা।
১৭. গোলাম হোসাইন সলীম—রিয়াযুস সালাতীন ১৯৩—১৯৪ পৃষ্ঠা।
১৮. প্রাগুক্ত, ১০২—১০৪ পৃষ্ঠা।
১৯. বুখারী শরীফের হাদীসে জিব্রীল দ্রষ্টব্য।
২০. R. A. Nicholson—Mystics of Islam, P.17.
২১. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—ভারতীয় দর্শন, ১৫ পৃষ্ঠা।
২২. F. F. Arbuthnot—Persian Portrait (1187), Page-53, উদ্ধৃত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৮০ খৃ., ১৮শ' বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯৬—৯৭।
২৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৫৯ পৃষ্ঠা।
২৪. আবদুল করিম—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৭১, খৃ., ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭-৮ পৃষ্ঠা।
২৫. M. R. Tarafder—Hossain Shahi Bengal, ২৩৩ পৃষ্ঠা।
২৬. লাহোরে অবস্থিত তাঁর মাযারে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ও হযরত খাজা ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শককর চল্লিশ দিন ইবাদত-বন্দেগী করেছিলেন।
২৭. হযরত আলী আল হিজবিরী—কাশফুল মাহজুব, মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ অনূদিত, প্রথম সংস্করণ, লাহোর থেকে প্রকাশিত, ২২২—২২৩ পৃষ্ঠা।
২৮. মুজাদ্দিদ আলফেসানি—মকতুবাত, দফতরে আউয়াল, ২০৭ নং মকতুব।
২৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৬৪—১৬৫ পৃষ্ঠা।
৩০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৩১—১৩২ পৃষ্ঠা।
৩১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৪০—১৪১ পৃষ্ঠা।
৩২. History of Bengal ২য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।
৩৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ৪২ পৃষ্ঠা।
৩৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ৪৩ পৃষ্ঠা।
৩৫. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।
৩৬. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৫—১৩৬ পৃষ্ঠা
৩৭. ওয়াকিল আহমদ—সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ২৮—২৯ পৃষ্ঠা।

৩৮. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন—বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় খণ্ড, ১৫—১৬ পৃষ্ঠা।
৩৯. সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ৪৫ পৃষ্ঠা।
৪০. সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ৮৬ পৃষ্ঠা।
৪১. ডঃ শহীদুল্লাহ—বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ), ৫৪ পৃষ্ঠা।
৪২. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন—বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।
৪৩. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের ৭৮ পৃষ্ঠায় দীনেশ চন্দ্র সেনের এ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন।
৪৪. সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ৭০ পৃষ্ঠা।
৪৫. সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ৮১ পৃষ্ঠা।
৪৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৫৯ পৃষ্ঠা।
৪৭. বিমল বিহারী মজুমদার—ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃষ্ঠা।
৪৮. চৈতন্য চরিতামৃত, ১৭শ অধ্যায়, ৬৫ পৃষ্ঠা, উদ্ধৃত Husain Shahi Bengal পৃষ্ঠা—২৩১।
৪৯. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ৯৯—১০২ পৃষ্ঠা।
৫০. Husain Shahi Bengal, ২৩০ পৃষ্ঠা।
৫১. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, আদি লালী, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রসঙ্গত 'অমিয় নিমাই চরিত,' প্রথম খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।
৫২. শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।
৫৩. শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।
৫৪. শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।
৫৫. শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।
৫৬. জয়ানন্দ মিশ্র—চৈতন্য মঙ্গল, ১৪৭ পৃষ্ঠা।
৫৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৬১ পৃষ্ঠা।
৫৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৬৫ পৃষ্ঠা।
৫৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৬৫ পৃষ্ঠা।
৬০. মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস, ৫৬ সং শ্লোক, উদ্ধৃতি—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ১১০ পৃষ্ঠা।
৬১. ঐ, ৫ম উল্লাস, ২৩—২৪ শ্লোক, ঐ।
৬২. ঐ, ১১শ উল্লাস, ১০৫—১১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।
৬৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৬৬—২৬৭ পৃষ্ঠা।
৬৪. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১১২—১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৬৫. হিন্দু বাউল সন্ন্যাসীরা যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে যৌন পূজার একটি অনুষ্ঠান পালন করে। এতে তারা 'চারিচন্দ্র ভেদ' অর্থাৎ ঋতুবতী নারীর রক্ত, বীর্য, মল ও মূত্র সেবন করে। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২৩৬ পৃষ্ঠা।)
৬৬. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২৩৭ পৃষ্ঠা।
৬৭. যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য—বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।
৬৮. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন—বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।

৬৯. এবাদত হোসেন–পদাবলী সমীক্ষা, ১৩৯ পৃষ্ঠা।
৭০. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১২২–১২৩ পৃষ্ঠা।
৭১. এবাদত হোসেন–পদাবলী সমীক্ষা, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৭২. আহমদ শরীফ–মুসলিম কবির পদ সাহিত্য, পদসংখ্যা–৫২।
৭৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৮৮ পৃষ্ঠা।
৭৪. দীনেশ চন্দ্র সেন–বৃহৎ বঙ্গ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা।
৭৫. TITUS, M.T. : Indian Islam 'The Religious Oues of Indian series' : Page–65 উদ্ধৃত ঃ আনিসুজ্জামান–মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৬ পৃষ্ঠা।
৭৬. আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান–বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৭–৮ পৃষ্ঠা।
৭৭. Khondakar Mahbubul Karim–The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, ১৯৬ পৃষ্ঠা।
৭৮. ঐ, ১৯৮ পৃষ্ঠা।
৮৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার–বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২৩৬ পৃষ্ঠা।
৮০. ঐ, ২০৬ পৃষ্ঠা।
৮১. দিল্লী ও লাখনৌতির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কবি কৃত্তিবাস তাঁর কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুখবন্ধে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের দরবারে কাব্য পাঠ ও নাট্য গীত আসর কালীন যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যেতে পারে।
৮২. আওরঙ্গজেবের এ সংস্কারমূলক কার্যাবলীর বিবরণ বিখ্যাত ঐতিহাসিক মওলানা শিবলী নোমানীর 'আওরঙ্গজেব' নামক গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে।
৮৩. গোলাম হোসাইন সলীম–রিয়াযুস সালাতীন, অনুবাদ ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯১ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856 by Dr. Azizur Rahman Mallick.
২. The Indian Mussalmans by W.W. Hunter.
৩. The History of Bengal, Vol-II by J.N. Sarkar.
৪. Husain Shahi Bengal by M.R. Tarafdar.
৫. A History of Sufism in Bengal by Dr. Enamul Haq.
৬. Thd Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan by Kh. Mahbubul Karim.
৭. East Pakistan District Gazetteers Dacca. S.N.H. Rizvi.
৮. Bangladesh District Gazetteers Sylhet, Kushtia, Chittagong, Chittagong Hill-tracts, Dinajpur, Noakhali and Rangpur.
৯. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো—চৌধুরী শামসুর রহমান
১০. চলন বিলের ইতিকথা—এম. এ. হামীদ
১১. যশোরাদ্য দেশ—হোসেনুদ্দীন হোসেন
১২. রাজশাহীর ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড—এম.এ. মেছের
১৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস—এম. এ. রহীম
১৪. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—মোহাম্মদ আকবর খাঁ
১৫. বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
১৭. বাঙ্গালীর ইতিকথা—আখতার ফারুক
১৮. বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ ১ম ও ২য় খণ্ড—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার
১৯. রিয়াযুস সালাতীন (বঙ্গানুবাদ ঃ বাংলার ইতিহাস)—গোলাম হোসাইন সলীম
২০. সুফীতত্ত্বের মর্মকথা—চৌধুরী শামসুর রহমান
২১. সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ—ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ
২২. সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য—ওয়াকিল আহমদ
২৩. চর্যাগীতিকা—আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা
২৪. চর্যাপদ—অতীন্দ্র মজুমদার
২৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—মাহবুবুল আলম
২৬. চর্যাগীতি—অধ্যাপক হরলাল রায়
২৭. গৌড়লেখমালা—শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়
২৮. ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ
২৯. Social Research in East Pakistan—Edited by Pierre Bessaignet.

৩০. Sources of Indian Tradition—Edited by W. Theodore de Bary, Columbia University Press.
৩১. কামসূত্রম্ (ইংরাজী সংস্করণ)—বাৎসায়ন
৩২. ভারতীয় দর্শন—দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৩৩. চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী
৩৪. ধম্মপদ—শ্রী গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া
৩৫. চট্টগ্রামে ইসলাম—ডঃ আবদুল করীম
৩৬. سفرنامه ابن بطوط جلد دوم
৩৭. تاریخ ایران – جان مالکم جلد اول و دوم
৩৮. سیرمتا خرین – منشی غلام حسین خان
৩৯. تفهیم القرآن جلد دوم و سوم – مولانا مودودی
৪০. سیرت النبی جلد اول – شبلی نعمانی
৪১. تجدید احیاءدین – مولانا مودودی
৪২. خلافت و ملوکیت – مولانا مودودی
৪৩. মহররমের শিক্ষা—মওলানা মওদুদী
৪৪. আওরঙ্গজেব (বঙ্গানুবাদ)—শিবলী নোমানী
৪৫. তারীখে হিন্দে কাদীম (উর্দু)—কে. এম. পানিক্কর
৪৬. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১ম খণ্ড)—অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন আহমদ
৪৭. মুসলিম বাংলা সাহিত্য—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক
৪৮. পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক—ডঃ গোলাম সাকলায়েন
৪৯. পাকিস্তানের সূফী সাধক—আ. ন. ম. বজলুল রশীদ
৫০. সাহিত্যের সীমানা—মুজিবুর রহমান খাঁ
৫১. মুসলিম সাধনা ও বাংলা সাহিত্য—আনিসুজ্জামান
৫২. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ—চৈত্র ১৩৭৪
৫৩. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৬৯
৫৪. বাংলা একাডেমী পত্রিকা শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৭১
৫৫. সাহিত্যিকি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৯/১৩৮০ বসন্ত ও শরৎ সংখ্যা
৫৬. كشف المحجوب – على الحجويرى
৫৭. مذاهب عالم – عبد الله السدوسى
৫৮. তারিখে ইশাআতে ইসলাম (উর্দু অনুবাদ)—টি.ডবলিউ. আরনল্ড
৫৯. صحيح البخارى جلد اول – امام بخاروى

৬০. Bangladesh Historical Studies—B. Asiatic Society.

৬১. بحر هند مين عربون كى جهاز رانى – مولانا سيد سليمان – ندوى

৬২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

৬৩. قصص القرآن جلد اول – مولانا حفظ الرحمان سيوهاروى

৬৪. الملل والنهل – ابن حزم وعبد الكريم شهرستانى

৬৫. اسلام اور مذهب عالم – محمد مظهر الدين صديقى

৬৬. বাঙালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস—নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

৬৭. বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক ইতিবৃত্ত—শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৮. বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল—শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়

৬৯. علماء هندكا شاندار ماضى جلد اول ، دوم ، سوم – مولانا سيد محمد ميان

৭০. تاريخ فيروز شاهى اردو مترجم – شمس سراج عفيف

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৬৩৪৬ (উ)—৩২৫০

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ